পরমহংস

পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী

[তৃতীয় খণ্ড]

পরম হংস

পূর্ণানন্দ স্বামীর

পত্রাবলী

[তৃতীয় খণ্ড]

প্রথম সংস্করণ

১৩৬১ সাল

-গৌরী- আশ্রম কে -
মদীয় পিতৃ ৺শ্রী-গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
স্মৃতি উদ্দেশে—
প্রীতি. ভবানী চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

২০।৯।৬৪

করুণাময় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায়, পরমারাধ্য পরম গুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ পূর্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের অন্যতম জ্ঞানী ও ভক্ত শিষ্য, কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত এটর্ণী, মদীয় ধর্ম্ম পিতৃব্য শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক ইচ্ছায়,—সত্যযুগ এবং সদ্‌গুরু ও রাজযোগ প্রণেতা পরলোকগত জগচ্চন্দ্র দাস, ধর্ম্ম-পিতৃব্য মহাশয়ের সংগৃহীত এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত পত্রাবলীর তৃতীয় খণ্ডও এতদিনে প্রকাশিত হইল। পত্রাবলীর ১ম ও ২য় খণ্ড অধুনা দুষ্প্রাপ্য। সেজন্য, উহার পূর্ব্বাপর সম্পূর্ণ প্রকাশ পরিচয় এস্থলে পুনরায় প্রদত্ত হইল। উক্ত পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপিগুলি জগৎবাবুর পরলোক গমনের পর, তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। কারণ, জগৎবাবুর জীবদ্দশায় তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—"*** গুরুদেবের পত্রগুলি ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, সেজন্য এক দুঃখ আছে**।" তদুত্তরে প্রাণের আবেগে এ অধম লিখিয়াছিল—"***পত্রাবলী ছাপাইবার সমস্ত ভার আমি লইতে পারি***।" পত্রোত্তরে, গুরুগত প্রাণ জগচ্চন্দ্রের ব্যাকুলতা পূর্ণ প্রাণের কথা জানিতে পারা যায়,—"যাঁহারা আমার গুরু চিন্তার সহায়, তাঁহারা যে আমার পরম আত্মীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবনের যে সময়টুকু অবশিষ্ট আছে, যাহাতে সেই সময়টুকু গুরু-চিন্তায় কাটাইতে পারি, সেই উদ্দেশ্য নিয়াই গুরুর জীবনী ও গুরুর পত্রাবলী ছাপাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি যে আমার সঙ্কল্প সাধনের সহায়তা করিতেছেন এবং স্ব-প্রণোদিত হইয়া প্রস্তাব করিয়াছেন,—'পত্রাবলী ছাপাইবার সমস্ত ভার আমি লইতে পারি,—' ইহাতে আমি যে কিরূপ আত্মীয়তা আস্বাদন করিতেছি, তাহা বুঝাইবার ভাষা

জগতে কি আছে ?***" (১৩৩৭, ২৩শে কার্ত্তিক তারিখের পত্র)। ১৩ই অগ্রহায়ণের শেষ পত্রে তাঁহার লিখিত ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীটি যাহাতে শীঘ্র প্রকাশিত হয়, তাহা লিখিয়াছিলেন। ইহার পর ১৫ই অগ্রহায়ণ হঠাৎ তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া বিগত ১লা পৌষ বুধবার, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঢাকার বাটীতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করেন।

১৩৩৭ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিন পরমহংস পূর্ণানন্দ স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিবার পর প্রায় ৭ বৎসর পরে পত্রাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করি। উহার পর বৎসর পত্রাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হয়। অতঃপর নানা বাধা-বিঘ্নের কবল হইতে পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপিগুলি রক্ষা করতঃ আমার জীবনের এই সায়াহ্ন কালে, উহার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

বলা বাহুল্য, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে পত্রাবলীর ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা সত্ত্বেও একমাত্র তাঁহারই অর্থ সাহায্যে, এই তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইল। জগৎবাবুর নিকট আমার প্রতিশ্রুতি হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্করবাবু যে সহৃদয়তা এবং আত্মীয়তার নিদর্শন দেখাইলেন, তাহা আমি ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম। এজন্য, তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আমার এই বার্দ্ধক্যাবস্থায়, আমার দ্বারা পত্রাবলীর তৃতীয় খণ্ড মুদ্রণের কার্য্য পরিচালনা করা একরূপ অসম্ভব। আমার অন্যতম প্রিয় শিষ্য, বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীমান্ দাশরথি পাল এম্-এ আমার নির্দ্দেশমত পত্রাবলীর তৃতীয় খণ্ডস্থ পত্রগুলি পর পর সজ্জিত করিয়া এবং যে সকল বিশেষ স্থানে বড় টাইপ ব্যবহার হইবে, সেই সকল স্থান চিহ্নিত করতঃ শ্রীগুরুদেবের বিশেষ আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। আমার অন্যতম ভক্ত শিষ্য ডাঃ শ্রীমান্ নৃসিংহ চন্দ্র কর—এম, ডি, সি. এইচ্. প্রুফ ইত্যাদি সংশোধন এবং

প্রেসের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য আন্তরিকতার সহিত যেরূপ ভাবে সম্পাদন করিয়াছেন, সেজন্য শ্রীগুরুদেবের বিশেষ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পত্রাবলীর প্রথম খণ্ডে ৭৩টি পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল ; শ্রদ্ধাস্পদ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ ; বি, এল এবং ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ ; পি, এইচ্, ডি, মহাশয়দ্বয় উহাতে হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। ঐ খণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীও প্রকাশ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ৯২টি পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। উহার ভূমিকায়, পত্রাবলী সর্ব্ব সাধারণের বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করিবার জন্য, সৃষ্টিতত্ত্ব চাতুর্ব্বর্ণ, মূলমন্ত্র, গুরুবীজ এবং গুরু-স্বরূপে পৌঁছিবার ধ্বনি-সঙ্কেত বর্ণনা করিয়াছিলাম্। বর্ত্তমান তৃতীয় খণ্ডে ১১৪টি পত্র মুদ্রিত হইল। এই খণ্ডে পত্রগুলির তারিখ হিসাবে সজ্জিত না করিয়া বিষয়বস্তু অনুযায়ী, যথা— দেহ-বিশিষ্ট আত্মা, স্মৃতি, সংস্কার ও কর্ম্মফল, কল্পনা, বুঝাবুঝি এবং গুরু-তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। একই বিষয়ের অনেকগুলি পত্র পর পর পাঠ করিতে হইলেও, পাঠক-পাঠিকাগণ প্রত্যেক পত্রের রচনার মধ্যেই কিছু না কিছু নূতনত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অশেষ করুণানিদান, মঙ্গলময়, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের নাম জয়যুক্ত হউক।

রথযাত্রা, ১৭ই আষাঢ়,
সন ১৩৬১ সাল
খাঁটুরা (গোবরডাঙ্গা) ২৪ পরগণা।
আনন্দ ধাম,
৭৫এ, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা—৩

বিনীত—
শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল

পরমহংস
পূর্ণানন্দ স্বামীর
পত্রাবলী।

[তৃতীয় খণ্ড]

[(১)—জ]

আত্মা দেহ-বিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ বুঝিয়াছে। ইন্দ্রিয় অভাবে জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না অথচ জগৎ ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজনই আত্মার নাই। ইহা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে আত্মা নিষ্প্রয়োজনে এই দেহটা নিয়াছে, অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জন্যই দেহবিশিষ্ট হইয়াছে। সে পক্ষে, তাহার প্রয়োজনীয় বস্তুর দ্বারা আত্মার অভাব পূরণ হইতেছে না; হয় প্রয়োজন বোধটা ভুলে হইয়াছে, না হয় অভাবই তাহার স্বভাব। অভাববোধ কিছুতেই রহিত হয় না ও হইবে না; সুতরাং অভাবের অভাব করার চেষ্টা করাই ভুল, না হয়, এই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা যাহা আবশ্যক বা প্রয়োজন বোধ জন্মিবে সে প্রয়োজন ভুলে প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। সর্ব্বাবস্থায়ই আমি ভ্রান্ত, আমি সুখের জন্য ঠিক বুঝিয়া সব কর্ম্ম করি, আমার দুঃখের কারণ কে? আমি ভিন্ন অন্য কেহকে যদি দুঃখের কারণ স্বীকার করি তাহা হইলে আমার সুখের ইচ্ছা ভুল,

আমিই আমার কার্য্যের দ্বারা দুঃখ বোধ করিলে আমি যে সুখের জন্য ঠিক কাজ করি তাহা ভুল। ভুল বুঝিয়া ভুলে থাকা যায় কত কাল ? অপরকে ভুল বুঝাইবার জন্য থাকা আবশ্যক হইলে অপরে ভুল না বুঝিলে আর ভুলে থাকিয়াই বা প্রয়োজন কি ?

[(২)—জ]

তোমার সঙ্গে গৌহাটি যে কয়দিন আলাপ হইয়াছে তাহাতে আত্মা সম্বন্ধে, আত্মার স্বরূপ এই বুঝে যাহা বুঝা যায় তাহা, বুঝাইতে বোধ হয় আমার ভুল হয় নাই। আমরা যখনই অপরের বুঝ্ মত বুঝি তখন তাহা ঠিকই বুঝি। কিছুক্ষণ বা কিছু দিন পরে, আবার সেই অপরের বুঝের কথা বা বিষয় যখন নিজের বুঝ্ দিয়া বুঝিয়া দেখি তখন আর সেরূপ বুঝি না, নিজের বুঝ্ মত একটা বুঝি। অনেক সময় মায়া-মোহে ব্যক্তি-বিশেষের আসক্তিতে আসক্ত হইয়া বেঠিক কথাকে ঠিক বুঝি, আবার ব্যক্তি-বিশেষের উপর বিরক্ত হইয়া ঠিক কথাকে বেঠিক বলিয়া বুঝি। এবম্বিধ প্রকারে ঠিক বেঠিক ধারণার অনেক প্রকার প্রকারভেদ হয়। সেইরূপ গুরুগত-প্রাণ শিষ্য যখন গুরুজ্ঞানে আত্মহারা হইয়া গুরুবাক্য শ্রবণ করে, তখন গুরুর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও ঠিক ধারণা হয়, আবার স্বীয় পূর্ব্ব সংস্কারানুরূপ সংস্কার দিয়া সেই সিদ্ধান্ত বুঝিতে গিয়া অনেক সময় সংশয় উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান জ্ঞান দিয়া আত্মার স্বরূপ বুঝিতে হইলে কেবল এই মাত্রই বুঝা যায় দেহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-যোগে আত্মার ইন্দ্রিয়জ যে সংস্কার আছে, সেই সংস্কার আত্মা হইতে তুলিয়া নিলে বা পৃথক করিলে আত্মার যে অবস্থা থাকে, তাহাই আত্মার আত্ম-স্বরূপ।

যদি আত্মাকে অনাদিকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট স্বীকার করা যায় তাহা হইলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদির সংস্কারানুরূপই তাহার স্বরূপ এবং এই সংস্কার বিশিষ্ট দেহও তাহার অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। দেহের পরিণাম ও ধ্বংস ইন্দ্রিয় যোগেই সর্ব্বদা দেখিতেছি ও বুঝি। অপর পক্ষে আত্মা নির্দ্দিষ্ট সংস্কার লইয়া আছে ও থাকিবে, তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না ; তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু ও বিষয়ও অনাদিকাল পর্য্যন্ত ঠিক স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু দেখা যায় যে সর্ব্বদাই আত্মার সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইতেছে ও ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার অসংযোগ বা বিয়োগ অবস্থাও ঘটিতেছে। দেহেরও ধ্বংস ও প্রাদুর্ভাব হইতেছে। দ্রষ্টা দৃশ্যভাবেও দেহ ও দেহী পৃথক্ অনুমান হইতেছে ; সুতরাং আত্মা অনাদিকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান-বিশিষ্ট নয় ; হইলে উপরের লিখিত অবস্থাগুলি তাহার সম্ভব হয় না। যাহা হউক এ বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে উপদেশাদি দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছি তাহাতে বোধ হয় তোমার সন্দেহ নাই।

আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান, আত্মাতে স্থির বা স্থায়ী কল্পনা ব্যতীত থাকে না। ইহাতেই অর্থাৎ কল্পনাতেই পরিষ্কার প্রমাণ হইতেছে যে আত্মার স্বরূপে কল্পনানুরূপ কোনও জ্ঞান বা বিষয় নাই ; স্বরূপে কল্পনানুরূপ বিষয় থাকিলে, কল্পনার প্রয়োজনই হইত না। পরিষ্কারই দেখিতেছি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জ্ঞান হইতেছে, ইন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষে তাহা কিছুক্ষণ বা কিছুদিন পরে জ্ঞানে থাকে না ; কেবল কল্পনায়ই কল্পিত জ্ঞানে বা কল্পনানুরূপ জ্ঞানে, জ্ঞান আছে বলিয়া জ্ঞান হয়। ঋষিরা এই কল্পিত সংজ্ঞার জ্ঞানকেই সংস্কার আখ্যা দিয়াছেন। সংস্কার, স্মৃতি ও কর্ম্মফল এই তিন জিনিসই

এক। স্মৃতিতে যাহা নাই তজ্জন্য কোনও কর্ম্মফল বা তদনুযায়ী সংস্কারে ভাল মন্দ বিচারও আসে না। ভাল মন্দ বিচার আসিয়া যেরূপ কর্ম্ম বা ক্রিয়া করি, আমার সেই ক্রিয়া অনুরূপই ত একটা জ্ঞান, স্মৃতি বা সংস্কার থাকে; অর্থাৎ আত্মাতে আমাদের স্পন্দনানুরূপ স্পন্দন হইয়া কল্পনানুরূপ আত্মার একটা আকার অবয়ব করিয়া তুলি ও তদনুরূপ দেহাদি গ্রহণ করিয়া সেই ক্রিয়া বা সংস্কারানুরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করি।

আমার সংস্কারে বা জ্ঞানে প্রকৃতির যেখানে যেরূপ ক্রিয়া বর্ত্তমান দেখিতেছি অর্থাৎ ক্ষিত্যপতেজ-মরুদ্‌ব্যোম—এই পঞ্চভূতের সংস্কার আমার যেরূপ সেই সেই পদার্থের ক্রিয়াও সেইরূপ এবং আমার সংস্কারানুরূপ দেহে সেই সেই পদার্থ সেই সেইরূপই ক্রিয়া করে এবং সেই ক্রিয়ানুরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করি। আত্মা বা জ্ঞানে যাহা জ্ঞানই হয় না, তাহা দ্বারা কোনও ভালমন্দ, সুখ-দুঃখও ঘটে না। ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ বোধ হইলেই বুঝিতে হইবে সেই বিষয় আমার জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে অর্থাৎ তদ্বিষয়ের সংস্কার আমার আছে; কাজেই সংস্কার, স্মৃতি ও কর্ম্মফলে কোনও প্রভেদ নাই। মোট কথা যাহাতেই আত্মাতে স্পন্দনগত ভেদ জন্মে তাহাই স্মৃতি, তাহাই সংস্কার, তাহাই কর্ম্মফল। যে স্পন্দনগত ভেদে জগতের সমস্ত ভেদ সেই স্পন্দনের ভেদকেই কর্ম্মফল, সংস্কার, স্মৃতি বল অথবা শুধু-স্মৃতি বা সংস্কার যে কোনও একটা নাম দেও, আত্মায় প্রকার ভেদের জ্ঞান লইয়া যে রকম প্রকার ভেদ কর, তাহাতেই প্রকার ভেদ হইবে। প্রকার ভেদ রহিত অবস্থায় কোনও গোলমাল নাই।

প্রকার ভেদ অবস্থায়ই যত ইতি গোলমাল। সংস্কার প্রভাবেই এই রকমওয়ারী জ্ঞান ও প্রকারভেদ বুদ্ধি।

আত্মা এক সময়ে দুইটা ধারণা করিতে পারে না ইহা সর্ব্ব-দার্শনিকেরাই স্বীকার করিতেছেন; অথচ জ্ঞানে বহু জ্ঞান যুগপৎ বর্ত্তমান, ইহা স্মৃতি বা সংস্কারের ফল বই আর কিছুই নয়। যে বিষয়ের স্মৃতি আত্মাতে বদ্ধ হয় আত্মা তদ্রূপ ক্রিয়া-বিশিষ্ট বা সংস্কার-বিশিষ্ট। আমরা ভাষাযোগে ধরিয়া রাখি বলিয়াই যাবতীয় ব্যাপার ভাষা-মূলক স্বরূপেই স্বরূপ বিশিষ্ট। ভাষা বাদ দিলে কোনও স্বরূপ থাকে না। বর্ত্তমানে ইন্দ্রিয়যোগে যাহা স্বরূপ বুঝি, ইন্দ্রিয়-অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় আর তাহার কোনই স্বরূপ খুঁজিয়া পাই না। বর্ত্তমান দেহও যেরূপ ক্রিয়া বিশিষ্ট তাহাও আমার আত্মার স্মৃতি বা সংস্কারমূলে যেরূপ ক্রিয়া বর্ত্তমান, তদনুরূপ। যে সমস্ত ব্যাপার আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে অথচ আমার স্মৃতিতে নাই তদনুরূপ ক্রিয়া আমার দেহে বা আত্মাতে নাই, ও তদনুরূপ সুখ-দুঃখও আমি ভোগ করি না। আমার আত্মার সংস্কারানুরূপ ক্রিয়া দেহে হইয়াই ব্যাধি, পীড়া প্রভৃতি ভোগ করি, ইহারই নাম কর্ম্মফল। ভাষায় স্বরূপ নির্ণয় হয় না বলিয়াই আত্মা কোন এক ব্যাপারকেই বহু সংজ্ঞা-শব্দ-দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে; এজন্য কর্ম্মফল, স্মৃতি ইত্যাদি নামান্তর হইয়াছে। প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে ভাষার কোনও সংস্রব নাই বলিয়াই, যে কোনও বিষয়ই বুঝিতে যাই তাহাতে বহু শব্দাড়ম্বর প্রয়োগের প্রবৃত্তি হয়। বিষয়টা কতদূর তোমাকে বুঝাইতে পারিলাম তাহা নিজেই বুঝিলাম না।

[(৩)—জ]

শৈশবে ইন্দ্রিয়গুলি সকলই বর্ত্তমান ছিল ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি সবই ছিল। জিহ্বায় তিতা-মিঠা-বোধ ছিল এবং সুখ-দুঃখ, ক্ষুৎ-পিপাসা বোধ ছিল। ভাষার জ্ঞান অর্থাৎ বিষয়টা কল্পনা করিবার শক্তি ছিল না বলিয়া, তৎকালীন অবস্থার আর কোন স্মৃতি বা সংস্কার নাই এবং সেই সময়ের কার্য্যাদির, সংস্কারানুরূপ কোন অনুশোচনা, ভাল-মন্দ প্রভৃতি বিচারও প্রাণে জাগে না। তৎকালীন ক্রিয়াজনিত কর্ম্মগুলির দরুণ লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম কোন চিন্তাই আত্মাতে উদ্রেক হইয়া যাতনা বা হর্ষ-বিষাদের কোন কারণ জন্মায় না। বর্ত্তমান জ্ঞানেও যদি ভাষাযোগে কল্পনা করিয়া বর্ত্তমান কার্য্যগুলি স্মৃতিতে না রাখিয়া ঐরূপ সংস্কার-বদ্ধ-না হইতাম, তাহা হইলে এই দেহান্তে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কারানুরূপ কোনও সংস্কারই আমাতে থাকিত না ; কেবল অস্পষ্ট ভ্রান্তিমূলক দ্বিত্ব-জ্ঞান আমাতে থাকিত।

এই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট অবস্থায় ঐ দ্বিত্ব-জ্ঞানের স্বরূপ তালাস করিতে গেলেই, আমি কোন মীমাংসা দ্বারাই মীমাংসা করিতে না পারিয়া আমার আত্মস্বরূপে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা স্বতই প্রবল হইত। ক্রমান্বয়ে সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারানুরূপ দেহ পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করায় ও ক্রমান্বয়ে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায়

যাতায়াত হয়, অর্থাৎ পশ্বাদি জন্মের প্রতিকারণ কিছুতেই হইতে পারে না। সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যেই সংস্কারানুরূপ জ্ঞান নিয়া ঘুরিতেছি, এই জন্যই নির্গমের পথ পাই না।

[(৪)—স্থ]

কি রকম করিয়া যে যাইব তাহার কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; তবে প্রকৃতি ফেলিয়া যাওয়ার যো নাই, প্রকৃতি লইয়াই যাইতে হইবে এবং প্রকৃতি অনুরূপই ফল লাভ হইবে। বর্ত্তমান অবস্থা কি প্রকৃতি অনুরূপ নয়? আমার প্রকৃতির বাহিরে কি আমাকে এরূপ অবস্থা পাইতে হইয়াছে? প্রকৃতির বিরুদ্ধ বিষয় তো প্রকৃতি করে না। অগ্নির আলিঙ্গন প্রার্থনীয় নয়, অথবা অখাদ্য আহারেও আমার রুচি নয়। অতএব আমার প্রকৃতির অনুকূল ব্যাপারই আমার জন্য যোজনা হইয়াছে ও হইবে।

সুখের অভাব মনে করি; সুখ যে কিসে আছে বা হইবে তাহা জ্ঞানে জ্ঞান না জন্মিলে, ভুলে যাহা করা যায় তাহাই করিতেছি; ভুল অবস্থায় ঠিক করিতেছি ভাবাও ভ্রান্তির কার্য্য। বিপরীত সংস্কার বা জ্ঞান চিন্তানুধ্যানের পার্থক্যে যখন বদলাইয়া যায়, তখন উক্ত সংস্কারের বা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আশা করা যায়। সংস্কারের মাত্রার পরিমাণ অনুসারেই সংসার-জ্ঞানের পার্থক্য বা ভেদ। নিয়ত সঙ্গ দ্বারা সর্ব্বদা অনুধ্যান চিন্তা না জন্মান পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব সংস্কারের পরিবর্ত্তন ইচ্ছা ভ্রান্তি। মানুষের সংস্কার যে প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা পূর্ব্ব সংস্কার হইতে

পরবর্ত্তী সংস্কার প্রবল না হইয়া আর হয় না। বর্ত্তমানে যে সংস্কার প্রবল তদনুরূপই চিন্তা আসিবে ও তদনুরূপই অনুধ্যান করিব। এজন্য সর্ব্বাবস্থায়ই গুরুচিন্তার বিধি করিতে গিয়া ঋষিরা শৈশব হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম চিন্তার বিধি করিয়া গিয়াছেন। শয়ন, উপবেশন, ভোজন ইত্যাদি সর্ব্বাবস্থায়ই ধর্ম্ম চিন্তার উপায়ও হিন্দু শাস্ত্রে আছে। আত্মস্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞান না হইয়া, আত্মভ্রান্তি বা ঠিক জ্ঞান নির্ণয় করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

[(৫)—জ]

মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ, তথাপি ভবিষ্যতের কল্পনায় বিন্দুমাত্রও বিরত নয়। পরিষ্কারই দেখিলাম নাতি বা নাতিন হইবে, ইহা করিব উহা হইবে, এই করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি কত কল্পনাই করিয়া কত কি ভাবিয়াছি; তাহার আত্মীয় বন্ধু কত কি ভাবিয়াছে; সেই কল্পনার পরিণাম যে এই তাহা কখনও কল্পনায় কল্পনাও আসে নাই। সেই মৃতদেহ দেখিয়াও ঐ সব কল্পনা যে ভুল তাহা জ্ঞানে জ্ঞান জন্মিয়া লজ্জাবোধ না হইয়া, সেই সব কল্পনামূলে যাতনা হইতে থাকে। মানুষ যদি স্বরূপ অবস্থা বুঝে অর্থাৎ কাহার কখন কি হয় অনিশ্চিত, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কল্পনারও বিরাম থাকে; তাহা হইলে এত যাতনা হওয়ার কারণ কি হয়?

✓যাহার সম্বন্ধে কোনই কল্পনা করি না, তাহার সম্বন্ধে ভাল-মন্দেও কোনও ভাল-মন্দ অনুভব করি না। ভবিষ্যৎ কল্পনা মানুষের ভ্রান্তি

ভিন্ন স্বরূপ-জ্ঞানে কিছুতেই সম্ভব হয় না। বর্ত্তমানে আমার যে অবস্থা বর্ত্তমান সেই অবস্থানুসারেই কল্পনা করিয়া থাকি। দশ বৎসর বা পাঁচ বৎসর পরে আমার যে পরিবর্ত্তন হইবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ সঙ্গ ও কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আমারও পরিবর্ত্তন হইতেছে। আবার ইহাও দেখিতে পাই যে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কল্পনার পরিবর্ত্তন হয়; স্নুতরাং ভবিষ্যৎ কল্পনা যে কল্পনাতেই পরিণত হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? বর্ত্তমানে অতীতের কল্পনানুরূপ কল্পনা আছে কি না তালাস করিয়া দেখিলেই অনেকটা বুঝা যায়। তোমার ১০ বৎসর পূর্ব্বে গুরু বলিয়া কোন একটা কল্পনা আসিয়াছিল কি? বর্ত্তমান সাধনার অনুরূপ কল্পনা করিতেও তুমি ঘৃণা বোধ করিয়াছ।

দেশ কাল ভেদেও কল্পনার পরিবর্ত্তন হইতেছে; ধুব্‌ড়ী গিয়া আবার নর্থলক্ষীমপুর যাইবে ইহা কল্পনা কর নাই; অথচ অবস্থা ও কার্য্যে ঘটিল। আবার সেখানে গিয়া সেইরূপ কল্পনায় আসিতে লাগিল; পূর্ব্বে যে কল্পনা করিয়াছিলা, সে কল্পনা সর্ব্বৈব ভুল। আমি এই ব্যাপারে ইহা পরিষ্কারই বুঝিলাম ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা মানুষের ভুল এবং ঐ কল্পনামূলেই আবার মানুষকে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হয়; কল্পনায় যাহা কল্পনা ছিল তাহা সকলি ভুল প্রমাণ হইলেও কল্পনার বিরাম কোথায়? বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় সমরের কল্পনা বোধ হয় দশ বৎসর পূর্ব্বে কাহারও কল্পনায় কল্পনাও আসে নাই। বর্ত্তমানে সমস্ত পৃথিবীর লোক এই যুদ্ধের কল্পনা নিয়া অস্থির। এই যুদ্ধের পরিণাম কি দাঁড়াইবে তাহা হয়ত কারো

কল্পনায়ও কল্পনা হইতেছে না। মানুষ রাতদিন মরিতেছে ; মৃত্যু কল্পনা মানুষের ভ্রমেও প্রাণে জাগে না, অথচ মৃত্যু ধ্রুব সত্য। এই পরিবর্ত্তনশীল দেহে অপরিবর্ত্তনীয় সুখের কল্পনা, ইহা যে কল্পনা বলিয়া বুঝি না ইহা অতি আশ্চর্য্য। বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অবস্থা ভেদে দেহের ভেদ হইতেছে, তৎসঙ্গে কল্পনারও ভেদ হইতেছে, পীড়া ইত্যাদি কল্পনায় ভেদ হয় তথাপি বর্ত্তমান অবস্থার কল্পনা, ভবিষ্যতের পক্ষে কল্পনা জ্ঞান হয় না, ইহা অপেক্ষা ভ্রান্তি আর কি ? কল্পনার বিপরীত ফল দেখিয়াও কল্পনা ভুল বলিয়া বুঝি না। কল্পনা ভুল বুঝিবার অন্য উপায় আর কি আছে ?

[(৬)—জ]

বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বুঝিতেছি ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তথাপিও ভবিষ্যতের কল্পনার বিরতি নাই, ইহা কি মোহের কার্য্য নয় ? ভবিষ্যতের কল্পনা যখন প্রত্যক্ষরূপে ভুল দেখি, তথাপিও কল্পনাকে কল্পনা বুঝি না। ভবিষ্যৎ যদি বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ করি তবে ভবিষ্যৎ কোথায় ? আর ভবিষ্যৎ যদি বর্ত্তমানেও বর্ত্তমান থাকে তবে বর্ত্তমান জ্ঞান দিয়া ভবিষ্যতের কল্পনা যে ভুল তাহা কি বুঝা উচিত নয় ? পরিবর্ত্তনশীল দেহে বর্ত্তমানে যে অবস্থা ভবিষ্যতে সে অবস্থা কিছুতেই থাকিতে পারে না ; সুতরাং বর্ত্তমান জ্ঞানে ভবিষ্যতের কল্পনা যে কল্পনা ইহা বুঝিতে জ্ঞানে জ্ঞানাভাব হয় কেন ? মানুষ কেবল ভবিষ্যতের কল্পনা নিয়াই আছে ; নচেৎ আমার বর্ত্তমান

অবস্থাই বর্ত্তমান। যাহার দ্বারা বা যাহার সম্বন্ধে যতই সুখের কল্পনা করি তাহার অভাব হইয়া গেলে কল্পনাকে কল্পনা বলিয়া স্বীকার করি না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? জগতের সকল পরিবর্ত্তনশীল, অথচ আমার বর্ত্তমান জ্ঞানের কল্পনা ঠিক, এরূপ বেঠিক সিদ্ধান্ত বর্ত্তমানে, ঠিকে পৌঁছান কি সম্ভবপর? যুক্তিতর্কের কথা দূরে থাকুক বর্ত্তমান জ্ঞান দিয়া দেখিলেই দেখি কত পরিবর্ত্তন হইতেছে; যাহা কল্পনায় কল্পনাও করি নাই, তাহা ঘটিতেছে। যাহা কল্পনা করিয়াছি সে কল্পনানুরূপ কোন কার্য্যই হইতেছে না; তথাপিও কল্পনাকে কল্পনা বলিয়া বুঝিতে পারি না। এই কল্পনা যে মোহবশে করিতেছি তাহাও মোহে জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না। যাদের দ্বারা সুখী হইব বলিয়া কল্পনা করি অথবা যাদের সুখ বিধানের জন্য কল্পনা করি, কল্পনার পরিবর্ত্তনে তা'রা বা আমি কোন্ অবস্থাকে সুখ বুঝিব তাহা বর্ত্তমান কল্পনায় ধারণাও হয় না; অথচ কল্পনার বিরতি নাই।

কল্পনা বাদ দিলে আমার কি থাকে, এই কল্পনা-বিশিষ্ট অবস্থায় তাহাও ধারণা হইতেছে না। জীবনের অতীত ঘটনার স্মৃতিতে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে যে কল্পনানুরূপ কোন কর্ম্মই হয় নাই অথবা যে সুখের জন্য কল্পনা করিয়াছি সে সুখের অভাব বর্ত্তমানেও বর্ত্তমান, তথাপি কল্পনায় সুখের স্বপ্ন দেখিতে ভুল হয় না। হায়রে মোহের অপার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াও মোহকে মোহ বুঝি না, তবে বুঝিবার উপায় কি? আমি চলিয়া গেলে

যাহার সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিতেছি তাহা সর্ব্বৈব ভুল হইবে। চলিয়া যাওয়ার কালও নির্দ্দিষ্ট নাই, উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইলেই আশঙ্কা আসে। এই অবস্থায় কতকাল আছি ইহা আমার জ্ঞানে নিশ্চয় নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কল্পনার বেলায় বাঁচিবার কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াই কল্পনা করি, নচেৎ কল্পনা হয় না। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীবাসীর যে ভীষণ কল্পনা ও চিন্তা চলিতেছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখের যে পরিবর্ত্তন হইতেছে ইহা কেহ কি কোনদিন কল্পনা করিয়াছে ? মহামারীতে দেশ বিশেষ উৎসন্ন যাইতেছে, তদ্দেশবাসীর সেই কল্পনা ভ্রমেও আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। মানব কেবল সুখের কল্পনায় উন্মত্ত; আবার সেই কল্পনায় কল্পনানুরূপ কার্য্য না হওয়ায় দুঃখে অধীর হয়। জ্ঞানের অপ্রত্যক্ষ ব্যাপারে সুখের কল্পনা করিয়াই দুঃখের সৃষ্টি করিতেছি। ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বুঝিতেই ভ্রান্তি হয়; ইহার উপায়, অহং জ্ঞানের অতীত অবস্থায় নেওয়ার উপায়, গুরু।

[(৭)—জ]

এই বর্ত্তমান জ্ঞান কি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ফল না? আবার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ফল বলিয়াই বা স্বীকার করি কেমন করিয়া ? ইন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানে থাকে না। কেবল কল্পনায়ই কল্পনানুরূপ ধরিয়া রাখিয়া যে নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি এ কল্পনাকে

কল্পনা না বুঝিলে কিছুতেই এ জগৎ-মোহ ঘুচিবে না। অহং জ্ঞান রহিতকারী গুরুচিন্তা অহং এর কল্পনা রহিত করিবার একমাত্র উপায় ; দ্বিতীয় উপায় কল্পনাকে কল্পনা মনে করা। এই দুই উপায়ের কোন উপায় অবলম্বন না করিলেই কল্পনানুরূপ জ্ঞানে কল্পনা আসিয়াই রাতদিন লোককে বিভ্রান্ত করে ও করিবে।

যে পর্য্যন্ত জীব, স্বীয় কল্পনাকে কল্পনা না বুঝিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত কল্পনা অনুরূপ জগৎ, জ্ঞানকে আবরণ করিয়া, আত্মস্বরূপ অদৃশ্য রাখিবেই রাখিবে। বর্ত্তমানেও আমার কল্পনার আবরণে আমিই আমার অজ্ঞাত অবস্থায় কল্পনানুরূপ কর্ম্ম নিয়াই ব্যস্ত। ইন্দ্রিয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে 'কি আর কেন'—এই প্রশ্ন আইসা। জ্ঞানে জ্ঞানাভাব না থাকিলে কি এইরূপ জিজ্ঞাসা আসে ? যেখানেই প্রশ্ন, সেইখানেই জ্ঞানাভাব স্বীকার করিতেই হইবে। জ্ঞানের পূর্ণাবস্থায় জানিবার ইচ্ছা থাকে না, জানিবারও কিছু থাকে না।

[(৮)—জ]

এই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ও কল্পনার ভেল্কী বা ভোজবাজীময় জগৎ আমার "জগতের" জ্ঞানে কোন এক সময় ভেল্‌কী বা ভোজবাজী বলিয়া জ্ঞান হইবে না ? তবে কি গুরুই একটা কথার কথা, না কল্পনা ? গুরু "জগৎকে" কল্পনা বুঝাইতে চান, "জগৎ" জগৎকে

ঠিক বুঝে ; জগতের জ্ঞানে "জগৎ" ঠিক বুঝে, না, গুরু-জ্ঞানে "জগৎ" জগৎ ঠিক বুঝে ? গুরুর জ্ঞানে বা গুরুজ্ঞানে জগৎ বলিয়া কোন কল্পনাই সম্ভব হয় না। কল্পনায় আমাকেই আমি অনন্ত অবস্থায় নিয়া অনন্তরূপ বুঝি ; গুরুকে এক রূপ কেমন করিয়া বুঝিব ? তাই কল্পনায় যখনই যে অবস্থাপন্ন হই, তখনই গুরুকে আবার সেইরূপ বুঝি ও সেইরূপ দেখি। এই কল্পনাময় সংসারকে সত্য বুঝি বলিয়াই জীবের এই আতঙ্ক উপস্থিত হয় যে আর বুঝি কূল পাই না ; এই অকূল কেবল কল্পনার জ্ঞানেই জ্ঞান হইতেছে। কল্পনার কল্পনাভাব হইলে আর ওকূল একূল দুকূল কিছুই নাই। গুরু ভ্রান্তির অপর পারের জিনিস আমি তার সঙ্গে আছি, অথচ দুই জন দুই পারে। এই দুই জন জ্ঞানই দুইপারে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইতেছে। যখন আমি গুরুসঙ্গে তখন আমার আমিও নাই, এপার ওপারও নাই ; আমার হা হতোস্মি কিছুই নাই। ভ্রান্তি আসিলেই আমার গান আসে—

"আমায় পারে নিয়ে চলরে দয়াল, দয়াল আমায় পারে নিয়ে চল।"
গুরু তুমি হে পতিতের বন্ধু, এমন বন্ধু আর কে বল ?
মাঝি নয় সে কাজের কাজি,
ভব সাগরের মাঝামাঝি,
আমার দাঁড়ী ছয়টা বিষম পাজি
উজান গাঙ্গে ভাটি দিল ॥"

অহং বুঝে যখন গুরুকে বুঝি তখন বুঝানুরূপ গুরুর এক বেশ অপরূপই দেখি। আমার কল্পনা ও সঙ্গের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে

গুরুরও নানারূপ ও নানা আকার দেখি। দেখিতে দেখিতে মাঝে মাঝে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন হঠাৎ স্মৃতিতে গুরু আসিলে খুঁজিয়া দেখি আমার বুকের মধ্যে গুরু ডুব দিয়া লুকাইয়া আছেন।

তোমার মা, ভাই, ভগ্নি, ইহাদিগকে, "জগৎ", তা'র না বুঝিয়া গুরুর বুঝিলে সব দায় যায়। "জগতের" ক্রিয়াদ্বারা ত তাহাদের পোষণ হইতেছে না; 'হুঁ'র 'উ'রঘাট হইতে ক্রিয়া হইয়াই তাহাদের প্রকৃতি অনুরূপ পোষণ হইতেছে। অহং বুঝ্‌টা যে অহং বুঝ্‌ অনুরূপ কার্য্য করিতেছে তাহাও গুরু-দ্বারাই হইতেছে, আমি করি এই ভ্রান্তিটা কেন থাকে? * *

"জগতের" আমি সবই করি, তবে চীৎকার কেন? না বুঝিয়া, কি বুঝিয়া? বুঝাবুঝির কিছুই নাই; বুঝিতে গেলেই গোল ঘটে। বুঝাবুঝি থাকিতে সর্ব্ব অবস্থায়ই গুরু থাকা দরকার; না হইলেই, মোহ আসিয়া চীৎকার আসিবে। গুরুবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলেই গুরু লঘু হইয়া পড়ে, গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন; গুরুবাক্যানুরূপ ফল ধ্রুব নিশ্চয়। সুস্থ ও রুগ্ন সর্ব্বাবস্থায় গুরুর "জগৎ"-চিন্তা তবুও "জগতের" চিন্তা কেন? সুস্থ ও রুগ্নাবস্থায় গুরুর কোন ভেদ হয় কিনা এইটা দেখিবার জন্য দিন দিন বড়ই সাধ হইতেছে। বাবা, ভয় খেও না।

[(৯)—জ]

খেলায় খেলায় হেলায় হেলায় দিন চলিয়া যায় মনে হইলেই অস্থিরতা আসে; আবার খেলায় মনোনিবেশ করিলে আর মনে থাকে না বেলা কতক্ষণ আছে। খেলার সময় সূর্য্যাস্তের বাকী কত এই চিন্তা ও লক্ষ্য থাকা অতি আবশ্যক। দেহে আমাকে বদ্ধ করে না; কল্পনায় যে বদ্ধ হই, ইহা কল্পনার বেলায় কল্পনা আসে না। কল্পনাই সময়কে অসীম অনন্ত করিয়া দেখাইয়া আশার ছলনায় জীবকে ঘুরাইতেছে। এখন এক রকম সুস্থ হইয়াছি, এদিকে আর বেলা যায় যে, এই লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছি। রুগ্ন অবস্থায় যেন ভাল ছিলাম; প্রতিনিয়তই সঙ্গের সঙ্গীর তালাস ছিল। যারা কেহ সাথীর সাথী নয় এখন যেন তাদেরই বেশী আত্মীয় মনে করিতেছি। যাহা হউক গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে আর চিন্তা কি ?

[(১০)—যো, এ]

জীব বা মানব নিজের ভুলের ফল নিজে ভোগ করে; ভুলের ফল ঠিক অনুরূপ হয় না। যে কর্ম্ম যে ফলাকাঙ্ক্ষায় করি কর্ম্মে ভুল থাকিলে ফলেও ভুল থাকিবে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান নিয়া আসিয়া দেখিতে পাই ইন্দ্রিয়ে ২টা যুগপৎ ধারণা করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়যোগে একটা বিষয় অনুভব করিয়া আবার আর একটা দেখিতে, শুনিতে, বুঝিতে গেলেই পূর্ব্বের জ্ঞানানুরূপ জ্ঞান জ্ঞানে অভাব হইয়া অপর

জ্ঞান হইতে থাকে। যথা, যখন চক্ষে সাদা বা শুভ্রবর্ণ দেখে তখন কাল অনুরূপ জ্ঞান অভাব। জিহ্বায় যখন মিষ্টি বোধ কর, তখন তিক্ত ও টক জ্ঞান অসম্ভব। স্পর্শে উষ্ণ বোধ হইলে, শীতল বোধের অভাব। কর্ণে এক শব্দ শুনিলে অপর শব্দের জ্ঞান অভাব থাকে। এই প্রকার সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই এক জ্ঞান ভিন্ন যুগপৎ দুই বা ততোধিক জ্ঞান জ্ঞানে জ্ঞান হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ে যাহা বুঝায় তাহা বেঠিক বুঝিবার অপর কোন যন্ত্রই আমার জ্ঞানে জ্ঞান নাই। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের বুঝ্‌কে অস্বীকার করা বা ঠিক না বুঝাই আমার ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি বশেই বাক্য বা সংজ্ঞা-শব্দ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা আসে এবং ইন্দ্রিয়ের বুঝের সমস্ত ব্যাপার ধরিয়া রাখিতে কল্পনা করি। এই কল্পনা ঠিক বুঝাই ভ্রান্তি, এই হেতু কল্পনার ফলও ভ্রান্তি। কল্পনানুরূপ জ্ঞানে কল্পনাকে ভ্রান্তি বুঝা যায় না।

অপর পক্ষে আবার সেই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ বর্ত্তমান থাকিয়া আমি বর্ত্তমান আছি; এবং যে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ উৎপত্তির পর আমার আমিত্বের উৎপত্তি ও যে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের অভাবে আমার অভাব ও বর্ত্তমানতায় আমার বর্ত্তমানতা, সেই আকর্ষণাত্মক অবস্থায় যখন বিক্ষেপণের জ্ঞান অভাব হয়, তখন আমার জ্ঞানের স্বরূপ কি বুঝি না। আবার বিক্ষেপণের প্রবল অবস্থায় আকর্ষণের জ্ঞান বিলোপে জ্ঞানের স্বরূপ কি তাহাও বুঝি না। এ অবস্থায় আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ উভয় যখন আমার জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন আমার বুঝ্‌ উভয়ের মিশ্রণানুরূপ একটা রূপ ধারণ করে; এই মিশ্রিত রূপের সহিত অপেক্ষা করিয়া জগতের সকল রূপ বুঝি। তাহা হইলে শুদ্ধ আকর্ষণাত্মক অবস্থানুরূপ আমার স্বরূপ বা কেবল বিক্ষেপণানুরূপ

আমার স্বরূপ যখন বুঝি না তখন যে দুইটার মূলে আমি তাহার কোনটারই স্বরূপ বুঝি না। এই জন্যই ইন্দ্রিয়ের বুঝ্ ও কল্পনা এই উভয়ের মিশ্রণানুরূপ একটা অবস্থা বুঝি। দেখাও যায় যে কেবল ইন্দ্রিয়ের বুঝ্‌টা নিয়া আমি থাকিতে পারি না; আবার ইন্দ্রিয় জ্ঞানে জ্ঞান হয় নাই এমন বিষয় কল্পনা করিয়াও সেই কল্পনা নিয়া থাকিতে পারি না। আত্মা ইন্দ্রিয় সংযোগে ইন্দ্রিয়ানুরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া কল্পনা দিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। ইহার মূল কারণ এই যে, আকর্ষণের স্বরূপ বা বিক্ষেপণের স্বরূপের কোনটাই আমার বর্ত্তমান জ্ঞানে জ্ঞান নাই। এই হেতু এই উভয়ের মিশ্রণে যে জ্ঞান হয়, তাহা ইন্দ্রিয় ও কল্পনার মিশ্রণ ভিন্ন স্থির বা স্থায়ী থাকিতে পারে না। যে ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিয়াই তুমি আসিয়াছ, সেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে তুমি রাজী নও এবং তৎকালীন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাহিরেও তোমার জ্ঞানের কোন স্বরূপ নাই। সেই জ্ঞানের স্বরূপানুরূপ বুঝ্‌কে ঠিক না বুঝাই তোমার ভুল; সেই ভুল হইতেই কল্পনার উৎপত্তি। এখন কল্পনায় এমন ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হইয়াছ, যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ তোমার স্বরূপ বা রূপ ছিল তাহা এখন আর খুঁজিয়াই পাও না। তাহার প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমানে তোমার কল্পনা-বাদ দিলে তোমার আমিই থাকে না।

যে কল্পনা-মূলে তোমার নিজের ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ স্বরূপকে ভুল করিয়া দিয়াছে, সেই কল্পনা-মূলে তুমি ভুলে পড় নাই, ইহা জ্ঞান হওয়া আশ্চর্য্য; অপিচ এই জ্ঞানে স্বরূপানুরূপ জ্ঞানটা ভ্রান্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। সুতরাং কল্পনা ব্যতীত গুরুর স্বরূপ ধারণাই করিতে পার না; গুরুর অকল্পিত রূপ তোমার জ্ঞানে ভ্রান্তি বলিয়া বোধ হইয়া

আর আবশ্যক বোধ কর না। কল্পিত স্বরূপে কল্পনাকেই ঠিক বুঝ এবং কল্পনা নিয়াই দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতে ভালবাস।

[(১১)—যো, এ]

জ্ঞান বা আমি অথবা আত্মা দেহ-বিশিষ্ট হইবার পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিল, তাহা দেহ-বিশিষ্ট হইয়াই ভুলিয়া গিয়াছে। এখন দেহানুরূপ জ্ঞানে যাহা জ্ঞান হইতেছে, সেই জ্ঞানানুরূপ বিষয়কেই আত্মা বিষয় বলিয়া বুঝিতেছে। ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহাভাবে আত্মার ইন্দ্রিয়ানুরূপ কিছুই ছিল না। হয়, স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মার বা জ্ঞানের আত্ম-স্বরূপই জ্ঞানের বিষয় ছিল। আমরা বর্ত্তমানে যে জ্ঞান দিয়া বুঝিতেছি তাহাতে পরিষ্কারই বুঝি যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ও সংস্কার বাদ দিলে আত্মার আত্ম-স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানাভাবে ইন্দ্রিয় সংস্কারও সম্ভব হয় না; তাহা হইলে ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় সংস্কার উভয়ই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ফল। এখন বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আত্মার আত্ম-স্বরূপই প্রকৃত স্বরূপ; না ইন্দ্রিয় জ্ঞান-যোগে আত্মার যে প্রকার-ভেদ হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত স্বরূপ। উভয় অবস্থার জ্ঞানে উভয়কেই স্বরূপ বা ঠিক বুঝি। প্রকৃত পক্ষে ঠিক জ্ঞানে কোন্‌টা ঠিক, ইহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত অবস্থা ধারণাই হয় না! আবার স্বরূপ জ্ঞানেও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ভেদানুরূপ জ্ঞান থাকে না। উভয়টা জ্ঞানের বিষয় না হইলে ঠিক বেঠিক নির্ণয় করা যায় না। ইন্দ্রিয় জ্ঞান-মূলে বাসনা ও অভাবের

সৃষ্টি ; ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় বাসনা ও অভাব কিছুই ছিল না। বর্ত্তমান জ্ঞানেও আমরা পরিষ্কার বুঝিতেছি যে, বিষয় অভাবে বাসনা ও অভাব বোধ সম্ভবপর নয়। যে অভাবের অভাব করাই বর্ত্তমান জ্ঞানের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই অভাব-রহিত অবস্থা আত্মার স্বরূপ অবস্থা স্বীকার করিতে হইবে। আজকালকার লোক আমাদের কল্পনা-মূলে ক্রমোন্নতি হইয়াছে বলিয়া সদর্পে চীৎকার করিতেছে ; অথচ আত্মার অবনতির অবস্থায় কি স্বরূপ ছিল তাহা কল্পনা বাদ দিয়া জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না। যে দুইটা অবস্থা তুলনা করিয়া উন্নতি অবনতি বলিতেছে, তাহার একটা অবস্থা জ্ঞানে জ্ঞানই হইতেছে না অর্থাৎ কল্পনা বাদ দিয়া শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আত্মার কি স্বরূপ থাকে তাহা বুঝিতেছে না। এমন কি কল্পনা বাদ দিলে আত্মাই থাকে না বলিয়া ভ্রান্তি হয় ; এ অবস্থায় উন্নতি হইতেছে বলা ভ্রান্তি বা কল্পনা বই আর কিছুই নয়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের এই বর্ত্তমান জ্ঞানে পরিষ্কারই দেখিতে পাই যে, ভ্রান্তির অবস্থায় স্বরূপের জ্ঞান থাকে না। যতক্ষণ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রান্তিতে জন্মে, ততক্ষণ রজ্জু জ্ঞানের অভাব থাকে। যখন ভ্রান্তি দূর হইয়া রজ্জু জ্ঞান আসে, তখন জ্ঞান জ্ঞানের ভ্রান্তিটি বেশ বুঝিতে পারে। আত্মার যখন পূর্ব্ব স্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞানই হয় না, তখন এই কল্পনামূলক জ্ঞানকে ভ্রান্তি বই আর কি বলিব ? বর্ত্তমান জ্ঞান ঠিক হইলে পূর্ব্বের ভ্রান্তি জ্ঞান জ্ঞানে বুঝিতে পারিত। জ্ঞানের স্বরূপই ভ্রান্তি বুঝে ; ভ্রান্তিতে ভ্রান্তির অবস্থা বই স্বরূপ বুঝে না। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থা ভ্রান্তি না ঠিক চিন্তা করিয়া দেখিবে।

[(১২)]

মানব-আত্মা যখন ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট দেহ নিয়া সংসারে আসে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে, তখন ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহা বুঝে, সে বুঝ- আত্মাতে বদ্ধ হয় না; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রত্যক্ষ অবস্থায় একটা ক্রিয়া হয়, আবার অপ্রত্যক্ষে সেই ক্রিয়া চলিয়া যায়। এই প্রকার বহু বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইয়া বহু জ্ঞান হয়; আবার বস্তু অভাবে সব জ্ঞানই জ্ঞান হইতে অভাব হয়। যথা, তুমি রাস্তাঘাটে বহুলোক ও বহুস্থান ও বহু প্রকার বৃক্ষ, বস্তু আদি দর্শন কর; কিন্তু দর্শনকালে যেরূপ জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, স্থানান্তরে গিয়া ঐ সব বিষয়ের স্মৃতি না থাকিলে তদ্‌বস্তু অনুরূপ কোন ক্রিয়াই তোমাতে থাকে না। এই কথায় ইহাও পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, দত্ত সংজ্ঞা দ্বারা অর্থাৎ শব্দ দ্বারা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়গুলিকে স্মৃতিতে বদ্ধ না রাখিলে তদ্‌বস্তু জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানাভাবে কোন ক্রিয়াই আত্মাতে অর্শিত না। স্মৃতিমূলে আত্মায় যে ক্রিয়াগত ভেদ হইয়া যে অবস্থান্তর হয়, সে অবস্থা আমি ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিয়া জন্মিবার সময় ছিল না। এই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কল্পনার বিষয়গুলি নিয়া আমরা বিষয় বিশেষকে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ কল্পনা করি। সেই কল্পনাগুলি জ্ঞানে ঠিক ধারণা থাকা সময়ে তদ্বিপরীত কর্ম্ম বা ব্যবহার (আচরণ) করিতে পারি না। যথা পরদার গমন পাপ, এই ধারণা দেহের ক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া যতক্ষণ স্থির থাকে, ততক্ষণ আমি পরদার-রত হইতে পারি না। আবার যখন দেহের

ক্রিয়া প্রবল হইয়া ঐ পাপ সংস্কার অতিক্রম করি, তখনই ঐ প্রকার আচরণ করিতে সমর্থ হই। এখন দেখ অহং জ্ঞানের ন্যায়া-ন্যায় সংস্কার অতিক্রম করিয়া পাপ স্পৃহা কতদূর প্রবল হইলে তুমি পাপাচরণ করিতে পার অথবা হ-কারের কতদূর প্রবল অবস্থায় পাপাচরণ সম্ভবপর সহজেই বুঝা যায়। তদবস্থায় অহংএর মানবোচিত স্বাভাবিক গতি থাকে না; সুতরাং তদ্‌গতিবশে পশ্বাদি জন্ম অনিবার্য্য। ইহা দ্বারা পরিষ্কারই প্রমাণিত হইতেছে যে, অহং জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা ঠিক বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই সঙ্গত জ্ঞান জ্ঞানে বর্ত্তমান থাকিতে মানবদেহ হইবেই হইবে। আবার ক্রিয়াধিক্যে মানব জ্ঞান বিগর্হিত কর্ম্ম যখন করি, তখন পশ্বাদি তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্তির কারণও হইবেই হইবে। মানবোচিত অহং জ্ঞান স্থির রাখে, এমন সব সংস্কার বর্ত্তমানে আত্ম-স্বরূপে যাওয়া বা গুরুজ্ঞান লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অহং জ্ঞানের সংস্কার বর্জ্জন না করিয়া কিছুতেই আত্মা আত্ম-স্বরূপে যাইতে পারে না। আবার অহং জ্ঞানের সংস্কার বর্ত্তমানে সংস্কার অতিক্রম করিয়া বৃত্তি আদির প্রবল অবস্থায় কুকর্ম্ম বলিয়া যাহা জ্ঞানে জ্ঞান আছে তৎকর্ম্ম করিলে পশ্বাদি জন্ম অনিবার্য্য।

সুতরাং আমার সংস্কারই আমার পাপ-পুণ্যের কারণ। এই সংস্কার কল্পনামূলক। আমার এক অবস্থায়ই দুইটা বিপরীত জ্ঞান

হইতেছে ; একটা দেহের অনুভূতি অনুরূপ ঠিক বুঝিতেছি ; আর একটা কল্পনানুরূপ ঠিক বুঝিতেছি। জিহ্বায় রসগোল্লা দিলে মিষ্টি বোধ করি, আবার পরের রসগোল্লা চুরি করিয়া খাওয়া পাপ মনে করি। একই ব্যাপারে এই যে যুগপৎ দুইটা জ্ঞান, ইহার মধ্যে একটাকে ঠিক অপরটাকে ভুল বুঝিতেই হইবে। দেহের বুঝ্‌কে অতিক্রম করিয়া কল্পনার বুঝ্‌কে কিছুতেই ঠিক বুঝি না ; দৈহিক ক্রিয়ার প্রবলাবস্থায় কল্পনাকে কল্পনা বেশ বুঝি। এই বুঝাবুঝি ব্যাপারে যখন কল্পনাকে কল্পনা বুঝিয়া ধর্ম্মের দিকে অর্থাৎ গুরু বা আত্ম-স্বরূপ লাভের দিকে যাই, তখন আমার আত্ম-স্বরূপ লাভ হয় ; আবার দেহানুকূল বিষয় বাসনা প্রবল হইলে, ঐ কল্পনাই তোমার পশ্বাদি হওয়ার কারণ হয়। অপর পক্ষে সংস্কার রহিত অবস্থা ভিন্ন বৈরাগ্যই সম্ভব নয়। যে কারণে অহং জ্ঞানে কল্পনা আবশ্যক হইয়াছে, সেই কারণে অহং জ্ঞান কল্পনারহিত অবস্থায় স্থির থাকিতেই পারে না। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর স্বরূপ না থাকিলে আমারও কোন স্বরূপ থাকে না ; আমার বর্ত্তমান অহং যে কারণে কল্পনার স্বরূপ বাদ দিলে নিজের স্বরূপ খুঁজিয়া পায় না, অস্থির হইয়া উঠে, সেই অস্থিরতাই স্বরূপে নিয়া যায়। অতএব কল্পনা বর্জ্জনই আত্ম-স্বরূপ লাভের একমাত্র উপায়।

[(১৩)—যো, এ]

আমরা বর্ত্তমানাবস্থায় যে কল্পনাযোগে বুঝি সেই বুঝের মধ্যে কল্পনাতীত একটা অবস্থাকেও বুঝি। গুরুর "উ"-কারের ঘাটে উঠিলে কল্পনানুরূপ বুঝ্‌ থাকে না। সুষুপ্তিতে ও ভ্রূণাবস্থায়

বর্ত্তমান জ্ঞানানুরূপ কোন জ্ঞান থাকে না। অতএব কল্পনামূলক জ্ঞানে কল্পনানুরূপ জ্ঞান ও কল্পনাতীত অবস্থানুরূপ জ্ঞান, এই উভয়ই জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে অর্থাৎ জ্ঞানের দুইটা অবস্থা আছে বুঝিতে পারি। কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানে বা সুষুপ্তিতে কল্পনানুরূপ একটা অবস্থা কল্পনাও হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে কল্পনারূপ জ্ঞানে উভয় অবস্থার ধারণা হইতেছে এবং ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানে কল্পনার অস্তিত্বই থাকে না। অতএব কল্পনানুরূপ জ্ঞান কল্পনা বলিয়াই স্বরূপাবস্থায় থাকে না। স্বরূপ জ্ঞানের স্বরূপ অভাব হইতে পারে না বলিয়াই কল্পনাতেও উহা থাকে। কল্পনা কল্পনা ব্যতীত তিষ্ঠিতে পারে না বলিয়াই স্বরূপে থাকে না।

পক্ষান্তরে পরিষ্কারই দেখা যায় যে দুই জনের সাক্ষ্য নিয়া যাহা ঠিক, তাহা একজনের সাক্ষ্য দ্বারা ভুল বুঝাই ভুল। কল্পনার অস্তিত্ব কল্পনাতেই আছে, স্বরূপে নাই, আরও দেখা যায়, যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় নিয়া কল্পনা করিতেছি সেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানও সাক্ষ্য দিতেছে যে এই কল্পনানুরূপ আমরা বুঝি না। যথা "রসগোল্লা" বলায় ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ জিহ্বা) বলিতেছে যে, এই কল্পিত সংজ্ঞা দ্বারা আমার কোন জ্ঞান হইতেছে না; চক্ষু "রক্তবর্ণ" বলায়, ঐ বর্ণানুরূপ কোন রূপ জ্ঞান হইতেছে না; "কঠিন" বা "কোমল" বলায় স্পর্শ (ত্বক্) বলিতেছে যে শব্দানুরূপ আমার কোন জ্ঞান হইতেছে না। বস্তু সংযোগে বস্তু অনুরূপ যে জ্ঞান হয়, শব্দে তাহা হয় না বলিয়া সকল ইন্দ্রিয়ই বলিতেছে; সুতরাং কল্পনাকে ইন্দ্রিয়ও ভুল বলিতেছে।

মনও বলিতেছে যে এই কল্পিত সংজ্ঞা দ্বারা আমার অভাব বৃদ্ধি

ছাড়া অভাব পূরণ হইতেছে না; সুতরাং যে অভাব পূরণের জন্য কল্পনা, সেই অভাব পূরণ না হইয়া বিপরীত ফল হইতেছে। কল্পনা কল্পনা স্বরূপানুরূপ কোনরূপ ইন্দ্রিয় বা মন বুঝিতেছে না।

অপর পক্ষে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় জ্ঞান যখন যে জ্ঞেয় নিয়া থাকে, তখন জ্ঞেয়ানুরূপ তাহার স্বরূপ হয়। জ্ঞেয়ানুরূপ জ্ঞানের স্বরূপ না হইলে জ্ঞেয় জ্ঞানের বিষয় হয় না। জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের ভেদ অহরহ হইতেছে। এই ভেদের মধ্যে জ্ঞান যখন যে জ্ঞেয়ানুরূপ রূপ বা আকার ধারণ করে তখন তার অন্য স্বরূপ থাকে না; সুতরাং দুইটার পার্থক্য বুঝিতে জ্ঞানের শক্তি নাই। কেননা জ্ঞানের এক অবস্থায় অন্য অবস্থার অভাব। জ্ঞান যখন যুগপৎ দুইটা ধারণা করিতে পারে না, তখন একটাকে অপেক্ষা করিয়া অপরটার ভেদ বুঝিতেও পারে না। কল্পনায় দুইটার ভেদ বুঝিতেছি। ইহা ভ্রান্তিতেই বুঝিতেছি। এই ভ্রান্তি বুঝিতে গিয়া তোমার যেন ভ্রান্তি না ঘটে, সাবধান, একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা কর।

যখন 'সাদা' ভাষা বাদ দিয়া বুঝ তখন ভাষা বাদ দিলে 'কাল'-টা জ্ঞানে থাকে না; ঐ সাদা অনুরূপই জ্ঞানের রূপ হয়। সুতরাং 'কাল'র সঙ্গে সাদার তফাৎ ভাষা ব্যতীত ইন্দ্রিয় জ্ঞানে করিবার শক্তিই নাই; তাহা হইলে ভাষা যোগে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করাও ভুল হইতেছে। শব্দ জ্ঞানে ও পরস্পর শ্রবণেন্দ্রিয় যোগে ধ্বনিগুলির জ্ঞান হইতেছে; দুইটা শব্দেরও যুগপৎ জ্ঞান হয় না। এ অবস্থায় শব্দ দ্বারাও আমরা পরস্পরের পার্থক্য বা ভেদ নির্ণয়

করিতে পারি না। পক্ষান্তরে ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, চক্ষু যোগে দৃষ্ট বস্তুর অনুরূপ যখন জ্ঞানের রূপ হয়, আবার শব্দ যোগে জ্ঞানের স্বরূপ অন্য রূপ হইয়া যায়। তাহার প্রমাণ শব্দ আর রূপ, জ্ঞান এক বলিয়া বুঝে না। শব্দ আর রূপে জ্ঞানের পার্থক্য হয় ; উভয় অবস্থায় জ্ঞানের এক স্বরূপ থাকে না। সুতরাং কল্পনা করিতে গেলেই স্বরূপানুরূপ কল্পনা করিতে পারি না, কল্পনানুরূপ স্বরূপ গড়িয়া লই। এখন চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিবে যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়গুলির বিরূপাকার গড়িয়া লইয়া জ্ঞান বিরূপাকার ধারণ করিয়াছে। এই বিরূপাবস্থাকেই জ্ঞান এখন স্বরূপ বুঝিতেছে।

এই বিকৃত জ্ঞান দিয়া গুরুর অবিকৃত স্বরূপ কোন দিনই বুঝিবে না ও বুঝিতে পারিবেও না। এই কল্পনার জ্ঞানই কল্পনানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া ঠিক বেঠিক উভয়টা বুঝিতেছে। ঠিক বেঠিক উভয়টা থাকাতে ক্রমে অপেক্ষার বুদ্ধিতে অপেক্ষা করিতে করিতে ঠিকে পৌঁছিবে। কল্পনা না করিলে জ্ঞান আত্ম-স্বরূপে গেলেও, ভুলটাকে ভুল না বুঝিয়া যাওয়ায়, পুনরাবৃত্তি হইত ; কল্পনা চির-মুক্তিরও কারণ, চির-বন্ধনেরও কারণ হয়। কল্পনাকে কল্পনা না বুঝিলে চিরবন্ধনের কারণ। পূর্ব্ব প্রদর্শিত মতে জ্ঞানের স্বরূপকে যে বিরূপ করিয়া বিরূপকেই স্বরূপ করিয়াছে দেখান হইয়াছে, সেই বিরূপকে বিরূপ বুঝিলেই মুক্তি এবং বিরূপকে স্বরূপ বুঝিলেই বন্ধন। জ্ঞান আত্ম-স্বরূপের দিকে দৃষ্টি

করিলেই দেখিবে তার স্বরূপে দুইটা নাই ; এই দুই কেবল কল্পনার মূলে বা ভ্রান্তিতে বুঝিতেছে, সুতরাং কল্পনাকে কল্পনা বুঝা জ্ঞানের পক্ষে স্বাভাবিক। কল্পনা-অভাবে জ্ঞান ইন্দ্রিয় যোগে যেরূপ ধারণ করিত, সেই অবস্থায় সেই রূপকে ঠিক বুঝিত। এইরূপ বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্নাবস্থাকে ঠিক বুঝিত, বেঠিক বুঝিবার আর উপায় ছিল না, কল্পনামূলেই বেঠিক বুঝে, সুতরাং কল্পনার উপকারিতা এই পর্য্যন্ত। অপকারিতাও যথেষ্ট আছে; যখন জ্ঞানের কল্পিত স্বরূপ লইয়া কল্পনাতে থাকি, তখন আর বেঠিক কিছুতে বুঝি না।

[(১৪)—যো]

জ্ঞানের আত্মস্বরূপে কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই ; কেননা, দ্বিতীয় বস্তু জ্ঞানে জ্ঞান হইলেই জ্ঞানের অবস্থান্তর বা প্রকার ভেদ হয় অর্থাৎ স্বরূপ থাকে না। এই যে প্রকার ভেদ বুঝিতেছি বা প্রকারভেদ শব্দটা করিতেছি, তাহা জ্ঞানেতর দ্বিতীয় বস্তু জ্ঞানে জ্ঞান হইয়া, জ্ঞানে ভেদ বা জ্ঞানের আত্ম-স্বরূপের অভাব জন্মাইয়াছে। জ্ঞান হইতে জ্ঞানের বিষয় বাদ দিলে জ্ঞানের স্বরূপ, আমরা এই ভেদ জ্ঞানে, খুঁজিয়া পাই না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানে ভেদ থাকিতে অভেদাত্মক অবস্থা বা জ্ঞানের আত্ম-স্বরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয় ; সুতরাং যে দ্বিত্ব-মূলে জ্ঞানের ভেদ বা অবস্থান্তর সেই দুই বা দ্বিতীয় পদার্থ ভ্রান্তি বই ঠিক হইতেই পারে না। কেননা জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞানের একটা স্বরূপই নাই স্বীকার করিতে হয় ; যেহেতু

জ্ঞেয় বাদ দিয়া জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না। হয়, স্বীকার করিতে হয় জ্ঞেয় হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি, না হয়, জ্ঞান আছে বলিয়াই জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে। জ্ঞানের অস্তিত্ব-স্বীকার করিলেই জ্ঞেয়টাকে ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হয়; কারণ জ্ঞেয়মূলেই জ্ঞানের স্বরূপে ভ্রান্তি জন্মে। জ্ঞেয়টা ভ্রান্তি না হইলে জ্ঞানের আত্মস্বরূপে ভ্রান্তি হয় কেন? আর জ্ঞানের স্বরূপে যদি ভ্রান্তি থাকে তাহা হইলে জ্ঞানের বিষয় যাহা কিছু সবই ভ্রান্তি। জ্ঞানের স্বরূপটা কিছুতেই ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না, অতএব জ্ঞেয়ই ভ্রান্তি।

এই ভ্রান্ত জ্ঞেয়কেই ঠিক বলিয়া ধারণা করিয়া জ্ঞান ভ্রান্ত হওয়ায়, জ্ঞেয় বাদ দিলে আত্মস্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞান হয় না। এই জ্ঞেয় ইন্দ্রিয়-যোগেই জ্ঞানে জ্ঞান হয়; আবার ইন্দ্রিয় অভাবে জ্ঞেয়ের জ্ঞানাভাব হয়। এখন ইন্দ্রিয় অভাবে জ্ঞানের স্বরূপ ভিন্ন অপর কিছু দ্বিতীয় থাকে না। তাই আপেক্ষিক জ্ঞান, অপেক্ষারহিত স্বরূপ বুঝিতে পারে না। অপর পক্ষে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু সকল ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষে জ্ঞানে জ্ঞান না থাকায়, জ্ঞান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুযোগে যে স্বরূপ বা অবস্থা ধারণ করে, তদবস্থার জ্ঞানই তদবস্থাকে ধরিয়া রাখিতে চায়। কল্পনায় বা সংজ্ঞা-শব্দে তদবস্থানুরূপ কোনও জ্ঞানই হয় না। সুতরাং জ্ঞানের যে অবস্থাকে ধরিয়া রাখা, জ্ঞানের যে অবস্থায় আবশ্যক বোধ হইয়াছে সেই অবস্থানুরূপ কোনও অবস্থায়ই ভাষা যোগে না হওয়ায়, তদ্বিষয়ের বা জ্ঞানের জ্ঞেয়-যোগে যে প্রকার-ভেদ হয়, সেই প্রকার ভেদানুরূপ জ্ঞান না হইয়া বরং সেই অবস্থার জন্য উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে। কারণ,

সেই অবস্থানুরূপ অবস্থা অপর কোনও অবস্থাই দিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তিই জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভাষার কল্পনায় আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্তি না করিয়া বরং বৃদ্ধিই করে। সেই কল্পনা বর্জ্জন ব্যতীত বা কল্পনাকে কল্পনা না বুঝা পর্য্যন্ত, জ্ঞানের স্বরূপ অবস্থার অভাব জ্ঞানে থাকিবেই। সুতরাং কিছুতেইজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে না।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু বুঝিবার জন্য জ্ঞান যতই যত্ন চেষ্টা করুক না কেন, ক্রমে যত্ন চেষ্টাও কল্পনানুরূপ বহু রূপ ধারণ করে। বুঝের অভাব হইতেই বুঝিবার ইচ্ছা জন্মে; সুতরাং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু দ্বারা জ্ঞানের যে অবস্থা হয়, জ্ঞানের সেই অবস্থা বা স্বরূপ বুঝিবার জন্য যখনই কল্পনার আবশ্যক হইয়াছে, তখনই স্বীকার করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু দ্বারা জ্ঞানের বা বুঝের স্বরূপের অভাব হইয়াছে। এই ভ্রান্তিমূলক জ্ঞান লইয়া যে কল্পনামূলে 'বুঝে' বলিয়া বুঝে, তাহাও ভ্রান্তি। কারণ, জ্ঞানের অভ্রান্ত অবস্থায় কল্পনাই সম্ভব নয়। সুতরাং ভ্রান্তির অবস্থার কল্পনাকে কল্পনা না বুঝিলে, আত্মস্বরূপে যাইতেপারিবে না। হয়, স্বীকার কর জ্ঞানের কোনও স্বরূপ নাই, জ্ঞেয়ানুরূপই জ্ঞানের স্বরূপ; তাহা হইলে জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের যাহা স্বরূপ হয়, তাহাই জ্ঞান পক্ষে ঠিক। সে পক্ষেও কল্পনা ভুল। না হয় জ্ঞানের যদি একটা স্বতন্ত্র স্বরূপ আছেই স্বীকার কর, তাহা হইলে জ্ঞেয় মূলেই জ্ঞানের স্বরূপ বিরূপ হইয়াছে; এই বিরূপাবস্থা কল্পনা দ্বারা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা বিরূপে স্বরূপ ভ্রান্তি জন্মিয়াই ঘটে। সর্ব্ব প্রকার যুক্তিতেই কল্পনা যে কল্পনা তাহা প্রমাণ হয়।

[(১৫)—প]

ইন্দ্রিয়যোগে যাহা আমার জ্ঞানে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে পাঁচ প্রকার বোধ বা অনুভূতির প্রকার ভেদ হইয়া যে জ্ঞানের প্রকার ভেদ হয়, ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় সেই ইন্দ্রিয়ানুরূপ স্বরূপ বা অবস্থা থাকে না। জ্ঞান ইন্দ্রিয়যোগে যে স্বরূপ বা অবস্থাপন্ন হয়, সেই স্বরূপ জ্ঞান জ্ঞানে ধরিয়া রাখিতে চায়। অথচ যে ইন্দ্রিয়যোগে জ্ঞানের যে স্বরূপ হয়, সেই ইন্দ্রিয় ব্যতীত এবং সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় সংযোগ ভিন্ন তৎজ্ঞান সম্ভবপর নয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে বিভিন্ন বিষয় প্রতিনিয়তই জ্ঞানে জ্ঞান হইয়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন অবস্থাপন্ন হইতেছে। জ্ঞানের এক প্রকার স্বরূপ অপর স্বরূপের অভাব করে; এইজন্য জ্ঞান স্বীয় স্বরূপ ধরিয়া রাখিতে আবশ্যক বোধ করার কল্পনা করে। এই কল্পনা দ্বারা কল্পনা অনুরূপ একটা অবস্থা যাহা জন্মে, সেই কল্পিত অবস্থাকেই আবার পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ কল্পনা করে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানে বিষয়টা স্থির বা স্থায়ী থাকে না; কেননা বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের বহু রূপ হইতেছে; তদবস্থায় ইন্দ্রিয় যে বিষয় গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, তাহা সে ইন্দ্রিয় স্বভাবের স্বাভাবিক নিয়মে পরিত্যাগ করে। যেমন অগ্নিকে স্পর্শেন্দ্রিয় প্রেমালিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করে না; জিহ্বা বিস্বাদ জিনিসকে ত্যাগ করে, চক্ষু প্রখর সূর্য্যকিরণ ধারণা করিতে পারে না ইত্যাদি। এইগুলি কোনও কল্পনা-সাপেক্ষ নয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়গুলি সংজ্ঞা দ্বারা

কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত সংজ্ঞা অনুরূপ জ্ঞান নিয়া আবার ভাল-মন্দ, নরক-স্বর্গ কল্পনা করে। এখন এই কল্পনার জ্ঞানেই পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ, ভাল-মন্দ বিচার করি। কল্পনার পূর্ব্বে দেহের ধর্ম্মে যাহা ভাল বুঝি তাহাই ভাল, যাহা মন্দ বুঝি তাহাই মন্দ; কিন্তু কল্পনার ভাল-মন্দে দেহের ভাল-মন্দ বুঝের বিন্দুমাত্রও ইতর বিশেষ হয় না। এখন কল্পনা অবলম্বনে যে ভাল-মন্দ কল্পনা করি, তাহার স্বরূপ যে কোথায়, তাহা কল্পনাও কল্পনা করিতে পারে না। অতএব আমার ভাল-মন্দ কল্পনা ঠিক থাকিলে, কল্পনা ঠিক থাকিবেই; এবং কল্পনা ঠিক থাকিলে আত্মা কল্পনানুরূপ সংস্কার লইয়া যাওয়া আসা করিবেই ইহা অনিবার্য্য। কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইলে, আগে ভাল-মন্দ, নরক-স্বর্গ কল্পনা ত্যাগ করিতে হইবে। কল্পনায় দেহের ক্রিয়ানুরূপ কল্পনা করিতে পারি না বলিয়াই, দেহের ক্রিয়ার বিপরীত কল্পনা করি; এই হেতুই কল্পনাপক্ষে দোষ-গুণ সমস্তই ঠিক কল্পনানুরূপ সংস্কার জন্মিয়া সেই কল্পনানুরূপ দেহই নিতে হয়, এবং কল্পনানুরূপ যে পাপ-পুণ্য, তৎদেহ দ্বারা তৎ-কর্ম্মের ফলই ভোগ করিতে হয়।

তোমার এই কল্পনা না আসিলে অর্থাৎ বিষয়কে কল্পনা দ্বারা ধরিয়া না রাখিলে পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ, ভাল-মন্দ কল্পনা করা কি সম্ভব হইত? এবং এই কল্পনা অভাবে পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ অনুরূপ একটা ফলভোগই কি সম্ভব হইত? একটু চিন্তা করিয়া দেখিবে, যে বিষয়ে পাপ বলিয়া ধারণা নাই তাহাতে তোমার আত্মার সংকোচ বা অনুতাপ হয় কি? আত্মাই আত্মার কল্পনামূলে বন্ধনের হেতু

এবং পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ কল্পনা করিয়া পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ অনুরূপ ফল ভোগ করে। কল্পনামূলে যে উপকল্পনা আসিয়াছে তাহা অভ্যাস দ্বারা ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্বরূপের সঙ্গে তুলনা করিয়া, কল্পনাকে কল্পনা বুঝিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্বরূপে যাইতে হইবে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-যোগে আত্মা কিছুই গ্রহণ করেন না; ইন্দ্রিয়মূলে আত্মা জগৎ দেখেন বটে, কিন্তু অভাব হইলেই জগৎ অভাব হয়। আমরা ইন্দ্রিয়মূলে বহু অবস্থাপন্ন হই এবং এক অবস্থা অন্য অবস্থার বিরোধও ঘটায় না; কিন্তু কল্পনায় এক অবস্থায় অন্য অবস্থার বিরোধ ঘটায়। যথা, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যখন গরম বুঝি তখন গরমই বুঝি; আবার যখন শীত বুঝি তখন শীতই বুঝি। ঐ গরম জ্ঞানে শীত জ্ঞানের বাধা জন্মায় না। কিন্তু দেহের ধর্ম্মে যাহা ঠিক বুঝি কল্পনায়ই তাহা বেঠিক বুঝায়; এক রূপ কল্পনায় অন্য রূপ কল্পনাকে বিরুদ্ধ বুঝি, আবার কল্পনার পরিবর্ত্তন হইয়া তাহাকেই অনুকূলও বুঝি। কিন্তু দেহের ধর্ম্মে চিরকালই অগ্নি স্পর্শকে বিরুদ্ধ বুঝি। এখন দেখা যায় কল্পনায় সম্ভবও অসম্ভব হয়, অসম্ভবও সম্ভব হয়। হয় চিন্তানুধ্যান দ্বারা কল্পনাকে কল্পনা বুঝ, না হয় গুরুতে আস্থাবান্ থাকিয়া গুরুর প্রদর্শিত পথে চলিতে থাক। গুরুর কৃপায়ই কল্পনাকে কল্পনা বুঝিবে এখানে নিজের কল্পিত বুঝের উপর আস্থা বা দৃঢ়তা রাখিয়া নিজের অভিমত মতে চলিলে কিছুতেই হইবে না।

[(১৬)—যো, এ]

আমি আমার বর্ত্তমান জ্ঞান নিয়া বুঝি, সর্ব্ব কার্য্য করি ও ঠিক বেঠিক নির্ণয় করি। বর্ত্তমান জ্ঞানের বা বুঝের স্বরূপ ভাষা যোগে বুঝা ও বুঝান; এই বুঝা-বুঝির মূলে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বরূপ বর্ত্তমান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যোগে জ্ঞেয় বস্তু অনুরূপ জ্ঞানের যে স্বরূপ হয়, সেই স্বরূপকেই বুঝা বা বুঝান। বুঝ্ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু যোগে যেরূপ স্বরূপ বা রূপ ধারণ করে, তৎস্বরূপে বা তদনুরূপ জ্ঞানের রূপে অপর কোন রূপই বর্ত্তমান থাকে না। জ্ঞান তদবস্থায় তদবস্থাপন্ন, তদবস্থায় অন্য অবস্থার অভাব। ঐ অবস্থার অবস্থান্তরেও সেই অবস্থা বা সেই স্বরূপের অভাব। ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট যে জ্ঞান, সে ক্ষণকালও বিষয় শূন্যাবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না; এই হেতুই মন কোন না কোন বিষয় অবলম্বনে বর্ত্তমান থাকে। এই মনও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কারের ফল স্বরূপ।

মন বা জ্ঞানের একাধিক বিষয় যুগপৎ ধারণা করিবার শক্তি নাই; সুতরাং জ্ঞানের তুইটা রূপ যুগপৎ হইতে পারে না। এইজন্যই অপরেন্দ্রিয়ানুরূপ জ্ঞানের রূপ, শব্দানুরূপ রূপের দ্বারা বুঝা ও বুঝান যায় না। অথচ শব্দের দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিষয় "বুঝি" বলিয়া যে বুঝি, তাহা ভ্রান্তি। বিশেষতঃ যুগপৎ জ্ঞানের তুইটা স্বরূপ হয় না ও হইতে পারে না। যখন দর্শনানুরূপ জ্ঞানের স্বরূপ হয়, তখন শব্দানুরূপ জ্ঞানের রূপ বা আকার থাকে না। এই অবস্থায় কিছুতেই শব্দের দ্বারা অপর অবস্থানুরূপ বুঝা যায় না, ইহা সর্ব্বতোভাবে বুঝা কর্ত্তব্য। জ্ঞান জ্ঞেয় ভেদে যে স্বরূপ বা আকার

৩

ধারণ করে তাহাই তাহার পক্ষে প্রকৃত স্বরূপ, ইহা না বুঝাই ভ্রান্তি।

যদি স্বীকার কর যে, দ্বিতীয় কোন বস্তু বা বিষয় ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাবে জ্ঞানে ছিল না, তাহা হইলে এই দৃশ্যমান জগৎ বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুনিচয় এই ইন্দ্রিয়মূলেই জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়াভাবে এই সকলের কোন স্বরূপ নাই। যেমন প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখা লাল, নীল, লোহিতাভ কাঁচে প্রতিফলিত হইলে ঐ কাঁচানুরূপ তাহার বর্ণ প্রকাশ হয়, কাঁচই ঐ প্রকার বর্ণ বা রূপান্তরের কারণ; স্বরূপের অগ্নির বর্ণ তদ্রূপ নহে; সেইরূপ এই ইন্দ্রিয় দ্বারা এই দৃশ্যমান জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, স্বরূপতঃ ইহার কোন রূপ নাই বা ইন্দ্রিয় দ্বারা যদনুরূপ দৃষ্ট হইতেছে তদনুরূপ নহে। যদি ইহার ইন্দ্রিয়ানুভূত রূপ ব্যতীত রূপান্তর স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের অভাব না হইলে সেই "রূপ" আমার জ্ঞানে অসম্ভব। যেরূপ কাঁচের ভিতরে দীপ থাকা পর্য্যন্ত কাঁচানুরূপই বর্ণান্তরিত হয়; কিন্তু কাঁচের ভিতর হইতে বহির্গত করিলে দীপাগ্নির প্রকৃত বর্ণ দেখা যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় না গিয়া ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপ বুঝা কল্পনা মাত্র। হয়, এইস্থানে স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের একটা ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপ আছে, নচেৎ ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা স্বীকার করাই ভুল। জ্ঞানের ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানেও স্বীকার করিতেছে, যেহেতু ভ্রূণমধ্যে, নিদ্রাকালে ও মূর্চ্ছাতে জ্ঞান বা আত্মা ইন্দ্রিয় স্বরূপ ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে।

জ্ঞানের ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপ ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা বুঝা যায় না এবং ইহার বিপরীতাবস্থায়ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বরূপ বুঝা যায় না। এই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভেদজ্ঞানেও এক অবস্থায় অন্য অবস্থার অভাব দেখা যায়। জ্ঞানে একত্ব ভিন্ন দ্বিত্বতাভাব ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে। জ্ঞানের বহুত্ব স্বীকার করিলে আমাদের বর্ত্তমান বুঝাবুঝির কোন মূল্য নাই, সবই বর্জ্জন করিতে হয়। জ্ঞান "এক"; কিন্তু জ্ঞেয় ভেদে যদি ভেদ হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করে, তাহা হইলেও জ্ঞানের জ্ঞেয়-বর্জ্জন ব্যতীত আত্ম-স্বরূপ লাভ হয় না। জ্ঞানের প্রথম প্রকার ভেদে যে স্বরূপ বা অবস্থা ছিল অর্থাৎ গুরুর অবস্থার "উ"-কারের ঘাটের জ্ঞানের অবস্থায়, তদবস্থাই ঠিক বা স্বরূপ ছিল। ঐ অবস্থাটাকে বিরূপ বুঝাতেই ভ্রান্তির গাঢ়ত্ব আসিয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীর নিয়া অহংএ পরিণত হইল। অহংএ আসিয়াও ইন্দ্রিয়ানুরূপ জ্ঞানে পরিতৃপ্ত না হইয়া, ক্রমে কল্পনা দ্বারা স্মৃতি ও সংস্কারাবদ্ধ হইয়া জ্ঞানের জ্ঞেয় ভেদে যে স্বরূপ হয়, তৎস্বরূপও ভুলিয়া গিয়া এখন কল্পনানুরূপ একটা স্বরূপ বুঝিয়া কল্পিত আকারে অবস্থান করিতেছি। ভুলকে ঠিক বুঝিয়া ঠিক হইয়া বসিয়া আছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানে ঠিক নির্ণয় না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান ঠিক বুঝিবার জন্য ব্যস্ত বা অস্থির থাকে। এই হেতুই কল্পনামূলে কল্পনানুরূপ একটা ঠিক বুঝিয়া এই কল্পিত জগৎ আত্মায় সংস্কারাবদ্ধ হইয়া, এই জগদনুরূপ ব্যাপারে লিপ্ত আছে।

প্রথমে "উ"-কারের ঘাটে জ্ঞান যদবস্থায় ছিল তদবস্থা

বেঠিক বুঝিয়াই ক্রমে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশিষ্ট একটি দেহের প্রতি-কারণ হইল এবং দেহযোগে ভাষার কল্পনা আসিয়া কল্পনানুরূপ ঠিক বুঝিয়াই এই কল্পিত জগতের সুখ-দুঃখে অধীর হইয়া হর্ষ-বিষাদাদি নানা অবস্থায় অবস্থান করিতেছি। কল্পনা বা ভুলে কল্পনা বা ভুলানুরূপ ফলই ঘটে বা ঠিক হয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞানে বর্ত্তমান জ্ঞান ব্যতীত অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই নাই। জ্ঞানের প্রথম যে দ্বিতীয় বোধ, সেই দ্বিতীয় স্বরূপে বিরূপ জ্ঞান আসিয়াই এবম্বিধ মোহাবৃত অবস্থাকেও ঠিক বুঝিতেছ। পুনরায় এই দ্বিত্ব জ্ঞান বর্ত্তমানে আবার "আদি দ্বিতীয় স্বরূপ"কে স্বরূপ না বুঝিলে তৎ-পরবর্ত্তী ভ্রান্তির অবস্থা সকল ভ্রান্তি বলিয়া জ্ঞান হইবেই না। অথবা পরবর্ত্তী অবস্থা সকলকে ভ্রান্তি না বুঝিলে ঐ স্বরূপ বুঝিতেও পারিবে না। জ্ঞান যখন যে অবস্থায় অবস্থান করে, তদবস্থায় তদবস্থাই তার পক্ষে স্বরূপ। আদিতে তাহার এক নির্দ্দিষ্ট স্বরূপ থাকায় পরবর্ত্তী অবস্থাগুলিকে বিরূপ বুঝে। এই বিরূপ বুঝেই ক্রমে বিরূপটা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাই বর্ত্তমানে ভ্রান্তির গাঢ় অবস্থায় বিরূপকে স্বরূপ বুঝিতেছি, গুরুর "উ"-কারের ঘাটে বিরূপকে বিরূপই বুঝিতাম; এই হেতুই "উ"-কারের ঘাটের অবস্থাই স্বরূপ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

[(১৭)—প]

কোন সময়ে আমি আমার কোনও কথা কোনও শিষ্যের সঙ্গে পরিবর্ত্তন করি নাই, করিবও না। কলির শিষ্যেরাই সর্ব্বদা

পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও পরিবর্ত্তিত হয়। উপদেশের কথা বুঝিতে পার না, তাহার কারণ কল্পনায় বর্ত্তমানে তোমার জ্ঞানের যে আকার বা স্বরূপ হইয়াছে তৎস্বরূপের বিরুদ্ধ বা তৎস্বরূপ অনুরূপ যাহা নয়, তাহাই জ্ঞানের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বা বিরুদ্ধ বোধ হয়। মোট কথা এই যে, ইন্দ্রিয়যোগে এই দৃশ্যমান্ জগৎ জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে এবং তন্মূলেই জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের প্রকার ভেদ হইতেছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার কোনও সংস্কার জন্মে না বলিয়াই আত্মা বা জ্ঞান কল্পনা দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া, কল্পনানুরূপ একটা সংস্কার বিশিষ্ট হইয়াছে। এই সংস্কার সহযোগে যে সব শব্দ হয়, সেই শব্দ দ্বারাই কল্পনা করিয়া অহংএর আকার নূতন করিয়া তুলিয়াছে। ঋ, ৯, ই, উ কোনও ধ্বনি করিয়া, ঐ ধ্বনি অনুরূপ একটা অনুভব ভিন্ন কোন কল্পনাই করিতে পারে না। কল্পনা করিতে গেলেই 'অ-হ'-তে আসিতে হয়। 'ই' এই ধ্বনি করিয়া 'ই'-কারের কোনও ব্যাখ্যা করিতে গেলেই 'অ-হ'-যোগে যে ৩৪টা ব্যঞ্জন বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ ব্যঞ্জনের সহিত স্বর যোগ করিয়া একটা কিছু বলিতে বা কহিতে হয়। অহং জ্ঞান বাদ দিয়া বর্ত্তমান কল্পনানুরূপ একটা কল্পনা করিবার তোমার শক্তিই নাই; সুতরাং কল্পনা যতক্ষণ বর্ত্তমান ততক্ষণ তুমি অহং জ্ঞানের মধ্যে নানা প্রকার প্রকার ভেদ করিয়া অবস্থান কর। যথা 'ই' এই ধ্বনিতে বিষ্ণু, নারায়ণ, 'ই'তে স্থিতি ইত্যাদি যে কোন কল্পনা কর, 'অ-হ' নিষ্পন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ বাদ দিয়া কল্পনাই করিতে পার না; সুতরাং কল্পনা বর্ত্তমানে অহং জ্ঞানের অতীতে কিছুতেই যাওয়া যায় না।

আবার কল্পনানুরূপ জ্ঞানের যে আকার, সে আকারের অভাব

হইলেই জ্ঞান আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে, শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে থাকিয়া ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ কল্পনাই সম্ভব নয়। কারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যুগপৎ একের অধিক বিষয় ধারণা করিতে জ্ঞান সক্ষম নয়। সুতরাং দুইটার তুলনা করিতেও জ্ঞানের শক্তি বা ক্ষমতা নাই। যখন চক্ষে কৃষ্ণ বা শুভ্র বর্ণ দর্শন করি অথবা রসনায় মিষ্ট অনুভব করি; তখন চক্ষে অন্যরূপ দর্শন হয় না ও জিহ্বায় তিক্তাদির অনুভূতি থাকে না; সুতরাং এই দুইএর মধ্যে যে পার্থক্য তাহারও অনুভূতি থাকে না। সুতরাং ভাল-মন্দ নির্ণয় করিতে আমার শক্তি কোথায়?

ভাষার কল্পনায় বিভিন্ন বিষয় কল্পনানুরূপ জ্ঞানে সর্ব্ব অবস্থায়ই বর্ত্তমান আছে—এই ভ্রান্তি আসিয়া একটার সহিত আর একটার কল্পনায় তুলনা করি ও ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকি। কল্পনাই এই ভাল মন্দ ইত্যাদি কল্পনার উৎপত্তি করে। কল্পনা হইতে যে সব কল্পনা আসিয়াছে, সেই কল্পনা বর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত, কল্পনাকে কল্পনা বুঝাও কথার কথা। কল্পনা হইতে উদ্ভূত ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, জাতি, কূল, শীল ত্যাগ না করিয়া কল্পনা বুঝিতে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় কোনও বিষয় অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারে না। লজ্জা, ভয় থাকিলেই লজ্জা, ভয়ের কল্পিত বিষয় থাকে। কল্পনানুরূপ একটা বিষয় না রাখিয়া 'পাপ-পুণ্য' এই শব্দদ্বারা কোনও অবস্থা জ্ঞানে জ্ঞান হয় কি? পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম থাকিলে, তৎপ্রতিপাদ্য বিষয়ও জ্ঞানে জ্ঞান থাকিবে; এবং সেই বিষয়ানুরূপ কল্পনার জ্ঞানের একটা

আকারও থাকিবে। এই অবস্থায় ঐ আকার নিয়া 'উ'-কারের ঘাটে যাওয়া যায় না। 'উ'-কারের ঘাটে বর্ত্তমান জ্ঞানের কোনও কল্পনা বর্ত্তমান নাই। বিশেষতঃ 'উ'-কারের ঘাটে থাকিয়া কোনরূপ কল্পনা করাও বর্ত্তমানজ্ঞান পক্ষে সম্ভব নয়। এই অবস্থায় বর্ত্তমান কল্পনা বাদ না দিয়া গুরু-চিন্তা করা বা গুরুর ঘাটে যাওয়া একটা ভুয়ো কল্পনা বই আর কিছু নয়।

জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞেয় ভেদে ভেদ হয়, ইহার সাক্ষী আমার সঙ্গে সর্ব্বদা বর্ত্তমান পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এখন কল্পনানুরূপ যে জ্ঞানের ভেদ হয় না, ইহা কে অস্বীকার করিবে? এই কল্পনামূলেই জ্ঞানকে বহুরূপী হইতে হইয়াছে। জ্ঞান যখন যেরূপে অবস্থান করে, সেইরূপই ঠিক বুঝিবে; ইহা বুঝিতে শক্ত হইলে, বুঝের পক্ষে সহজ আর কি? জ্ঞান স্বীয় কল্পনায় পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গ কল্পনা করিয়া, আবার সেই পাপ-পুণ্য, নরক-স্বর্গের ফল ভোগ করে। জ্ঞান জ্ঞানের মুক্তি ও বন্ধনের কারণ। জ্ঞান অভাবে সবই অভাব। সুতরাং বর্ত্তমান জগৎ যেমন জ্ঞানের কল্পনার ফল, আবার কল্পনাত্যাগে জ্ঞানের আত্মস্বরূপে অবস্থানও জ্ঞানেরই কার্য্য। কল্পনানুরূপ কতকগুলি অবস্থা জ্ঞান কল্পনামুলে ঠিক বুঝিয়া, ঠিক বা আত্মস্বরূপে বেঠিক বুঝিতেছে। সুতরাং মুমুক্ষুর পক্ষে কল্পনাত্যাগ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এবং কল্পনামূলক উপকল্পনা যে ভাল-মন্দ, তাহা অগ্রে ত্যাগ করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে সংস্কার বা স্মৃতি এত দৃঢ় যে, এই সংস্কার ত্যাগের কথা শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যাহা হউক এই বিষয় নিজের কল্পিত বুঝের উপর নির্ভর

করিলেই বিভ্রান্ত হইতে হইবে। এস্থলে গুরুবাক্যানুবর্ত্তী না হইয়া চলিলে পদে পদে বিপদ।

[(১৮)—জ]

তোমাদের এই সব লেখা পড়া সাধারণের বোধগম্য হইবার নয়। আমরা আমাদের এই জ্ঞান দিয়া মুসলমানদের সংস্কারানুরূপ কার্য্য ও ব্যাপার বুঝি বলিয়া বুঝি; মুসলমানদের সংস্কারানুরূপ আমাদের সংস্কার হয় না। সংস্কারানুরূপ বুঝা ও বিপরীত সংস্কার দিয়া বিপরীত সংস্কার বুঝা, এই দুই এক নয়। লিখিত ব্যাপারানুরূপ সংস্কার জন্মিলেই আমার তোমাকে বুঝান সার্থক হইবে। আমরা কল্পনাকে ভাষায় কল্পনা করি; ক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা ও ব্যবহারাদি কল্পনানুরূপ হইয়া জ্ঞানের আকার কল্পনানুরূপ যখন হয় তখনকার বুঝ্ আর সংজ্ঞা-শব্দে কল্পনাকে কল্পনা বুঝিয়া জ্ঞানের আকার পূর্ব্ববৎ থাকিলে, এই বুঝায় কিছুই হয় না।

[(১৯)—জ]

কল্পনাই যাদের জীবন-সর্ব্বস্ব, কল্পনা বাদ দিলে যাদের অস্তিত্ব বিলোপ হয়, কল্পনা বাদ দিয়া যে নিজে বাদ পড়ে বুঝে, কল্পনাই যাদের ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, নরক-স্বর্গ, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ইত্যাদি সমস্ত তাহারা কি তোমার এই কথায় কর্ণপাত করিবে? তোমার কথা তুমি বুঝ, এইজন্যই আমার উপদেশ, অপরের বুঝিবার সময় আসিতে এখনও ২০০ বৎসর

গৌণ আছে। জীব যখন উদর উপস্থ পরায়ণ হইয়া ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান রহিত হইবে তখন আবার সত্যের আভাস প্রকাশ পাইবে। পাপ বুদ্ধিতেই পাপকে পাপ বলিয়া জ্ঞান অভাব হইয়াই কল্পনাকে কল্পনা বুঝিবে। দৈহিক সুখে আসক্তি আসিয়া কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। আবার দৈহিক সুখের চরম সীমায় গিয়া হতাশা আসিয়া কল্পনা বুঝিবে। কল্পনা বুঝানের জন্য তোমার দরকার, তাই তোমাকে আমার কল্পনা বুঝাইবার চেষ্টা।

[(২০)—জ]

আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে কল্পনাকে কল্পনা বুঝি না। বর্ত্তমান জ্ঞান কল্পনানুরূপ, অথচ বুঝে বুঝি যে বুঝি; কি বুঝি তাহা বুঝি না, তবুও বুঝি বলিয়া বুঝি এবং সেই বুঝের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতেছি। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, জাতি, কুল, শীল সমস্তই কল্পনার ফল, ইহার কোনটাই ইন্দ্রিয়ের বুঝের ফল নয়। যে অবস্থায় ও যেরূপ কল্পনা থাকায় এই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ, কল্পনার পরিবর্ত্তনে আমার সেরূপ জ্ঞানের অবস্থা বা আমি নাই; এই অবস্থায় আমার পরিবর্ত্তনে বা আমার যে স্বরূপ থাকায় এইরূপ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহ নিয়াছি, সে স্বরূপ নাই তাহাও বুঝি না। তবুও বুঝি বলিয়া যে বুঝি, কি বুঝি তাহা চিন্তা না করিয়া, বুঝ্ কি বুঝ্ নিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করে? বর্ত্তমান বুঝের স্বরূপই বা কি? তাহা বুঝিতে হইলেও কল্পনাকে কল্পনা বুঝা আবশ্যক।

[(২১)—জ]

মনে করিয়াছিলাম এবার এই ছুটিতে কয়েকদিন আমার নিকট থাকিতে পারিবে ; অন্ততঃ ৭।৮ দিন থাকিলে অনেকটা কাজ হইত। সাধনার অন্তরায় মানবের কপোল-কল্পিত কল্পনা ; মানব ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ নিয়া স্বীয় কল্পনাজাল বিস্তার করিয়া মাকড়সার মত নিজের জালে নিজে বদ্ধ হইয়াই ঘুরিয়া ফিরিয়া, অনন্ত আকার, অনন্ত রূপ, অনন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। যখনই মানব বুঝিতে পারে যে, নিজের কল্পনাই নিজের সুখ-দুঃখের কারণ, তখনই বৈরাগ্য আসিয়া আর ইহার ভিতরে থাকিতে চায় না। ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া যাহা কল্পনা করিয়াছি, তাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবে। কল্পনাকে কল্পনা বুঝিলেই আমি গুরুর ঘাটে না গিয়া আর স্থির থাকিতে পারি না। এ সম্বন্ধে আরও কিছু দিন বুঝা ও অনুধ্যান করা উচিত।

[(২২)—প]

বাবা, আজ কয়েকটি কথা লিখিতেছি, একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবে। জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে তাহা লইয়াই মানবের কল্পনা ; এবং সেই কল্পনানুরূপই স্মৃতি বা সংস্কার। অতীত জীবনের যে সব বিষয় ভুলিয়া গিয়াছি অর্থাৎ স্মৃতি নাই, তদ্রূপ কোনও ক্রিয়াও আত্মাতে বা জ্ঞানে নাই ; এমন কি স্বপ্নেও তদবস্থা দর্শন হয় না ; এইজন্য আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি "স্বপ্নেও এরূপ চিন্তা করি নাই"। স্বপ্নের অর্থ এই—আমার কল্পনানু-

রূপ যে যে বিষয়ের স্মৃতি বা সংস্কার আছে তদ্বিষয়ানুরূপই স্বপ্ন দেখি ; যে বিষয়ে আমার একবারে কোনও জ্ঞান নাই এমন বিষয় স্বপ্নেও দেখি না। জাগ্রৎ অবস্থায় যে বিষয় জ্ঞানে জ্ঞান নাই, সেই বিষয়ানুরূপ ক্রিয়া যেমন জ্ঞানে জ্ঞান হয় না, স্বপ্নেও সেইরূপ যে বিষয়ের সংস্কার বা স্মৃতি নাই, সেই বিষয়ানুরূপ একটা স্বপ্ন সম্ভব নয়। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগেই সংস্কার বা স্মৃতি জন্মে ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়েরই কল্পনা আমার জ্ঞানে বর্ত্তমান। এই হেতুই দেখি নাই অথবা স্পর্শাদি অপর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ব্যতীত কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ব্যাপারেরও স্বপ্ন সম্ভবপর হয়। স্বপ্নে বিলাত যাওয়া সম্ভব হয় এই কারণে ; কিন্তু বিলাতের অর্থাৎ লণ্ডন নগরের চিত্রটি আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুরূপ ভিন্ন হইতে পারে না। সেইরূপ না দেখিয়াও কল্পনায় কল্পনা করিয়া একটা সংস্কার বদ্ধ হই ও তদবস্থানুরূপও একটা বিষয় স্বপ্নে দর্শন হইতে পারে।

কল্পনা ব্যতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সংস্কার জন্মে না, সুতরাং স্বপ্নের কারণ কল্পনা। স্বপ্নাবস্থায় কল্পনাটাকে ঠিকই বুঝি, বিন্দুমাত্রও ভুল বুঝি না ; এইজন্য সেই স্বপ্নাবস্থা অনুরূপই দেহে ক্রিয়া হইতে থাকে। জাগ্রৎ অবস্থায়, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা এই উভয়ের তুলনায় জাগ্রৎ অবস্থাটাকে ঠিক বুঝি, এই হেতু স্বপ্ন অবস্থার কল্পনাটাকে জাগ্রৎ অবস্থায় ঠিক বুঝি না অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়ানুরূপ জ্ঞানের আকার থাকায়, জ্ঞান ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অনুরূপই ঠিক বুঝে (স্বপ্নটাকে কল্পনাই বুঝে)। স্বপ্নাবস্থায় কল্পনানুরূপ জ্ঞান হইয়া, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিরোধ থাকায়, ঐ অবস্থাটাকেই ঠিক বুঝে। কোন

ইন্দ্রিয়ানুরূপ জ্ঞান, কল্পনাব্যতীত ইন্দ্রিয় বিষয়ের অপ্রত্যক্ষে আত্মাতে ইন্দ্রিয়ানুরূপ থাকে না ; সুতরাং ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট দেহ পরিত্যাগের পর কেবল কল্পনানুরূপ সংস্কারই আত্মাতে থাকিবে এবং সেই অবস্থাকেই ঠিক বুঝিতে হইবে।

বর্ত্তমানে তোমার যে যে সংস্কার প্রবল এবং যে সংস্কারানুরূপ কার্য্যে তোমার রুচি, আত্মা নিশ্চয়ই তদ্রূপ অবস্থা চাহিবে এবং সেই অবস্থানুরূপ দেহ, আকার, আয়ু, ভাল-মন্দ সমস্ত লইয়াই আসিতে হইবে। এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ তোমাতে কোন্ কল্পনা সর্ব্বদা বর্ত্তমান এবং কর্ম্মক্ষেত্রে কোন্ কল্পনানুরূপ কর্ম্ম করিতেছ। তদ্রূপ অবস্থা লইয়াই জন্মিতে হইবে, ইহাতে অনুমাত্রও ভুল নাই। ভুল থাকিলেও, ভুলকে বুঝিবার যন্ত্র যে ইন্দ্রিয়, তাহা বর্জ্জন করিয়াই আত্মা চলিয়া যাইবে। মোট কথা, ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাব থাকায়ই কল্পনানুরূপ স্বপ্নটাকে ঠিক বুঝে ; মৃত্যুতেও শুধু কল্পনা লইয়াই ইন্দ্রিয়গুলি ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, কাজেই কল্পনাকেই ঠিক বুঝিতেই হইবে। বর্ত্তমানেও সংস্কারানুরূপ কর্ম্মেই আসক্তি ও রুচি ; তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বর্ত্তমান থাকায় অনেক সময় তাহার দোষ-গুণ বিচার করিয়া সংস্কারের পরিবর্ত্তন করিতে পারে। যাহারা ইন্দ্রিয়জ্ঞান বর্ত্তমানে সংস্কার বা কল্পনা পরিবর্ত্তনে অক্ষম, তাদৃশ মোহান্ধ ব্যক্তির আর উপায় নাই। ঐ স্বীয় সংস্কারানুরূপই দেহ লইয়া পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা করিতে হইবে। কল্পনার চরম সীমায় পৌঁছিয়া যাহারা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানযোগে কল্পনাকে কল্পনা বুঝিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তাহারা এই কল্পনাময় সংস্কারানুরূপ বিভিন্ন দেহ লইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিবে। বর্ত্তমানে তুমি যাহা কল্পনামূলে ঠিক বুঝ,

দেহত্যাগের পর তাহা আর বেঠিক বুঝিবার উপায় কি আছে? এই জন্য বিশেষরূপে বুঝিয়া এই সময়ই বুঝাবুঝির পরিবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

গুরুই যাহার কল্পনার বিষয়, তাহার ভাল-মন্দ দ্বন্দ্ব ভাব কোথায়? স্বপ্ন যে আমার সংস্কারের পরিচায়ক দেহ ইহাতে সন্দেহ কি? আমার রুচিকর ব্যাপার ভিন্ন স্বপ্ন সম্ভব হয় না। আমি যাহা স্বপ্নে দেখি তৎ তৎ অবস্থা আমার জ্ঞানে সংস্কার বদ্ধ হইয়া আছে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে বহু সংস্কারের মধ্যে যেটা প্রবল তদনুরূপই দেহটা লইতে হইবে। আমাদের ক্রোধ, কাম প্রবল হইলে তদ্বিপরীত সংস্কারগুলি বিলুপ্ত অবস্থায় আমাদের ভিতরে লুক্কায়িত থাকে; তদ্রূপ প্রবল সংস্কারানুরূপই দেহ প্রথমে লইতে হইবে। অপর অপর সংস্কারগুলি প্রচ্ছন্নভাবে তদ্দেহে অবস্থান করিবে ও ক্রমে পর্য্যায় ক্রমে পর পর সংস্কারানুরূপ দেহ লইতেই হইবে। এই হেতুই ভোগাবসানে পশ্বাদির ক্রমোন্নতি।

ইতি

[(২৩)—প]

স্বীয় কল্পনায়ই মানুষ বদ্ধ ও মুক্ত। যতদিন এই কল্পনানুরূপ সংস্কার লইয়া আছ ততদিন একবার আমি (গুরু) সর্ব্বস্ব ধন, আর একবার আমি (গুরু) কিছুই না। যখন তুমি আমার কাছে থাক, তখন তুমি বার আনা আমার আর চারি আনা "শিবশম্ভুর"; আর যখন "শিবশম্ভুর" কাছে থাক তখন পৌনে ষোল আনা তাহাদের ও এক

পয়সা আমার। অতএব বিচার করিয়া দেখিলে দেখিবে তোমার কি কর্ত্তব্য। দীর্ঘকাল আমার সঙ্গ অভাব হইলে যে ষোল আনাই তাহাদের হইয়া যাইবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। এখন তোমার জীবনের শ্রেয় কি তাহাই বিবেচনা করিয়া করিবে। কল্পনায়ই বুঝিতেছ "সময়ে করিব।" কিন্তু সময় যে ফুরাইয়া আসিতেছে তাহা কি কল্পনায় বুঝিতে দেয়? আমার প্রাণ রাত দিনই কল্পনা করে আমার "পাঁচু" আমি পাইলে আমার ভবলীলা শেষ হইয়া যায়। তুমি কি তোমার কল্পনা বৃদ্ধি দ্বারা ইহা বুঝিতে পার বা বুঝিতে সমর্থ? আমি একবার হাতে পাইলে আমার বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করিয়া দেখিতাম ভুলকে ভুল বুঝাইতে পারি কি না?

[(২৪)—জ]

মানব স্ব স্ব সংস্কারানুরূপ কর্ম্ম করিয়া সংস্কারানুরূপ যে সমস্ত ব্যাপার জুটাইয়া নেয়, আবার সেই সংস্কারানুরূপ কর্ম্মের ফলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংস্কারানুরূপ কর্ম্ম করিতে হয়, অর্থাৎ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই সংসারাশ্রম গ্রহণ করে ও সংসারাশ্রমোচিত সংস্কার, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বিষয় ইত্যাদি যাহা কর্ম্মফলে জোটে তৎকর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম নিয়াই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতে হয়। যতদিন এই সংস্কারের সম্বন্ধ ছেদ না করা যায় ততদিন পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মানুরূপ কর্ম্মই, সংস্কারে কর্ত্তব্য জ্ঞান আসিয়া, ভুলানুরূপ কার্য্য করিতে থাকে। তবে অনুধ্যান চিন্তা দ্বারা দৃঢ়ভাবে কল্পনাকে কল্পনা

বুঝিলে ঐ সব কর্ম্মের ফল অর্শে না। স্বীয় কর্ম্ম বা সংস্কারানুরূপ চিন্তা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিলে, কল্পনা বুঝাও শক্ত হইয়া উঠে; তদবস্থায় অবসর নেওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।

(২৫)

বাবা, মানুষ ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিয়া আসিয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে যে সব কল্পনা করে ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিপরীত যে ভাল-মন্দ কল্পনার সংস্কার, তাহাকেই কল্পনা বুঝিতে পারে না। যে কল্পনায় এই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহের সৃষ্টি তাহা কি প্রকারে বুঝিবে ? ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় আত্মার কি অবস্থা তাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া বুঝা কি সম্ভব ? ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিয়া যে কল্পিত অষ্ট-পাশের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞান দিয়া দেখিলেই অনায়াসে কল্পনা বুঝা যায়; ইহা বুঝিতে অক্ষম যে মানুষ সে বর্ত্তমান কল্পনায় জ্ঞানের যে আকার পরিবর্ত্তন হইয়া অন্য অবস্থা বা আকার ধারণ করিয়াছে সেই জ্ঞানের আকারের পক্ষে পূর্ব্ব কল্পিত আকার ঘোর অন্ধকারাবৃত। সুতরাং আত্মস্বরূপ বা আত্মজ্ঞান, এই উপকল্পনার অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত চিন্তার বিষয়ই হইতে পারে না। কল্পনা বাদ দিয়া শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মানুষ স্থির থাকিতে পারে না; তাই হয়, কল্পনা করিয়া জ্ঞানের কল্পিত আকার নিয়া স্থির থাকিবে, না হয় স্বরূপের দিকে যাইতে হইবে।

ইতি

*অষ্টপাশ—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, জুগুপ্সা এবং আশা।

[(২৬)—প]

আমার বর্ত্তমান আমি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানানুরূপও নয় ; আমি কতকগুলি সংজ্ঞা-শব্দ অনুরূপ আমি। আমি যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে সংজ্ঞা দ্বারা কল্পনা করি, সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানই আমাকে এই জ্ঞান দিতেছে যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য রকমে বুঝা যায় না। ইহার সাক্ষী ইন্দ্রিয়ই। আবার ইহাও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় যোগে আত্মা অপর বিষয়ই বুঝে, আত্মাকে বুঝে না। আত্মা যে কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে যোগ হয়, তাহাতেই আত্মা ভিন্ন অপর আর একটা জ্ঞান জন্মে। চক্ষু যোগে দর্শনীয় বস্তুর, স্পর্শযোগে স্পর্শেন্দ্রিয়ানুরূপ বিষয়ের জ্ঞানই হয়, তথাপিও মোহান্ধ মানব ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মাকে বুঝিতে চায়। আত্মা ইন্দ্রিয় সংযোগে যাহা বা যেরূপ বুঝে, তাহা ভাষা দ্বারা বুঝিতে পারে না, ইহা না বুঝিয়া ভাষাযোগে বুঝিতে গিয়াই ভ্রম জন্মে ও সেই ভ্রম বশতই ভাষায় বুঝি বলিয়া বুঝে। যেরূপ কল্পনা করে জ্ঞানও সেই কল্পনানুরূপ হয়, কাজেই কল্পনার জ্ঞানে কল্পনাকে ঠিক বুঝে। স্বরূপজ্ঞানে কল্পনাকে ঠিক বুঝিলে, স্বরূপ বুঝ্‌ অনুরূপ বুঝা হইত। বেঠিক অবস্থায় বেঠিককে ঠিক বুঝা যেমন স্বাভাবিক, মাদক দ্রব্য সেবনে বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া বিকারাত্মক অবস্থা বা ব্যবহার যেমন ঠিক বুঝে, সেইরূপ কল্পনায় গিয়াও মানব কল্পিত অবস্থাকে ঠিক বুঝে। কল্পনা, জ্ঞানই করিয়া থাকে ; জ্ঞান কল্পনারূপে পরিবর্ত্তিত হইলে পরিবর্ত্তন অবস্থায় বেঠিক বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। জ্ঞানের স্বরূপ চ্যুতি হইলে স্বরূপ বুঝিবে কে ? আমাদের কল্পনায়ই অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান। কল্পনা বাদ দিলে অতীত, ভবিষ্যৎ বাদ

পড়ে ; কেবলমাত্র বর্ত্তমানটা 'বর্ত্তমান' থাকে সে বর্ত্তমানও ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ বর্ত্তমান, কল্পনানুরূপ বর্ত্তমান নহে।

কল্পনার বর্ত্তমানের মধ্যেই অতীত, ভবিষ্যৎ আছে অর্থাৎ অতীতের ও ভবিষ্যতের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানানুরূপ জ্ঞান থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। অতীত এই শব্দ দ্বারাই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে "ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের পক্ষে অতীত।" তাহা হইলেই 'অতীতটা কেবল কল্পনামূলেই বর্ত্তমান, সংজ্ঞা-শব্দে অতীত বলিতেছি আবার কল্পনায় সে বর্ত্তমান আছে। এই অতীতের অর্থ কি ? ভবিষ্যৎও সেইরূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বর্ত্তমান নাই, অথচ কল্পনার জ্ঞানে বর্ত্তমান। কল্পনায় ভবিষ্যৎ না থাকিলে আমার পক্ষে ভবিষ্যৎ নাই। তাহা হইলে আমার কল্পনা বাদ দিয়া শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে থাকিলে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ানুরূপ অনুভূতিই আমার পক্ষে বর্ত্তমান। বর্ত্তমানেও কল্পনা বাদ দিলে, আমার অতীত, ভবিষ্যৎ নাই। আমি অতীতের চিন্তা করিতে গেলেই কতকগুলি সংজ্ঞা-শব্দ মাত্র অবলম্বন করিয়া অতীতের অবস্থা বুঝি। ইহা ভিন্ন অতীত অবস্থানুরূপ কোন অবস্থার জ্ঞান, আমার জ্ঞানে জন্মে না। অতীতের খাওয়া-পরা, সুখের কল্পনা করিয়াই সুখী হই ; কিন্তু বর্ত্তমানে কেবল ভাষার কল্পনায় সুখী হই না ; ব্যক্তি, বস্তু, বিষয় আবশ্যক করে। তাহা হইলে অতীতের বিষয় যে বুঝি বলিয়া বুঝি, তাহা বিষয় বা অবস্থানুরূপ বুঝি না, কল্পনানুরূপ সংজ্ঞায় যাহা বুঝায়, তাহাই বুঝি। এই প্রকার ভবিষ্যৎও আমার বুঝে বুঝে।

বুঝ্‌, জ্ঞেয় ভেদে যেরূপ ভেদ হয় সেইরূপই বুঝে ; সুতরাং বুঝ নিজের ভুল বুঝিতে অক্ষম। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে, আত্মা ভিন্ন অপর আর একটা বস্তু আছে, ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণ করিবে ; কারণ ইন্দ্রিয়ের

ধর্ম্মই এই যে, ইহা আত্মা ভিন্ন আর একটা বোধ জন্মায়। যে কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার যোগ হয় না কেন, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আত্মা ভিন্ন অপর আর একটা বস্তুর জ্ঞান জন্মে ; ইহা— ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে, অপর কোন যুক্তি তর্ক আবশ্যক করিতেছে না। অতএব ইন্দ্রিয়জ্ঞান লইয়া অদ্বৈতবাদ বুঝিতে গেলে 'দুই'কে 'এক' বুঝা যেমন বুঝি তেমনই বুঝিব অর্থাৎ জ্ঞানে দুই অনুরূপই অনুভব হইতেছে, অথচ ভাষায় 'এক' বুঝিব। কল্পনায় যখন দর্শন, স্পর্শ, আস্বাদন সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় বুঝিতে পারি, তখন আমার বুঝ্ না বুঝিতে পারে এমন একটা বিষয়ই হইতে পারে না। মানব যখন ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অনুভূতির বিষয় বুঝিতে গিয়া, ভাষায়, কথায়-বার্ত্তায় বুঝিয়া বুঝে, তখনই মানবের ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে একটা বুঝ্ দাঁড়া করে। অর্থাৎ অগ্নিসংযোগে স্পর্শের যেরূপ ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়াকে 'উষ্ণ' এই সংজ্ঞা দিয়া ঐ সংজ্ঞা দ্বারাই অগ্নির ক্রিয়া বুঝিল ; কিন্তু স্পর্শে সাক্ষ্য দিতে লাগিল যে অগ্নির সংযোগ না হইলে, অগ্নি-সংযোগের অবস্থা বুঝা যায় না। সেই ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞান কল্পনামূলে শব্দযোগে 'উষ্ণ' বলিয়াই ঠিক বুঝিল। সেই প্রকার দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত ব্যক্তি, বস্তুর সংযোগ হইয়া যে জ্ঞান হইতে লাগিল, তাহা দর্শনেন্দ্রিয়কে সাক্ষ্য না মানিয়া, নিজের কল্পনামূলক জ্ঞান যাহা বলিতে লাগিল তাহাই ঠিক বলিয়া বুঝিল। এস্থলে জ্ঞান স্বীয় কল্পনানুরূপ যখন যাহা বুঝে তাহার বাধা দিবার কেহই নাই। এজন্য সর্পে রজ্জু ভ্রম, বল্মীক-স্তূপে ব্যাঘ্র ভ্রম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইল।

যে ইন্দ্রিয় বাদ দিলে আত্মার অস্তিত্বই থাকে না, সেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ব্যাপারেই ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া আত্মা যাহা ইচ্ছা তাহাই কল্পনা করিতে লাগিল এবং সেই কল্পনানুরূপ ঠিক বুঝিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়া আত্মার কল্পনা করিবার শক্তি নাই, অথচ ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহা বুঝায়, তাহার বিপরীত ঐ ইন্দ্রিয়জ্ঞান কল্পনায় যে বিষয় বুঝে, তাহা বুঝিতে লাগিল। এমন কি, যে জাতি যাহা ঠিক করিল, তাহাই ঠিক বুঝিল। ইহা দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয়ানুরূপ কল্পনা কাহারও হয় নাই। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়ানুরূপ অনুভূতি সকল জাতীয় মানবের এক। আগুন, জল, সকল মানুষেই এক রকম ক্রিয়া জন্মায় ; কেবল কল্পনার বেলায় বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন রকম কল্পনা করে ; সুতরাং কল্পনা যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অনুভূতি অনুরূপ নয় ইহাতে আর সন্দেহ কি ? এই কল্পনার বুদ্ধিতে ও কল্পনানুরূপ জ্ঞানে, সবই কল্পনা করিতে চায় ; কল্পনায় যে স্বরূপ জ্ঞান জন্মে না ইহা আর বুঝিতে পারে না। এই জন্যই কল্পনা বর্ত্তমান থাকিতে স্বরূপ জ্ঞানের উপায় জ্ঞানের বিষয় হইবে না। ইতি—

[(২৭)—স্থ]

কতকালই এই কল্পনা বুঝাইলাম, কল্পনাকে যে কল্পনা বুঝাই ও কল্পনা বলিয়া বুঝ, ঐটুকুই কল্পনা ; স্বরূপতঃ কল্পনাটাকে কল্পনা বুঝ না। মুখে কল্পনা বলি বটে ; কিন্তু কল্পনার একটা স্বরূপ দেই ; তাহা হইলে যে কল্পনা বুঝি সেইটার মধ্যে কোন স্বরূপ নাই। যে পাঁচটা ইন্দ্রিয়

নিয়া আসিয়াছি, এই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ানুরূপ যে স্বরূপ তাহা আমার কল্পনা সাপেক্ষ নহে; স্বতই দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আস্বাদন ও আঘ্রাণানুরূপ জ্ঞান হইতেছে ; কিন্তু কল্পিত অংশটা মানবের জ্ঞানে স্বতঃই আসে না ও ইন্দ্রিয়ও আনে না। কল্পনায় জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তন হইয়া জ্ঞান হইতেছে যে, কল্পনাকে ইন্দ্রিয়ই আনে ও জ্ঞানে স্বতঃই আসে। কল্পনা বাদ দিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সারূপ্যে থাকিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাই ইন্দ্রিয় স্বরূপানুরূপ স্বরূপে জ্ঞান সন্তুষ্ট না থাকিয়া কল্পনা করে এবং কল্পনানুরূপ জ্ঞান দিয়াই ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুরূপ অনুভব করে বলিয়া মনে করে। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই যদি জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি হইত, তাহা হইলে কল্পনার আবশ্যকতাই থাকে না। ইহাও জ্ঞানে জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুরূপ জ্ঞানের স্বরূপ আর কল্পনানুরূপ ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বরূপ এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুরূপ স্বরূপ, কল্পনানুরূপ বুঝি না। এই ক্ষেত্রে আমার বুঝাবুঝি কল্পনানুরূপই হইতেছে ; তাই অতীন্দ্রিয় গুরুর স্বরূপ বুঝি বলিয়া যে বুঝি ইহা কল্পনাতেই বুঝায়। 'না বুঝি'টাকে যে বুঝি বলিয়া বুঝি, তখন বুঝে যাহা বুঝে না তাহা সকলি বুঝি ইত্যাকার জ্ঞান ঐ বুঝ্ মূলেই হইয়া থাকে। চিরকাল এই 'বুঝিনা'—বুঝ্ দিয়া বুঝিয়া আসিয়া গুরু চিরতরে আবৃত থাকে ও থাকিবে। গুরুকে বুঝি না এই জ্ঞানটা আনিতে হইলেই এই কল্পনার বুঝে ইন্দ্রিয়ানুরূপ বুঝি না এটা বুঝা দরকার। তোমাদের বুঝের সিদ্ধান্তে "পরাণবন্ধুর"

(১) বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শৈশবে গুরুদেবকে "পরাণবন্ধু" বলিয়া ডাকিত।

বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত কিরূপ ইহা না জানিয়া আমার প্রাণ মানিতে চায় না। ইতি—

[(২৮)—জ]

বাবা, আজ প্রাণে কত কি আসিতেছে, কি করিতে কি করিতেছি কিছুই বুঝি না। কর্ম্মক্ষেত্রে কোন কর্ম্মই না বুঝিয়া করা সম্ভব হয় না। যাহা করি সবই বুঝ্ মত করি ; বুঝের আদেশানুবর্ত্তী হইয়াই চলিতেছি, অথচ বুঝি বুঝিনা'। বুঝি আর বুঝি না এই দুইটার মধ্যে কোন্‌টা ঠিক ইহা বুঝিতে গিয়া বুঝিয়া দেখি যে, আমি কর্ম্ম বুঝ্ অনুসারে করিতেছি সেটা ব্যতীত বুঝিনা'—অনুরূপ কোনও কর্ম্ম হইতেই নিবৃত্ত হইতে পারি না। বুঝিনা'টা কেবল কল্পনামাত্র। আমার জ্ঞান পক্ষে বুঝ্ অনুরূপ যে সব কর্ম্ম করি সেইটাই ঠিক। এই ঠিকের ভিতরেও তালাস করিয়া দেখিলে দেখি যে, যে সব কর্ম্ম করি তাহা আমার সংস্কারের বিরুদ্ধে নহে। সংস্কার অনুরূপ কর্ম্মেই আমার আসক্তি ও রুচি ও করিয়া থাকি। সংস্কার তালাস করিয়া দেখিলেও দেখি সংস্কারও কল্পনা।

কল্পনা জ্ঞান দ্বারাই করি। যেরূপ কল্পনা দেহের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নয়, দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মার স্পৃহনীয় বা বাঞ্ছনীয় অনুরূপ কল্পনাই হইয়া থাকে। দেহাত্মবুদ্ধিতে সেই কল্পনানুরূপ বুঝ্ই ঠিক। আত্মার অতীন্দ্রিয় অবস্থায় ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ কোনও জ্ঞানই ছিল না। ইন্দ্রিয় জ্ঞান বাদ দিলে দেখিতে পাই জগৎ বলিয়া কোনও জিনিস নাই। এমন কি জগৎ জ্ঞানানুরূপ বর্ত্তমান আমিও নাই। বর্ত্তমান

আমি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কার সমষ্টি বা জগৎ জ্ঞানানুরূপ। বর্ত্তমান জগৎও আমার কল্পনানুরূপ ; এই জগৎ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এক রূপ এবং ইয়ুরোপীয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিকের পক্ষে ভিন্ন রূপ। আবার দেহবিশিষ্ট আত্মার বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা চতুষ্টয় ভেদে জগৎ জ্ঞানের ভেদ হইতেছে। পক্ষান্তরে ভাষার পার্থক্যেও জগৎ জ্ঞানের ভেদ হইতেছে। আড়াই হাজার ভাষা বিশিষ্ট বর্ত্তমান পৃথিবীতে বস্তুর সংজ্ঞার ভেদ হইয়া বর্ত্তমান জগৎজ্ঞানের ভেদ হইতেছে। বর্ত্তমান জাতি ভেদের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কল্পনার ভেদে জাতি ভেদ হইয়া জগতের ভাল-মন্দ, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম কার্য্যের ভেদ হইতেছে। ২২টা নিকা করা জাতিবিশেষের পক্ষে সঙ্গত, আবার একাধিক বিবাহ জাতিবিশেষের স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ ; আবার পুরুষের পক্ষে বহু বিবাহ বিধি। এবম্বিধ প্রকার ভেদ আত্মার কল্পনার ফল বই আর কি বলিব ?

এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত হইলে, কল্পনার পরিবর্ত্তন হইয়া সেই সম্প্রদায় অনুরূপই ঠিক বুঝে। কল্পনার পরিবর্ত্তনে রাতদিনই ঠিক বেঠিকের পরিবর্ত্তন হইতেছে। এ অবস্থায় বর্ত্তমান ঠিক বেঠিক কল্পনার ফল ভিন্ন আর কি বলা যায় ? আত্মা যখন দেহবিশিষ্ট হন তখন দেহাত্মিকা বুদ্ধি ভিন্ন তাহার অপর অস্তিত্ব থাকে না। দেহের দ্বারা আত্মা যাহা বুঝে সেই বুঝের বাহিরে আত্মার অন্য বুঝ্ও থাকে না। এজন্য দেহের ক্রিয়ার ভেদে জ্ঞানের যে ভেদ হয়, তাহা কোন কল্পনাই পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। শরীর যখন রুগ্ন হয় তখন রোগানুরূপ অনুভূতি ভিন্ন কল্পনানুরূপ অনুভব, দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মার করিবার শক্তিই থাকে না। শরীরে রক্তের

তাপের পরিমাণ বাড়িয়া যখন জ্বর হয় তখন সংস্কারে যে গ্রীষ্মকাল বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহাতে শীতানুভূতির বাধা জন্মাইতে পারে না, লেপ কাঁথার দরকার হয়। ইহা দ্বারা পরিষ্কারই দেখিতেছি শরীরের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট আত্মার জ্ঞানের বা অনুভূতির পরিবর্ত্তন হয়। যেরূপ কল্পনার পরিবর্ত্তনে সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইয়া মন্দের পরিবর্ত্তন হয়, সেইরূপ দেহের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইয়াও ভাল দেহানুরূপ অনুভূতির পরিবর্ত্তন হয়; সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধি বর্ত্তমানে অপরিবর্ত্তনীয় একটা জ্ঞান কিছুতেই সম্ভব হয় না।

অপর দিকে দেখিতেছি দেহের অনুভূতির বিষয়ই জ্ঞানে স্থির বা স্থায়ী রাখিবার জন্য, ভাষাযোগে ঐ অনুভবানুরূপ অনুভূতি হওয়ার জন্য, কল্পনা করিয়া থাকি। অথচ দেহাত্মিকা বুদ্ধিতেই পরিষ্কার বুঝিতেছি যে এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় না। চক্ষু দ্বারা শ্রবণ ও কর্ণের দ্বারা দর্শন অসম্ভব, ইহা মানবীয় জ্ঞানে জ্ঞান বর্ত্তমান। ইহাও জ্ঞানে পরিষ্কার জ্ঞান হইতেছে যে, চক্ষুতে যেরূপ স্পন্দন হইয়া যে জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়, তাহা চক্ষু ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের হওয়া সম্ভব নয়। রসগোল্লা জিহ্বায় দিলে যে ক্রিয়া জন্মায়, জিহ্বা যে জন্য লালায়িত, ঐ সুখকর মিষ্টাস্বাদ চক্ষে দিলে অনুভূতি না হইয়া বরং জ্বালা জন্মায় ও বিরক্তিকর হয়। ইহাতে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হইতেছে, সেই ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সে জ্ঞান সম্ভব নয়। অতএব শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় কোনও রকমে ইন্দ্রিয়ানুরূপ অনুভূতি করা যায় না। আত্মারাম ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষাবস্থায় শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয় অনুভূতি অনুরূপ অনুভূতি করার কল্পনা, সে কি ঠিক জ্ঞানে থাকিয়াই কল্পনার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল? না,

বেঠিক অবস্থায় এই কল্পনার প্রবৃত্তি? ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুরূপ ব্যাপারে প্রবল আসক্তি আসিয়া এ কল্পনার বুদ্ধি। বিশেষ কল্পনা করিতে যখনই যাই, তখনই স্বীকার করিতে হইবে, স্বরূপ জ্ঞান না হওয়ায়ই কল্পনার প্রবৃত্তি। অপর পক্ষে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা বুঝা যায়, যেটুকু বুঝা যায় বা যেরূপ অনুভূতি হয় তাহাই ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম বা কার্য্য। এখন ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মের বিপরীত বুঝিবার ইচ্ছা হইলে, সে অবস্থায়ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় বেঠিক ভিন্ন ঠিক ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায়ই কল্পনা বেঠিক বই ঠিক নয়।

অনেক সময় কল্পনায় যাহা অন্যায়, অসৎ ও অসঙ্গত বলিয়া বুঝিতেছি, শরীরের ক্রিয়া বিশেষ প্রবল হইয়া অর্থাৎ স্পর্শ সুখের ইচ্ছা প্রবল হইয়া ঐ অন্যায় অসঙ্গত কল্পনা উল্লঙ্ঘন করিয়া শরীরের ধর্ম্মানুরূপ কর্ম্মই করিয়া থাকি। যখন কল্পনার বিপরীত কর্ম্ম স্পর্শ সুখের জন্য করা হয়, তখন কল্পনা স্পর্শ সুখানুরূপ নয়। শরীরী আত্মা শরীরের অনুভূতির বিপরীত কিছুতেই বুঝিতে পারে না। শরীরে আগুণ লাগাইয়া দিলে যে জ্বালা বোধ হয়, ইহা আত্মার ইচ্ছা অনিচ্ছা বা কল্পনা কিছুতেই বাধা দিতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ স্পর্শাদির অবস্থা ভাষা প্রকাশ করিতে পারে না। আত্মা বা জ্ঞান কল্পনা করিতে গিয়া কল্পনার অবস্থানুরূপ জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া কল্পনাকে ঠিক বুঝে। কল্পনাকারী কল্পনাকে কল্পনা' বুঝিলে কল্পনাই সম্ভব হয় না। এক জ্ঞানই বহুবিধ অবস্থায় বহু প্রকার। যখন জ্ঞান যে অবস্থাপন্ন হয়, তখন সেই অবস্থানুরূপই জ্ঞানে ঠিক বোধ জন্মে। এই জন্যই আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান

সব সাজিতে পারি ও পরিবর্ত্তনে সবই ঠিক বুঝি। প্রত্যেক ব্যাপারেই জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন বুঝে; নতুবা ভিন্ন বোধ সম্ভব হয় না। এই ভিন্ন বুঝের মধ্যে যখনই জ্ঞানের পক্ষে বিপরীত অবস্থা ঠিক ধারণা হয় তখন জ্ঞানের পরিবর্ত্তিত অবস্থার ভুলকে ভুল বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ যেটাকে অন্যায় বলিয়া বুঝি, সঙ্গ ও অবস্থার, বা দেহের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে, যখন জ্ঞান সেই অবস্থাপন্ন হয় তখন কি অন্যায়কে অন্যায় বুঝি? যখন মরীচিকায় জল ভ্রম হয় বা সর্পে রজ্জু জ্ঞান হয় তখন কি মরীচিকা ও রজ্জু জ্ঞান জন্মে? ইহা দ্বারা পরিষ্কারই প্রমাণ হইতেছে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন অনুরূপই ঠিক বেঠিক। নতুবা মানবের ঠিক বেঠিক পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইত।

অপর দিকে দেখিতেছি যে আত্মার কোনও সংস্কার না থাকিলে তাহার পক্ষে এবম্বিধ দেহবিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব। নিদ্রাকালে দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ রহিত হয়; কোনও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার যোগ থাকিলে নিদ্রা অসম্ভব। তদবস্থায় আত্মার ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ কোন জ্ঞানই থাকে না; যে দেহযোগে আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান, এমন কি, সেই দেহই আমাদের জ্ঞানের বিষয় থাকে না। জ্ঞানে কোনও বিষয় নাই, অথচ তজ্জন্য আকাঙ্ক্ষা ইহা কি সম্ভব? অতএব জ্ঞানে বিষয় থাকিয়াই আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়। তাহা হইলে সূক্ষ্ম বা স্থূল-ভাবে এই দেহ-সংস্কার আত্মাতে জন্মিয়া দেহের কারণ হয়। যদি সংস্কার অভাবেও দেহের কারণ স্বীকার কর, তাহা হইলে এই দেহানুরূপ জ্ঞান আত্মার স্বরূপ জ্ঞান নয়। আত্মার দেহ সংস্কার বিহীন অবস্থায় দেহানুরূপ কোন জ্ঞানই ছিল না। যদি স্বীকার কর

ছিল, তাহা হইলে দেহানুরূপ সংস্কারও ছিল। বিষয় অভাবে বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব নয়; বিষয় অভাবে বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব স্বীকার করিলে জ্ঞানই বিষয়রূপে ভ্রান্তি জন্মাইতেছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় বর্ত্তমান জ্ঞানে স্বীকার করিতেই হইবে যে দেহের সংস্কার জন্মিয়াই বর্ত্তমান দেহের কারণ হইয়াছে।

দেহ-জ্ঞান পরিশূন্য অবস্থায় কোনও কল্পনাও সম্ভব হয় না। কাজেই যে দেহই এই বর্ত্তমান জ্ঞানের নানাবিধ ভেদের কারণ সেই দেহের অনুভূতিকে অতিক্রম করিয়া কোনও কল্পনা বা অপর কিছুই আমার জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না। এজন্য নানা জাতি নানা প্রকার কল্পনা করিতেছে, কিন্তু উদর উপস্থের স্পর্শ সুখকে বাদ দিতে পারিতেছে না। যে অবস্থায় কল্পনা ঠিক, সে অবস্থায় উদর উপস্থ ভুল বুঝা কোনও ক্রমে সম্ভব নয়। যেহেতু উদর উপস্থ দেহেরই অন্তর্গত ও কল্পনা থাকিলেই দেহ আছে। দেহ থাকিলেই উদর উপস্থানুরূপ অনুভূতিও তাহার স্পৃহনীয়। এক্ষেত্রে দেহের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইলে দেহীর দেহানুরূপ অনুভূতিরও পরিবর্ত্তন হয়; আবার দেহের সেই পরিবর্ত্তন অনুসারেই ঠিক বুঝি; সেস্থলে কল্পনার কোনও প্রভাব বা মূল্য থাকে না। এজন্য ঋষিরা গুরুবীজ, মূলমন্ত্র ও গুরু শব্দ দ্বারা দেহের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন করিয়া সেই ক্রিয়ানুরূপ অনুভব করাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার সার কথাই, যে সংস্কার দৃঢ় আছে, সেই সংস্কারের বিরুদ্ধ হইলেই বিরুদ্ধ বুঝিব, ইহাতে অণুমাত্র ভুল নাই। বিরুদ্ধ অর্থ কি? সংস্কারের বিরুদ্ধ; সংস্কার পরিবর্ত্তন হইলেই সেই বিরুদ্ধকে অনুকূল বুঝি।

সংস্কার পরিবর্ত্তন না করিয়া বা সংস্কার ত্যাগ না করিয়া ঠিক বেঠিক বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। সংস্কারও কতকগুলি কল্পিত সংজ্ঞা মাত্র—যে সংজ্ঞা-শব্দে আমাদের দেহের কোনও ক্রিয়ারই পোষণ হয় না বা ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়া হয় না—ব্যক্তি, বস্তু আবশ্যক করে। দেহের অনুভূতির অনুরূপ অনুভবের জন্য বস্তু, ব্যক্তি, বিষয় অভাবেও আবশ্যকতা জন্মে, এই হেতুই কল্পনা করি। বাস্তবিক পক্ষেও দেহের অনুভূতি অনুরূপ অনুভূতিই সুখ মনে করি। দেহী সেই দেহের সুখের জন্য যাহা কিছু করে সর্ব্বেব ঐ জন্যই করিয়া থাকে।

সংস্কারের বিরুদ্ধ উপদেশ সংস্কার পরিবর্ত্তন না করিয়া দিলে বিরুদ্ধই বুঝিবে। যদিও সাময়িক কাহারও সঙ্গ বা কল্পনা প্রভাবে ঠিক বুঝে, চির অভ্যস্ত সংস্কার প্রভাবে পরক্ষণেই আবার ভুল বুঝিবে। এইজন্যই ঋষিরা সঙ্গ দ্বারা দীর্ঘকাল অভ্যাস করাইয়া সংস্কারের পরিবর্ত্তন করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গ বাদ দিয়া আমার বর্ত্তমান আমিই থাকে না; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়ের সংস্কার বাদ দিলে আমি কোথায়? সে সংস্কার কল্পনামূলে; কল্পনা বাদ দিলে সংস্কারও থাকে না। তাহা হইলে যে সংস্কার-বিশিষ্ট আমি, সে আমি কল্পিত। সুতরাং এই কল্পিত আমি আমার স্বরূপ কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। স্বরূপে গেলেই আমার কল্পনা বাদ দিতে হয়। আমি কল্পনা লইয়াই আমাকে খুঁজি; সুতরাং কল্পনার 'আমি' বাদ দিয়া স্বরূপ 'আমি'র জ্ঞান আমাতে কিছুতেই সম্ভব নয়। যে গুরু চিন্তায় অলক্ষিতভাবে আমার বর্ত্তমান আমির অভাব হয়, সেই গুরু চিন্তা ভিন্ন অন্য ঔষধ নাই। ব্যাধি নির্ণয় না করিয়া ঔষধ দিলে কি হইবে? আবার ব্যাধি অনুরূপ ঔষধ পড়িলে রোগ নিশ্চয় আরোগ্য

হইবে। আবার অনেক স্থলে দেখা যায় কুপথ্যে ঔষধের ক্রিয়া না হইয়া অকাল মৃত্যু ঘটে। এস্থলেও সংস্কারানুরূপ কুপথ্য, বিপরীত সঙ্গ, বাদ না দিলে ঔষধে কোন ক্রিয়া করিবে না। বাবা আজ রুগ্ন অবস্থায় 'জগৎকে' মনে আসিয়া যাহা মনে আসে তাহা লিখিলাম। চিঠিখানি পাঠে 'জগতের' উপযোগী হইলে সুখী হইব। আমি যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি ও রীতিমত ঔষধাদি খাইতেছি। ইতি—

[(২৯)—সু]

আত্মা সর্ব্বদাই চায় বা খোঁজে; কি চায় কি খোঁজে, খুঁজিতে গেলে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীব বুঝে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই চায় ও খোঁজে। আবার ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দিয়া ইহাও বুঝে যে, বস্তু বা বিষয় জ্ঞানে জ্ঞান না জন্মিলে, চাওয়া বা খোঁজা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞানই সুস্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে যে, ইন্দ্রিয় অভাবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় জ্ঞানে জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং ইন্দ্রিয় অভাবে চাওয়া খোঁজা নাই, একথা ইন্দ্রিয়জ্ঞান বর্ত্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে।

দেহই দেহ-জ্ঞানের কারণ; যেহেতু দেহ অভাবে ইন্দ্রিয় সম্ভব নয়। দেহাতীত আত্মা দেহ-বিশিষ্ট না হইয়া দেহ বুঝে না ও দেহজ্ঞান-মূলক বস্তু বা বিষয়ও বুঝে না। এজন্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, দেহ বর্ত্তমানেই দেহজ্ঞান অনুরূপ বস্তু বা বিষয় আবশ্যক। দেহাতীত অবস্থায় আত্মার কোনও বিষয়ের প্রয়োজন নাই। এখন যদি দেহ-বিশিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে আত্মার দেহাতীত একটা অবস্থা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তদবস্থায় বর্ত্তমান দেহ-জ্ঞানানুরূপ কোন বিষয়

তাহার জ্ঞানে ছিল না ও তদনুরূপ কোন বিষয়ে তাহার বাসনা ছিল না স্বীকার করিতে হয়। অপর পক্ষে যাহা আত্মার জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই তাহার বাসনার বিষয় হয়; কেবল সংস্কারের পার্থক্যে আবশ্যক বা প্রয়োজনের ভেদ হয় মাত্র। আবার সংস্কারের ভেদ হইলেও আবশ্যক-প্রয়োজনের ভেদ হয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, কোন না কোন অবস্থায় আত্মার পক্ষে আবশ্যক নাই এরূপ একটা বিষয় বা বস্তুই নাই। ইহাও দেখা যায় যে, আত্মা এক অবস্থায় যাহা অনাবশ্যক বোধ করিতেছে, সংস্কারের বা কল্পনার পরিবর্ত্তনে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া, আবার তাহাই প্রয়োজন বোধ করিতেছে। অপর দিকে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ ভিন্ন জ্ঞানের এবম্বিধ পরিবর্ত্তনের অপর কোনও কারণ নাই। বর্ত্তমান দেহ-বিশিষ্ট আত্মার পক্ষে এমন একটা বিষয়ই নাই যাহা কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগে জ্ঞান হয় নাই। আবার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গমূলে জ্ঞানের ভেদ হইয়া সংস্কারের পার্থক্যে ভাল-মন্দ, আবশ্যক, অনাবশ্যকের ভেদ হইতেছে।

"সঙ্গের ভেদে জ্ঞানের ভেদ" এই সংস্কার জ্ঞানে দৃঢ়বদ্ধ না হইলে, জ্ঞান নদী স্রোতে তৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইবেই হইবে; এবং মাঝে মাঝে আবর্ত্তের বা পাক জলের ভিতরে পড়িয়া প্রতিনিয়ত ঘুরিতে থাকিবে। এইজন্যই গুরুরা সঙ্গের ভেদ করাইয়া শিষ্যের জ্ঞানের ভেদ করিয়া থাকেন। যে অবস্থায় বিরুদ্ধ সঙ্গ রুচিকর হয়, সেই অবস্থায়ই বিরুদ্ধ সঙ্গ জ্ঞানের অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানের গন্তব্য স্থান কোথায়, তাহাও জ্ঞান সঙ্গ প্রভাবে—বুঝিতে পারে না। অথচ যেরূপ সংস্কার বা সঙ্গ প্রভাবে জ্ঞান যদবস্থাপন্ন, তদবস্থা যে অন্য

সঙ্গমূলে পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে, ইহা জ্ঞানে জ্ঞান না থাকিলে, যে অবস্থায় যাহা আবশ্যক মনে করিতেছে, অন্য অবস্থায় যে তাহা অনাবশ্যক হইবে, ইহা বুঝিতে পারে না। এই কারণেই দেহাতীত আত্মা দেহবিশিষ্ট হইয়া, দেহের প্রয়োজনীয় বিষয়কেই নিজের প্রয়োজনীয় মনে করিতেছে। দেহাতীত আত্মা দেহ-জ্ঞানে একটা সংজ্ঞা-শব্দ মাত্র। কারণ, দেহবিশিষ্ট অবস্থায় আত্মা দেহ দ্বারা দেহ-জ্ঞানের বিষয় যেরূপ অনুভব করে, দেহাতীত অবস্থাকে সেরূপ অনুভব করে না। কারণ, এক অবস্থায় অন্য অবস্থার জ্ঞান অসম্ভব—যেমন ক্রোধে ধৈর্য্যের অভাব, হিংসায় দয়ার অভাব ইত্যাদি।

যদি স্বীকার করা যায় যে আত্মা অনাদিকাল ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা ইন্দ্রিয় সংস্কার বিশিষ্ট, তাহা হইলে একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে আত্মার স্বরূপও অভাব বিশিষ্ট, কেননা, ইন্দ্রিয়জ্ঞান অপর ভিন্ন নিজকে বুঝিতে পারে না। সুতরাং আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞান পক্ষে চিরকাল অভাব। অপর পক্ষে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বা ইন্দ্রিয়-সংস্কারে যাহা বুঝি, তাহাতে আত্মা ভিন্ন একটা পৃথক জ্ঞান জন্মে বলিয়া, সেই পৃথক অংশটা আত্মার জ্ঞানে চিরকালই অভাব থাকিবে। এইরূপ অভাব আত্মার ধর্ম্ম হইলে, অভাবই আত্মার স্বভাব হয়, অভাবকে অভাব বুঝাই অসম্ভব হয়! অভাব আত্মার স্বভাব নয় বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য আত্মার সতত ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি।

বর্ত্তমান জ্ঞানে পরিষ্কারই জ্ঞান হইতেছে যে, যে বস্তুরই অভাব বুঝি, তাহাই আবশ্যক বোধ করি ও তজ্জন্যই আমার আকাঙ্ক্ষা। এই অভাবটা বস্তু বা বিষয় জ্ঞান হইতে জন্মিতেছে। বস্তু, বিষয়, জ্ঞান অভাবে, বর্ত্তমান জ্ঞানে অভাব বোধ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়; অতএব

বস্তু, বিষয় জ্ঞান অভাবেও আত্মাতে অভাব ছিল এ আপত্তি অমূলক ও ভ্রান্তি বই আর কিছুই নয়, কুতর্ক মাত্র। আত্মার অভাব পরিশূন্য অবস্থা স্বীকার করিলেই, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সংস্কার রহিত অবস্থাই "অভাব পরিশূন্য অবস্থা" বা আত্ম-স্বরূপ। তদ্ভিন্ন আত্মার একটা নির্দ্দিষ্ট স্বরূপই সম্ভব নয়।

প্রতিনিয়তই জ্ঞেয়ের ভেদে জ্ঞানের ভেদ হইয়া আত্মার ভেদ হইতেছে দেখা যায়। জ্ঞেয়ের ভেদে জ্ঞানের যে ভেদ হয়, তাহা ভিন্ন বলিয়া স্বীকার না করিলে, "ভিন্ন" বলিয়া কোন একটা জিনিসই থাকে না; শীত-গ্রীষ্ম, ভাল-মন্দ, ইহার ভিতর কোনও ভেদ নাই স্বীকার করিতে হয়। আর এই ভেদকে যদি কল্পনা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে কল্পনার কল্পনানুরূপ একটা ভেদ আত্মায় জন্মাইতেছে ইহাও স্বীকার করিতে হয়; তাহার ফলেও দাঁড়ায় স্বরূপের কোনও ভেদ নাই। অতএব কল্পনার পার্থক্য ভিন্ন ভেদের ভেদ করিবার উপায় নাই।

অপর পক্ষে এই কল্পনাও দেহজ্ঞান পরিশূন্য অবস্থায় সম্ভব কি না, সুষুপ্তি অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়। ইহাও পরিষ্কার দেখিতে পাই যে, স্বপ্নাবস্থায় তদনুরূপ অবস্থাই ঠিক বুঝি; কেবল জাগ্রদবস্থায়ই স্বপ্নাবস্থাকে স্বপ্ন বা বেঠিক বুঝি। ইহাতে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, জ্ঞান বা আত্মার অনুভূতি অবস্থানুরূপ। রসগোল্লা জিহ্বায় দিলে মিষ্ট বুঝি, চক্ষে দিলে জ্বালা হয়; তাহা হইলে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পার্থক্যেও জ্ঞানের বা অনুভূতির পার্থক্য হইতেছে। এই জ্ঞান পার্থক্য যে অবস্থার জন্য, সেই অবস্থার অভাবে আত্মার সেই অবস্থানুরূপ জ্ঞান কি সম্ভব? অসম্ভব স্বীকার করিলেই স্বীকার

করিতে হইবে যে, দেহ সংস্কার রহিত অবস্থায় আত্মাতে এবম্বিধ কোন অবস্থাই বর্ত্তমান নাই। এই বর্ত্তমান অবস্থায় বা জ্ঞানে যে অবস্থা ধারণা হয় না, সে অবস্থার জন্য আকাঙ্ক্ষা বাসনা সম্ভব হয় কি? এ অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত সেই অবস্থা। এই অভাববিশিষ্ট অবস্থার বিপরীত অবস্থাই সেই অভাব রহিত অবস্থা। অভাববিশিষ্ট অবস্থাই যদি তোমার বাঞ্ছনীয় হয়, তবে অভাবে জ্বালা বোধ কর কেন? একটু চিন্তাকুলচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিবে, সেই অতীন্দ্রিয় অবস্থার জন্যই তুমি ব্যাকুল ও তুমি তাহাই চাও ও খুঁজিতেছ। কেবল ইন্দ্রিয় সঙ্গই ভ্রান্তি জন্মাইয়া তোমার গন্তব্য স্থান বা প্রাপ্তব্য বস্তুর জ্ঞান অভাব রাখিয়া তোমাকে ঘুরাইতেছে, এই ভ্রান্তি অপনোদনের একমাত্র ঔষধ গুরু। ইতি—

[(৩০)—স্ব]

বর্ত্তমান জ্ঞানে বর্ত্তমান জ্ঞানানুরূপ ব্যাপার ভিন্ন অন্য জ্ঞান বা ধারণা হওয়া সম্ভব হয় না। তাই বর্ত্তমান জ্ঞানের অবিষয় যে কোন বিষয়ই তোমাকে বলি বা বুঝাইতে যাই, তাহা বর্ত্তমান জ্ঞানে বিপরীত বা ভুল বলিয়াই তোমার ধারণা হইবে। আমাদের বর্ত্তমান বুঝ্ বা জ্ঞানের স্বরূপ কি দেহের অনুভূতি অনুরূপ না কল্পনা অনুরূপ? এই উভয় অবস্থার জ্ঞানের কোন্ স্বরূপ অনুরূপ স্বরূপ বুঝিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া থাকি?

দেখিতে পাই ক্ষুৎ-পিপাসা, লোভ-কামাদি ও ব্যাধি আদিতে দেহের অনুভূতিকে অতিক্রম করিয়া কল্পনা স্থান পায় না; বিশেষ,

দেহের স্পর্শ সুখের জন্যই প্রাণ সতত লালায়িত। অপর পক্ষে ইহাও দেখা যায় যে দেহ দ্বারা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যোগে; যাহা অনুভূতি হইতেছে, তৎ সমুদয় বিষয়ই সংজ্ঞা দ্বারা কল্পনা করি। তাহা হইলে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে দেহের অনুভূতি আমার স্মৃতিতে বদ্ধ রাখিবার জন্যই আমার কল্পনা। এই উভয় অনুভূতির মধ্যে কল্পনা দ্বারা বিষয় অভাবে দেহের অনুভূতি অনুরূপ অনুভবের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং দেহানুভূতি অনুরূপ অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত দেহের সহিত বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয় সংযোগ ইচ্ছা প্রবল থাকে। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, দেহানুরূপ অনুভূতিই আমাদের উপস্থিত জ্ঞান পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

অপর পক্ষে দেখিতেছি বর্ত্তমান জ্ঞানে একটাকে ঠিক বুঝিয়া তাহার তুলনায় অপরটাকে বেঠিক বুঝি। জ্ঞানে একটা ঠিক ধারণা আছে বলিয়াই তদ্বিপরীতটাকে বেঠিক বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে আবার ইহাও দেখা যায় যে, যাহা পুর্ব্বে বেঠিক বলিয়া জ্ঞান ছিল, সঙ্গ বা চিন্তানুধ্যানের পরিবর্ত্তনে জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হইয়া, সেই বেঠিকটাও আবার ঠিক বলিয়া ধারণা হয়। তাহা হইলেই, জ্ঞান যখন যে স্বরূপে অবস্থান করে, তখন সেই স্বরূপের বিপরীতটাই তাহার পক্ষে বেঠিক। জীবের দেহাত্মবুদ্ধি বর্ত্তমানে দেহের অনুভূতি ঠিক ধারণা না থাকিয়াই পারে না; কাজেই তৎ তুলনায় তদ্বিপরীত সমস্তই বেঠিক। এই জন্যই গ্রীষ্মকাল সংস্কারে থাকিলেও ঐ কালে জ্বরাবস্থায় শীতানুভূতির বাধা জন্মে না।

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-এই পঞ্চ জ্ঞানই দেহের স্পন্দনের পার্থক্যের ফল। শব্দ দেহের স্পন্দনের ভেদ মাত্র; সুতরাং শব্দ দ্বারা শব্দানুরূপ স্পন্দন ভিন্ন দেহাত্মিকা বুদ্ধি অন্য স্পন্দন অনুভব করিতে

পারে না। আমরা যে কল্পনামূলে শব্দ দ্বারা (ভাষা যোগে) অপর অনুভূতি অনুরূপ অনুভব করি বলিয়া মনে করি, সে কেবল কল্পনা। কল্পনা করিতে গিয়া জ্ঞান কল্পনানুরূপ হয় বলিয়াই কল্পনাটাকে ঠিক বুঝি। এস্থলে সমগ্র দেহের স্পন্দন পরিবর্ত্তন ভিন্ন দেহাত্মিকা বুদ্ধিকে ভুল বুঝা, এ দেহ সংস্কার বর্ত্তমানে, কিছুতেই সম্ভব নয়।

পিপাসা শান্তিকারী ও আর্দ্র বা সিক্তকারী জলকে যে 'জল' বলিয়া আখ্যা বা নাম দিয়া থাকি, ঐ আখ্যা দাতা ও বোদ্ধা এক বলিয়াই ঠিক বুঝি ; অথচ ঐ আর্দ্রকারী ও পিপাসা শান্তিকারক পদার্থ আর কল্পিত 'জল' শব্দ এক নয় ; কেননা, ঐ পদার্থ দ্বারা সিক্ততা কার্য্য ও পিপাসা শান্তি সর্ব্ব ভাষাবিদেরই হইতেছে, কিন্তু ঐ দ্রব্যের সংজ্ঞা সর্ব্ব ভাষাবিদের এক নয়। যে বস্তু সর্ব্ব মানবের দেহে এক রূপ স্পন্দন জন্মাইয়া দেহানুভূতি এক রকম করাইতেছে, তাহার নাম বা সংজ্ঞা-শব্দের স্পন্দন বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রূপ হইতেছে ; কাজেই বস্তু অনুরূপ স্পন্দন নামের দ্বারা হইতেছে না। এস্থলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে নামের দ্বারা বস্তু অনুরূপ অবস্থা প্রকাশ করা যায় না। অতএব ভাষা দ্বারা যতই বুঝাইতে চেষ্টা করি না কেন, দেহাত্ম-বুদ্ধিতে দেহের অনুভূতি অনুরূপ অনুভব কোন ক্রমেই করান যাইবে না। ইহা বুঝিয়াই চিঠি-পত্রে উপদেশ লেখা বন্ধ করিয়াছিলাম।

সঙ্গের ভেদে যে জ্ঞানের ভেদ হয়, তাহাতে আর কল্পনা আবশ্যক করে না। বস্তুর ক্রিয়া অনুরূপ ক্রিয়া, দেহের ক্রিয়া ভেদ করিয়া, জ্ঞানের ভেদ করিবেই করিবে। আগুন লাগাইয়া দিলে ব্যক্তি মাত্রেরই জ্বালা বোধ হয়। রসনার সহিত যেরূপ বস্তুর সংযোগ হয় তদনুরূপ অনুভূতি হইবেই হইবে। এইরূপ অনুভূতি চক্ষু আদি সর্ব্ব

ইন্দ্রিয়েই বস্তু ভেদে জ্ঞানের ভেদ জন্মাইবে। কাজেই সঙ্গের পরিবর্ত্তন ভিন্ন পরিবর্ত্তনের অন্য উপায় নাই।

[(৩১)—সু]

বুঝাবুঝি লইয়া রাতদিন মারামারি করিতেছি। বুঝে যে কি বুঝি তাহা কিছুই বুঝি না। বুঝি না—ই যদি এই বুঝের পক্ষে ঠিক হয়, তাহা হইলে 'বুঝি' বলিয়া যে বুঝি তাহা ভুল হইতেছে; সুতরাং ভুল লইয়াই আছি। আর এই ভুল যে বর্ত্তমান বুঝেই বর্ত্তমান তাহাও নহে। যাহা বুঝিয়া এই দেহ বিশিষ্ট হইয়াছি, তাহা যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে এই দেহের বুঝেও ভুল হইত না, ঠিক হইত। দেহবিশিষ্ট হইবার পূর্ব্বে কি বুঝিয়াছি তাহা না বুঝিলেও, ইহা বুঝি যে ভুল বুঝিয়া দেহ লইয়াছি; কেননা দেহ লইবার পূর্ব্বে বুঝ ঠিক থাকিলে, দেহের আবশ্যক হইত না। আর ঠিক বুঝিয়া দেহ লইলে, দেহ যোগে যাহা বুঝিতেছি তাহা ঠিক বুঝিতেছি; বেঠিক বলিয়া একটা কিছুই সম্ভব হয় না। দেহ বুঝে ঠিক বেঠিক উভয়টাই বুঝি, এ অবস্থায় নিরেট ঠিক বুঝ্ লইয়া দেহ লই নাই; যেহেতু বর্ত্তমান বুঝ্ই ঠিক বেঠিক উভয়টাই বুঝাইতেছে।

অপর পক্ষে যে সুখের আশায় বুঝাবুঝি, যাহাই বর্ত্তমান জ্ঞানে সুখের বুঝিতেছি, তাহার প্রত্যেক ব্যাপারেই দুঃখ বর্ত্তমান। এ অবস্থায় প্রকৃত সুখের বিষয় আমার জ্ঞানে ঠিক রূপে নির্ণয় হয় নাই; নির্ণয় হইলে প্রত্যেক সুখের ব্যাপারে দুঃখ সম্ভব হইত না। অতএব

ভুল বুঝ্ লইয়াই দেহ লইয়াছি। যদি সুখের জন্যই দেহ লইয়া থাকি তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে দেহ লইবার পূর্ব্বে আত্মার সুখের অভাব ছিল। সুখই আত্মার বাঞ্ছনীয় জিনিস—সেই সুখই আত্মার জ্ঞানে জ্ঞান ছিল না—এ অবস্থায়ও আত্মার ভুল ছিল না, একথা কি স্বীকার করা যায়? অতএব ভুলের অবস্থায়ই আত্মার দেহে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে।

জ্ঞানে ভুল থাকিয়া যে বাসনা আকাঙ্ক্ষা জন্মে তাহা ভুল বই ঠিক কিরূপে স্বীকার করা যায়? বর্ত্তমান দেহ-যোগে আত্মার যে জ্ঞান বা অনুভূতি হইতেছে, সেই অনুভূতির বিষয় আত্মা ইন্দ্রিয় যোগে ঠিক ধারণা করিতে না পারিয়াই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। চক্ষের দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শনের দ্বারাই তৃপ্তি বোধ করিলে আর ভাষার কল্পনার আবশ্যক হইত কি? ভাষাযোগে দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্রষ্টব্য বিষয় যাহা বুঝি ও বুঝাইতে চাই তাহাতে দেখিতে পাই, দর্শনানুরূপ ক্রিয়া হয় না; অথচ দর্শনের বিষয় ভাষায় ঠিক বুঝি। এই ঠিক বুঝ্‌কে যদি ঠিক স্বীকার করি, তাহা হইলে বেঠিক বলিয়া কোনও জিনিস নাই। আমি যাহাকে যে নাম দেই বা যে নাম দ্বারা যাহা ঠিক বলিয়া কল্পনা করি, তাহা আমার পক্ষে সর্ব্বদাই ঠিক, বেঠিক বলিয়া আমার কোনও জিনিস নাই।

জ্ঞান যুগপৎ দুইটা ধারণা করিতে পারে না; সুতরাং জ্ঞানে প্রতিনিয়তই একটা মাত্র এক সময়ে জ্ঞান হইতেছে। এই প্রকারে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েই একাধিক বিষয় জ্ঞান এক সময়ে হওয়া সম্ভব নয়। যে একটা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে জ্ঞান হয়, সে কিরূপ জ্ঞান, কি জ্ঞান হয় ইত্যাদি বুঝিতে গেলেই ভাষার আবশ্যক হয়। তাহা হইলে স্বীকার করিতে

হইবে ভাষার কল্পনা ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানে জ্ঞানাভাব থাকে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় যাহা অনুভব করি, সেই অনুভবে আত্মার তৃপ্তি হয় না বলিয়াই ভাষার কল্পনা।

অপর পক্ষে দেখা যায়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আমি বা জ্ঞান ভিন্ন অন্য একটা অবস্থার অনুভূতি বা বোধ জন্মাইতেছে ; অথবা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই দ্বিতীয় আর একটা বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান হয়। এ হেন অবস্থায়, দ্বিতীয় বোধ রহিত অবস্থায় এই দ্বিত্ব জ্ঞান বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় সমন্বিত একটা দেহের আকাঙ্ক্ষা আত্মার হওয়া কি সম্ভব ? যদি সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই অপেক্ষা না করিয়া এই দেহ উৎপত্তি হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। যদি আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা অপেক্ষা না করিয়া দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে আত্মানুরূপ কোনও কর্ম্মই হইতেছে না, একথাও স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি দ্বিতীয় বোধ আত্মাতে জন্মিয়াই এই দেহের প্রতিকারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই দ্বিতীয় বা জ্ঞেয় দ্বারা আত্মার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হওয়ায়ই, এই দ্বিত্ববোধক দেহ লইয়াছে। সেই দ্বিত্ববোধ অবস্থায় দ্বিতীয় বস্তু কি, সে বিষয়েও জ্ঞানের জ্ঞানাভাব ছিল। তাহার কারণ এই যে, বর্ত্তমানে ইন্দ্রিয়যোগে যে দ্বিতীয় বোধ জন্মিতেছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় হইতেছে না। এই হেতুই ভাষার কল্পনা আবশ্যক করে। ভাষার কল্পনা ব্যতীত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে বা বুঝাইতে কিছুতেই পারি না। এমন কি 'বুঝি' জ্ঞানও ভাষা ভিন্ন থাকে না। জ্ঞান বা আমি ভিন্ন 'অপর একটা' এই মাত্র আমার জ্ঞান পূর্ব্বেও ছিল, বর্ত্তমানেও আছে। সেই জ্ঞান

কি, এই প্রশ্ন আসিলেই ভাষা আসিয়া পড়ে। অনুভূতিতে 'কি' বা 'কেন' নাই। ঐ 'কি' বা 'কেন' আমাকে কল্পনা করিতে হয়।

আত্মেতর দ্বিতীয় বোধটা কল্পনা বলিয়াই কল্পনা ব্যতীত ঐ দ্বিতীয় বোধের স্বরূপ নির্ণয় হয় না। উহার স্বরূপ থাকিলে তৎস্বরূপের দ্বারাই যাহা নির্ণয় হইত তাহাই উহার স্বরূপ বলিয়া বুঝা যাইত। যে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে কল্পনার আবশ্যক তাহা কল্পিত বই স্বরূপ বিশিষ্ট নয়। আর যদি তাহার অর্থাৎ ঐ দ্বিত্ব জ্ঞানের স্বরূপ আছে স্বীকার করি, আর আমার জ্ঞানে স্বরূপ জ্ঞান হইতেছে না বুঝি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমি ভ্রান্তিতে আছি। আমি ভ্রান্তিতে থাকিয়া স্বরূপ জ্ঞানের অভাবেই কল্পনা করিতেছি। সে কল্পনা কি ভ্রান্তি নয়? অথবা এই ভ্রান্ত বুদ্ধিতেই তাহার স্বরূপ আছে বলিয়া বুঝিতেছি। ভ্রান্ত অবস্থায় যে স্বরূপ বুঝি তাহা ভ্রম জ্ঞানেই বুঝা যাইতেছে। ভ্রম জ্ঞানের স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রান্ত অবস্থার স্বরূপ জ্ঞান বিরূপ জ্ঞানকেই স্বরূপ বুঝিতেছে। ভ্রান্তির ধর্ম্মই একটাকে অন্য বুঝা; সুতরাং ঐ দ্বিত্ব জ্ঞানের স্বরূপ আছে বলিয়া যে স্বীকার করি তাহা ভ্রমেই করি।

বর্ত্তমান দেহ ভ্রান্তি হইতেই সমুদ্ভূত ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; তাই বর্ত্তমানেও সর্ব্বদাই ভ্রমে ভ্রমিতেছি, এবং যাহাই বুঝিবার জন্য কল্পনা করিতেছি তাহা ইন্দ্রিয়ের বুঝ্‌মত হইতেছে না, হইতে পারেও না। তবে যে ঠিক বুঝি সে ভ্রম বুদ্ধিতে ভ্রম জ্ঞানেই কল্পনা করি ও ভ্রান্তি অনুরূপই ঠিক বুঝি। ভ্রান্তি থাকিতে বেঠিককে বেঠিক বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। বেঠিককে ঠিক বুঝার নামই ভ্রান্তি। এখন ঠিকে আছি না ভ্রান্তিতে আছি, ইহা ঠিক বুঝিবার চেষ্টা করিলে,

প্রত্যেক পদেই প্রমাণিত হয় যে ঠিকে নাই। কারণ, এই জ্ঞান দিয়া যাহাই ঠিক ধারণা করি, সেই জ্ঞান পরিবর্ত্তন হইয়াই ঠিককে বেঠিক বুঝাইতেছে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝি না, ভাষার সাহায্য আবশ্যক হয়। ভাষায় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধানুরূপ জ্ঞান দিতেছে না, কেবলমাত্র ঐ ইন্দ্রিয়ানুরূপ জ্ঞানের জন্য একটা পিপাসা মাত্র জন্মায়। আমি ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ জ্ঞানের পিপাসায়ই ভাষা কল্পনা করি; কাজেই ভাষা দ্বারা পিপাসাই জন্মে, ইন্দ্রিয়ানুরূপ অনুভূতি হয় না। যাহা কিছু করি সুখের পিপাসায়ই করি, অথচ প্রত্যেক ব্যাপারেই দুঃখ বোধ করি; তবুও স্বীকার করি না যে ভ্রান্তিতে আছি? আমি যাহা চাই না, তাহা আমার কার্য্য দ্বারাই ঘটিতেছে; তবুও আমি ভুল করি না? আমি যে সুখের জন্য পাগল, সে সুখের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না; তবুও কি বলিব না বা স্বীকার করিব না যে সুখের জিনিস বলিয়া যাহা কল্পনা করি তাহা ভুল? আমার শরীরের ধর্ম্মে যখন যাহা সুখের বুঝে, শরীরের পরিবর্ত্তনেই আবার তাহাই দুঃখের বুঝে। এ ভ্রম কি আমার শরীরের ধর্ম্মে জন্মাইতেছে না? শরীর আমি নহি, শরীরকে আমার সুখের কারণ বুঝি, ইহা কি ভ্রান্তির ফল নয়? বুঝি বলিয়া সর্ব্বদাই অভিমান করি, কিন্তু অপর ব্যক্তিকে বুঝিতে গেলেই সে কি বুঝে তাহা বুঝি না। তথাপিও যে ভ্রমে আছি ইহা স্বীকার করি না; ইহার কারণ কি ভ্রান্তি নয়?

এতদিন তালাস করিয়া বুঝিয়াছি, ভ্রান্তি থাকিতে ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বুঝিবার চেষ্টা করাই ভ্রান্তি, কেননা ভ্রান্ত অবস্থায় ভ্রান্তিই ঠিক। হায়, যে গুরুই ঠিক বুঝেন, তাহাকে ভ্রান্তিতে ঠিক না বুঝিয়া, আমি

এই বেঠিকের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। বিশু, হয় আমাকে একটু গুরু বুঝাও না হয় গুরু বুঝিতে দেও, এই আমার শেষ কথা। ইতি—

[(৩২)—জ]

সঙ্গের প্রভাব জীব কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না; বিশেষ পূর্ব্বাভ্যাস অনুরূপ সঙ্গ বর্ত্তমানে জ্ঞানের বিপরীত চিন্তা ও অনুধ্যানও অসম্ভব। দেহের বুঝ্ আর ভাষার বুঝ্ এক নয় বলিয়াই একটা দ্বারা অপরটার অভাব করা সম্ভব হয় না। বর্ত্তমান বুঝের বিপরীত বিষয় ও বিপরীত না বুঝিয়া অনুকূল বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। এদিকে ভবিষ্যৎ কল্পনায় মনকে রাত্রিদিন আবদ্ধ রাখায় ভুলটাও জ্ঞানের বিষয় হয় না। ভাষায় অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিতেছি; কিন্তু অতীতটা না বুঝিয়া বর্ত্তমানের ন্যায় ঠিক বুঝি। ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্ত্তমান জ্ঞানে বর্ত্তমান নাই বুঝিলে অতীত, ভবিষ্যৎ আমার জ্ঞানে থাকেই না।

[(৩৩)]

ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে যে অবস্থা বা জ্ঞান দেয় ভাষা দ্বারা তদবস্থা অনুরূপ কোনও অবস্থাই প্রকাশ পায় না। এ কারণেই আমরা ভাষাযোগে যাহা ইচ্ছা তাহাই কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু দেহের ধর্ম্মে যাহা করায় তাহা ঐ কল্পনামূলে কিছুই বাধা করিতে পারে না।

যে পর্য্যন্ত দেহে অনাস্থা না জন্মায় বা দেহের ক্রিয়ার বাধা না দেয় সে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন সম্ভব।

[(৩৪)—জ]

আত্মা সংস্কার লইয়া দেহবিশিষ্ট হইলে, যেরূপ সংস্কার লইয়া দেহবিশিষ্ট হয়, দেহটি তদনুরূপই ও তদনুরূপ উপাদান বিশিষ্ট। সংস্কারের পার্থক্যে আত্মা নানা প্রকার দেহবিশিষ্ট হয়; এবং সংস্কারানুযায়ী দেহ, আকার, আহার ব্যবহার সমস্তই হয়। জগতে তাহার স্থায়িত্বকালও সংস্কারের পার্থক্যে ভিন্ন দেখা যায়। কতকগুলি প্রাণী ১২—১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে, ইহার অধিক বাঁচে না; মানবের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে যে মৃত্যু দেখা যায়, তাহার কারণও ঐ সংস্কারানুরূপ দেহের স্থায়িত্বকাল বলিয়াই ঐরূপ ঘটে। মানুষ বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করিয়া মানুষকে অমর করিতে পারে না অথবা যে সময়ে মরিতেছে তাহার কোনও প্রতীকারের দ্বারাও বাধা হইতেছে না। দেখা যায়, পশু পক্ষী স্বভাবের নিয়মে থাকিয়া স্বভাব চিকিৎসক রূপে তাহাদের দেহের চিকিৎসা করা সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট কালকে অতিক্রম করিতে পারে না; গরুগুলি ২২ বৎসরের অধিক কিছুতেই বাঁচে না; ইহা দ্বারা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে ঐ দেহেতে আত্মারাম ঐ ২২ বৎসরের অধিক থাকিতে পারে না। যদি সংস্কার ভেদে দেহের ভেদ হয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দেহের স্থায়িত্বকাল দেহের সংস্কারানুরূপ, ইহাও স্বীকার করিতে হয়।

সংস্কার পরিবর্ত্তনে মনোবুদ্ধির স্বাধীন ক্ষমতা থাকায়, মানুষের স্থায়িত্ব কালের উপর মানবীয় বুদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। হিন্দু সংস্করাপন্ন ব্যক্তি খৃষ্টান বা মুসলমান হইতেছে; আবার বিষয় সংস্কারাপন্ন ব্যক্তি বিষয় ছাড়িয়া ধর্ম্মভাবাপন্ন হইতেছে। এইরূপ সংস্কারের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই দেখিতেছি। আবার ঐ সংস্কারের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপাদান ও জীবনীশক্তিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। কেবল সংস্কার প্রভাবে সংস্কারানুরূপই যে অবস্থা লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে পড়ি, অর্থাৎ জন্মান্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি, তাহা কেবল আমার পূর্ব্ব সংস্কারের ফলেই বুঝিতে হইবে। অথবা মাতৃগর্ভ হইতেই মৃতদেহ লইয়া জন্মে, কিম্বা জন্মমাত্রই মরিয়া যায়—এ সব পূর্ব্ব সংস্কারের অনুরূপই দেহের উপাদান হওয়ায় স্থায়িত্ব কালেরও এইরূপ বিভিন্নতা ঘটে। কোন সংস্কার আত্মায় না থাকিলে আত্মার জন্ম-মৃত্যুর কারণ থাকে না। নিদ্রাকালে আত্মার কিছুই থাকে না সুতরাং জন্ম মৃত্যুর কল্পনা কেবল জাগ্রৎ অবস্থায় কল্পনায় বা সংস্কারেই। এই সংস্কার আর আমার কর্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে কিছুই তফাৎ নাই! এজন্য আমাদের পূর্ব্ব সংস্কারানুরূপ দেহের দ্বারা যাহা বুঝি বা বুঝাই তাহা কেবল ঐ পূর্ব্ব সংস্কারের ফলই এবং পূর্ব্ব সংস্কারানুরূপ আমার দেহাদি সমস্ত। এ কারণেই দেহ আমার সংস্কারানুরূপ কর্ম্মই ঠিক বুঝে ও ভাল মনে করে। ঐ বুঝের উপর যতদিন অনাস্থা না জন্মে ততদিন সাধন সম্ভবপরই হয় না; কেবল সংস্কারানুরূপ কর্ম্মই প্রীতিকর মনে হয়। এজন্য বিরুদ্ধ সংস্কারাপন্ন ব্যক্তির সংসর্গ, সংস্কার বিরুদ্ধ চিন্তা অনুধ্যান, খাদ্য ও ক্রিয়াদি, তৎসঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান "জ্ঞান কেবলমাত্র একটা সংস্কারমাত্র

জ্ঞানের স্বরূপ অস্তিত্ব এরূপ নয়," এই বিচার থাকা সর্ব্বদা থাকা কর্ত্তব্য। আমাদের পুর্ব্ব সংস্কারানুরূপ রুচিকর কর্ম্মে রুচি থাকা পর্য্যন্ত সাধনা কিছুতেই সম্ভব নয় অর্থাৎ আত্মস্বরূপ লাভের প্রবৃত্তিই আসিতে পারে না। সঙ্গ ও চিন্তানুধ্যান ভেদে আত্মার ভেদ হইয়া গেলে পূর্ব্বের করণীয় কর্ম্ম অকরণীয় বলিয়া যেমন আর পুর্ব্ব কর্ম্মে স্পৃহা থাকে না সেইরূপ সংস্কার পরিবর্ত্তন না হইলে সংস্কারের বিপরীত বিষয়েও আসক্তি আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা কেবল কল্পনার সঙ্গে সুখের অন্বেষণ করিতেছি; কাজেই আত্মার সুখ কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না।

আমি পারি না এই জ্ঞানটা যতক্ষণ বর্ত্তমান ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার হতাশ হওয়ার কারণ নাই। যতটা পারা যায় বিরুদ্ধ সঙ্গ হইতে তফাৎ থাকাই ভাল।

[(৩৫)—যো]

এই সংসারে অনন্ত আকার ও অনন্ত প্রকার জ্ঞান ও প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোক দেখা যায়। এই প্রকার ভেদ যদি সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম বা আত্মার বিভিন্নতার হেতু হয়, তাহা হইলে এই প্রকার ভেদ স্বাভাবিক, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি বা দ্বিরুক্তি থাকিতে পারে না। অগ্নির উষ্ণত্ব, জলের শৈত্য সম্বন্ধে যেমন মানুষের রুচি বিরুদ্ধ হইলেও কোনও আপত্তি আসে না, তেমনি মানুষের জ্ঞান বিভিন্নতায় যে বিভিন্ন ব্যবহার তাহাতেও কোনও আপত্তি হইতে পারে না। আপত্তি করিলেও ভ্রমেই করে, যেহেতু আত্মা স্ব স্ব

প্রকৃতি অনুরূপ কর্ম্ম করিবেই। কোনও বস্তুই স্বীয় স্বাভাবিক গুণ পরিত্যাগ করিতে পারে না। আত্মাও ভিন্ন হইলে স্বীয় প্রকৃতি অনুরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না—বলিয়া এক আত্মা বা এক আমি অপর আত্মা বা অপর আমি অনুরূপ সংস্কারবিশিষ্ট হওয়াও অসম্ভব হইত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে হিন্দু সংস্কারাপন্ন ব্যক্তি মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইতেছে; শৈশবের সংস্কার যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে, শরীরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; মানুষ ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও কল্পনার পার্থক্যে পৃথক সংস্কারাপন্ন হইতেছে; শ্রবণ মননের ভেদেও ঠিক বেঠিকের ভেদ হইতেছে, ইহা দ্বারা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা ভিন্ন নয়, কেবল ইন্দ্রিয় সঙ্গ ও কল্পনামূলেই ভিন্ন হইতেছে। সুতরাং যত দিন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সংস্কার বর্ত্তমান তত দিন পর্য্যন্ত জ্ঞানগত ভেদ ও মুক্তি একটা কথার কথা।

এই যে ভাল-মন্দ ও ন্যায় অন্যায় লইয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মত ভেদ হইতেছে, মূলে ইহার কোনও মূল্য নাই। কল্পনার ধর্ম্ম বহু বই এক হইতে পারে না, যেহেতু কল্পনার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্বরূপ নাই। সঙ্গের ভেদে জ্ঞান ও কল্পনার ভেদ হইতেছে, সুতরাং কল্পনার ধর্ম্ম বহু হওয়াই স্বাভাবিক। সংস্কারের অপর পারে আর ভিন্নত্ব নাই, তথায় সংস্কারানুরূপ ভাল-মন্দও নাই; সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, ন্যায় অন্যায় ইহার কিছুই নাই। এই কল্পনা মানবদেহবিশিষ্ট জীবে 'অ-হ' যোগে; সেই 'অ-হ' এর অপর পারে কেবল গুরুই লইয়া যাইতে পারেন, আর কাহারও শক্তি নাই।

৯, ঋ, ই ঘাটেও প্রকার ভেদে 'অ-হ' বর্ত্তমান, যেহেতু 'উ'-কারের পরবর্ত্তী অবস্থাই 'ওমাত্মক' অবস্থা। 'উ'কারের ঘাটে 'ওম' স্বতঃই হয়, উহা কাহারও কৃত জিনিস নয়। ঋ, ৯, ই ঘাটে 'ওমাত্মক' অবস্থা হয় না।

আমি মোহবশেই তোমাকে ২।১ খানা এইরূপ চিঠি লিখি। আমি ধ্রুবই জানি মানবের জ্ঞান স্ব স্ব সংস্কারানুরূপ; সংস্কার বাদ দিলে জ্ঞান কোথায় খুঁজিয়াই পাই না। সুতরাং সংস্কারই যদি বর্ত্তমান জ্ঞানের কারণ হয়, তাহা হইলে সংস্কার ভেদে, জ্ঞানের ভেদ হইবে না কেন? আমার এই কথাগুলি "পুঁথিগত বিদ্যা" মত পাঠ না করিয়া একবার চিন্তা করিয়া দেখ, বুঝিবে যে তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় তুমি তোমার কতকগুলি সংস্কার সমষ্টিমাত্র। এই সংস্কার তোমা হইতে বাদ দিলে তোমার তুমিই আর থাকে না। আবার সংস্কার যেরূপ, তোমার তুমিও সেইরূপ। এই সংস্কার ভেদে জ্ঞানের ভেদ, ইহা অনিবার্য্য। এই সংস্কারবিশিষ্ট আত্মা, গুরুসংস্কারাপন্ন হইলে, তাহার 'অ-হ' জ্ঞানানুরূপ সংস্কার থাকা কি সম্ভব? 'অ-হ' সংস্কার দৃঢ় থাকিতে গুরু চিন্তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এখন বুঝিয়া দেখ তোমার সহিত আমার আত্মীয়তা কত! মানব স্বীয় সংস্কারানুরূপ ব্যবহার, আচরণ, কল্পনা, কথাবার্ত্তা ভালবাসে। তাই আমি তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা রাখার জন্যই তোমার সংস্কারানুরূপ আত্মীয় কুটুম্ব জুটাইতেছি। গুরু জ্ঞানের বিরুদ্ধ সংস্কারানুরূপ ব্যাপারে থাকিয়া তোমার সহিত আমার

কুটুম্বিতা আর কত দিন থাকিবে ভাবিয়া দেখিবে। আমি যদি গুরুকেই একমাত্র পরম বন্ধু বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় আমার কেমন বন্ধু চিন্তা করিবে।

[(৩৬)—প]

প্রকৃতি বা সংস্কারানুরূপ সঙ্গ বর্ত্তমান বা প্রত্যক্ষ অবস্থায়, প্রকৃতি ও সংস্কারের বিপরীত বিষয় চিন্তা অনুধ্যান অসম্ভব। দূরে থাকিয়া গুরুচিন্তা হইলেও আমার সঙ্গানুরূপ সঙ্গের দ্বারা জ্ঞানের যে আকার হয়, তদনুরূপই চিন্তা করিয়া থাকি। যে স্পন্দন বা কল্পনাই জগতের কারণ, সেই স্পন্দনের ভেদেই জ্ঞানের ভেদের কারণ ও জ্ঞানের ভেদানুরূপই আমার বুঝাবুঝি। সুতরাং সংস্কারানুরূপ বস্তু প্রত্যক্ষ অবস্থায় তদবস্থানুরূপই স্পন্দন ও জ্ঞানের আকার এবং সেই আকার দিয়াই তদ্বিপরীত স্পন্দনাত্মক বস্তু চিন্তা অনুধ্যান করা বা বুঝা যে কিরূপ বুঝা, তাহা বুঝান সঙ্কটের কথা। কারণ, স্পন্দনের ভেদেই যখন বুঝের ভেদ হয়, অথবা স্পন্দনানুরূপই যখন বুঝ, তখন যে স্পন্দনের অভাব থাকে, সেই স্পন্দনানুরূপ বুঝেরও অভাব থাকে। অথচ আমরা জ্ঞানের কি আকার দিয়া সর্ব্বাবস্থা বুঝি বলিয়া বুঝি—এই বুঝাবুঝি ভ্রান্তিবশেই হয়। অতএব সংসারাসক্ত সংসার সংস্কার-বিশিষ্ট ব্যক্তির সংসারে লিপ্ত থাকিয়া গুরু বুঝা কতদূর সম্ভবপর তাহা আমার জ্ঞানে বুঝে না। ইন্দ্রিয়যোগে স্পন্দন হইয়া বস্তুর জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয় যোগে যেরূপ জ্ঞান হয়, তদ্ভিন্ন তাহার অন্য স্বরূপ বা আকার নাই। ক্রমে কল্পনায় জ্ঞানের

আকার পরিবর্ত্তন হইয়া আর ইন্দ্রিয়ানুরূপ আকার দেখি না অথচ বুঝি যে সব বুঝি ও ঠিক বুঝি। ইহা কি ভ্রান্তির ফল নয়?

[(৩৭)—প]

আমরা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত বিষয় বুঝিতে চাই, বুঝাইতে চাই; আর বুঝি বলিয়া বুঝি, ইহা কেবল ভ্রমের গাঢ়ত্বের ফল অর্থাৎ ভ্রান্তিতে ভ্রান্তিটাকে ঠিক বুঝি। যদবস্থায় স্বরূপানুরূপ কোনও স্বরূপই আমাতে নাই, তদবস্থায়ই এক অবস্থা বা একরূপ স্পন্দনে অন্য অবস্থা বা অন্য স্পন্দনানুরূপ অবস্থা বুঝি বলিয়া বুঝি অর্থাৎ যাহা ভুল তাহাই ঠিক বলিয়া বুঝি। প্রত্যেক অবস্থাই আমরা প্রত্যেক অবস্থানুরূপ জ্ঞানের আকার দিয়া বা অবস্থা দিয়া বুঝি। যখন গাঢ় অন্ধকার থাকে তখন সেই আঁধার অনুরূপই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের কার্য্য হইতে থাকে, নিকটবর্ত্তী কোনও বস্তুই পরিষ্কার প্রত্যক্ষ হয় না। এই অবস্থায় আলোক বলিয়া একটা জ্ঞানও জ্ঞানে হয় অথচ আলোক অনুরূপ কোনও বস্তুই দৃষ্ট হয় না। এই অবস্থায় যে আলোক জ্ঞান, তাহা শুধু কল্পনার ফল ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে কিনা তাহা একবার বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবে। আঁধারে থাকিয়া আমরা যে আলো বুঝি তাহা যে কাল্পনিক, তাহা দ্বারা যে কিছুমাত্র দর্শনের কার্য্য হয় না, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আলোক বুঝিতেছি বলিয়া আমরা যে বুঝি, তাহা মোহের ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবে।

এই প্রকারে আমাদের যে স্পন্দনাত্মক অবস্থা বা ভ্রান্তিতে এই স্থূল দেহ ; সেই দেহ লওয়ার পর ক্রমে ভ্রান্তিতে যে সমস্ত কল্পনা বা স্পন্দন আসিয়া অন্য অবস্থাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তৎস্পন্দন মূলক জ্ঞানে, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক স্পন্দনাত্মকরূপ জ্ঞান হওয়া বা যে স্পন্দন মূলে ইন্দ্রিয় তদ্রূপ কোনও জ্ঞান হওয়া একেবারে সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট দেহ লইয়া ইন্দ্রিয়ে যেরূপ জ্ঞান জন্মায় তদ্রূপই তৎস্পন্দনাত্মক অবস্থায় স্বরূপ বা ঠিক। ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহে ইন্দ্রিয় স্পন্দনাত্মক অবস্থায় ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি অষ্ট পাশের কোনও পাশই নাই, কেবল আমার কল্পনার ফলেই এই অষ্ট পাশের উৎপত্তি। অথচ ইন্দ্রিয়ের স্পন্দনানুরূপ জ্ঞানের একটা আকার ছিল, আজও আছে ; বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল কল্পনার আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। বিষয়যোগে দেহের স্পন্দন জন্মিলে সেই স্পন্দনানুরূপই বুঝি, কল্পনার বুঝ্‌টা আর তৎকালে বর্ত্তমান থাকে না। 'রসগোল্লা খাওয়া অন্যায়' এই কল্পনায় রসগোল্লা জিহ্বায় পড়িলে সেই বস্তু অনুরূপ স্বাদই পাওয়া যায়, পূর্ব্বের অন্যায় কল্পনা উড়িয়া যায়। আবার ব্যাধি আদি দ্বারা জিহ্বার স্পন্দনের ভেদ হইলে অতি সুমিষ্ট বলিয়া কিছু মুখে দিলেও আর ভাল লাগে না। তাহা হইলে এই ভাল মন্দের কল্পনা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের স্পন্দনানুরূপ অনুভূতির কোনই ভেদ হয় না। এই অবস্থায় দেহের বিপরীত ভাল-মন্দ কল্পনায়, দেহের ক্রিয়ার যে পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা বুঝিয়াও সেই ভাল-মন্দ যে শুধু কল্পনার ফল তাহা বুঝিতে মানব অক্ষম। অথচ সেই দেহের ক্রিয়ার স্পন্দনানুরূপ কোনও সংস্কার বা অবস্থা স্থায়ী থাকিয়া জ্ঞানের আকারকে তৎ স্পন্দনানুরূপ স্থির বা স্থায়ী রাখিতে পারে না ; কেবল

কল্পনানুরূপ সংস্কারই স্মৃতিতে বদ্ধ থাকিয়া সেই ভাল-মন্দ লইয়া ভাল-মন্দ অনুরূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থার একটা নূতন আকার করিয়া আপনার কৃত কল্পনার ফলে আপনি অষ্ট পাশ বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পরিষ্কারই দেখিতে পাই, যে স্পন্দনে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট এই দেহ, সেই দেহের স্পন্দনের ধর্ম্মে যাহা ত্যাজ্য ও গ্রহণীয় বলিয়া ত্যাগ ও গ্রহণ করে, তাহা কোনও কল্পনার ফলেই জীব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অগ্নি স্পর্শ স্পর্শেন্দ্রিয়ই ইচ্ছা করে না; বিকট রূপ চক্ষু দেখিতে ইচ্ছা করে না; কর্কশ শব্দ কর্ণে শ্রবণমাত্রই জ্বালা হয়, উৎকট গন্ধ আঘ্রাণে স্পৃহা থাকে না; বিরস দ্রব্য জিহ্বা সুখকর মনে করে না। অভ্যাস বশে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার বা স্পন্দনের পরিবর্ত্তন হইয়া যে বিপরীত বিষয় ভাল বোধ করি, ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে অভ্যাসের পুর্ব্বে যে স্পন্দনাত্মক বা যেরূপ স্পন্দনবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি ছিল, সে অবস্থা আর নাই। স্পন্দনের পরিবর্ত্তন হইয়াই বর্ত্তমানে এইরূপ ঠিক বা স্বরূপ বুঝি। পাশ বিমুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ কল্পনার পুর্ব্বে, স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যে স্পন্দনাত্মক অবস্থা বর্ত্তমান ছিল, কল্পনার ভাল-মন্দ আসিয়া ক্রমে স্পন্দনের ভেদে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ভেদ হইয়া, যে অবস্থায় বর্ত্তমানে অবস্থিত হইয়াছে, তদবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে যে ব্যক্তি অক্ষম, সে সাধনায় স্পন্দনাতীত অবস্থায় যাওয়ার জন্য সাহস, কোন্ সাহসে করে? ইহা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই ভাল-মন্দ, ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট মানব জাতির মধ্যে প্রকার ভেদে, বহু প্রকার এবং প্রত্যেকেই স্বকীয় প্রকার অনুরূপ ঠিক বুঝে।

কল্পনার ভেদে স্পন্দনের ভেদ করিয়া, যাহার জ্ঞানের আকার যেরূপ, তাহার পক্ষে তাহাই ঠিক বা স্বরূপ। কেহই স্ব স্ব জ্ঞান দিয়া

৬

স্বরূপকে বেঠিক বুঝে না এবং বিরূপকে স্বরূপ বুঝে না। এই হেতুই একে অপরের বুঝ্‌কে ভুল বুঝে। অপর দিকে দেখিলে দেখি, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বিশিষ্ট মানব কল্পনা বাদ দিলে একরূপই বুঝে; তখন ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, জাতি, কুল, শীল ইহার কিছুই থাকে না। অষ্ট পাশ যে স্বীয় কল্পনার ফল, তাহাই যাহার বুঝে বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারে অথচ বুঝে না, এমন মোহান্ধের জন্য কোনও উপায় বা বিধি নাই! কেবল একমাত্র বিধি এই—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে গুরুর স্থূল শরীরটা বুঝা। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সংস্কারবিহীন গুরুর এই দেহ-ভিন্ন আর কোনও উপায় হইতেই পারে না। অথবা নিজের এই গাঢ় ভ্রমাত্মক বুঝে অনাস্থা, অথবা যে বুঝ্‌ ঠিক বুঝিয়াও ঠিক থাকিতে পারে না এবং যে বুঝে এবম্বিধ ভ্রমাত্মক অবস্থাজনিত স্পন্দন দৃঢ় হইয়া গিয়াছে, সেই বুঝ্‌ নিয়া বুঝের বিপরীত বিষয়ে আস্থা, যে কোনও প্রকারে না আনিতে পারিলে আর উপায় নাই। এমত অবস্থায় দীর্ঘকাল গুরু সঙ্গ ও বিচার দ্বারা আত্ম বুঝে অনাস্থা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এখন তোমার যাহা অভিরুচি তাহা বিচার করিয়া ঠিক কর।

[(৩৮)—প]

আমি যত দূর যাহা বুঝি, তাহাতে কল্পনানুরূপ সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া গুরু সঙ্গ না করিতে পারিলে জীবের কোনও উপায় নাই। তোমাদের বুঝের কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, অথচ কল্পনানুরূপ একটা আকার বুঝ। ঐ আকারের সঙ্গে বিষয়ের, ইন্দ্রিয় সঙ্গ

হইয়া যে আকার হয়, তাহার কোনও সম্বন্ধই নাই। যথা চিনি বা গুড় জিহ্বার সঙ্গে যোগ হইয়া যে অবস্থা বা স্পন্দনে যে অনুভূতি হয়, মিষ্টি এই শব্দের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। আবার মিষ্টি এই শব্দানুরূপ স্পন্দনানুভূতির সঙ্গে, মিষ্টি অনুরূপ কল্পনায় বুঝের যে আকার হয়, তাহার সঙ্গেও কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং কি যে বুঝি, বুঝাইতে গেলে সে বুঝের স্বরূপ খুঁজিয়া পাই না। তবে কল্পনা যখন যেরূপ করি তখনই সেই কল্পনানুরূপ একটা স্বরূপ বুঝি। যেমন লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি মূলে কল্পনানুরূপ একটা আকার জ্ঞানে জ্ঞান হয়, আবার কল্পনার পরিবর্ত্তন হইয়া সেই আকার কোথায় চলিয়া যায়! ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীলোককে দেখিয়া ইউরোপিয়ানদিগের হাসি পায়, আবার আমরা ঐ অবস্থাকেই স্বরূপ বা ঠিক মনে করি। কলা গাছে যখন ভূত দেখি, তখন কলা গাছ অনুরূপ কলা গাছের স্বরূপ রূপ থাকে, না, কল্পনানুরূপ ভূতের রূপ হয়। আমাদের বর্ত্তমান বুঝে ইন্দ্রিয়ের স্পন্দনানুরূপ কোনও কিছুই নাই। বিভিন্ন জাতি কোনও এক বিষয়কেই বিভিন্ন কল্পনা হেতু বিভিন্ন রকম দেখিতেছে। এই হেতু মানবের জ্ঞানের রূপের বা আকারের একটা স্বরূপ নাই ও তাহার জন্য বিরূপ অবস্থাকেই স্বরূপ বুঝিয়া মানুষ এই বিরূপেতেই রহিয়াছে।

[(৩৯)—ন, সু]

গত কল্য কোন চিঠি পাই নাই; এইরূপ যদি চিঠি-পত্র না থাকে, তবে পরম আহ্লাদিত হই। তাহা হইলে চিঠি পত্র লিখার দরকার থাকে না, স্বপ্রকৃতি অনুসারে স্বীয় অভীষ্ট

ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি। জন্ম-সংস্কার ও আশৈশব ব্যবহারানুরূপ বর্ত্তমান সংস্কার লইয়া আমাদের স্বভাব গঠিত হয়; এই স্বভাবের বিপরীত ব্যবহার ও সত্য মিথ্যার জ্ঞান যে আমরা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে ঠিক বুঝি, তাহার কারণ আমাদের বুঝে একটা বুঝা চাই। বুঝের ধর্ম্মই বুঝা, না বুঝিয়া সে নীরব থাকিতে পারে না। যখনই মানবের যে প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তৎকালে তদ্‌বিপরীত প্রবৃত্তি অভাব হয় ও অতি সূক্ষ্ম রূপে অবস্থান করে। বুঝ্‌ প্রবল প্রবৃত্তির অনুরূপই বুঝে এবং সেই বুঝাই ঠিক বুঝা। প্রবৃত্তির বিপরীত বিষয় যে বুঝে, তাহা বুঝের ধর্ম্ম একটা বুঝা, না বুঝিয়া নীরব হয় না, এই জন্যই বুঝের বুঝায় বুঝে। অর্থাৎ আমাদের লোভ বা কাম প্রবল হইলে, যেমন আমরা ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞান রহিত হইয়া যাই, অথচ সেই বুঝেই আবার আমরা ন্যায়-অন্যায় বুঝি। এবম্বিধ বুঝে সর্ব্বদাই অন্যায়, ন্যায়রূপে ও ন্যায়, অন্যায় রূপে পরিণত হয়। সেই ন্যায় অন্যায় আমার মত এবং আমি আমার মত বুঝ্‌ দিয়াই ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ঠিক করি। তখন অন্যের বুঝ্‌ মত কিছুতেই বুঝি না। আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যাখ্যা করি ও বুঝাই; সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে তাহা বুঝে। এইজন্যই ঋষিদের বাক্যের বহু অর্থ ও বহু ব্যাখ্যা হইতেছে।

প্রকৃত পক্ষে ধৈর্য্য, শম, দম, তিতিক্ষা ইত্যাদি গুণগুলি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বৃত্তিগুলির উদ্রেকে মৃদু বা অভাব হয়; ঐ বৃত্তিগুলির প্রবল অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত গুণগুলির গুণের

বর্ণনা শ্রবণে উহাদিগকে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ ধারণা করা হইয়া থাকে। তদবস্থায় তাহাদের স্বরূপ অবস্থা অনুরূপ ধারণা ও ব্যাখ্যা অসম্ভব। এই হেতু আমি আর ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে নীরব থাকা উচিত মনে করি।

কোন স্থলেই নিজের অভীষ্টানুরূপ ব্যবহার ভিন্ন কেহ ইষ্ট মনে করে না বরং অপ্রীতিকরই মনে করে। এ অবস্থায় অপ্রীতি জন্মাইয়া পরে সকলের অপ্রিয় হওয়া অপেক্ষা নীরব থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সঙ্গ বলিয়া যে শাস্ত্রকারেরা বারংবার চীৎকার করিয়া গিয়াছেন সে সঙ্গও বর্ত্তমান কালে অসম্ভব, কেন না আমার প্রকৃতি অনুরূপ যে সঙ্গ-টুকু পাই সেইটুকুই গ্রহণ করিতে আমি সক্ষম, তদ্ভিন্ন প্রকৃতির বিপরীত ব্যবহার পরিত্যাগ করি, না হয় স্ব-প্রকৃতি অনুরূপ তাহার ধারণা করি। এ অবস্থায় সঙ্গের দ্বারাও কিছু হওয়ার আশা নাই। তবে বিপরীত কার্য্যে নিয়োগ করিয়া তদ্‌বিপরীত ভাব প্রত্যাশা অন্যায়, একথা অনেকেই বলিয়া থাকে শুনি। আমি জানি এ জগতের যাবতীয় ব্যাপারে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ অবস্থা বিদ্যমান, প্রত্যেক ব্যাপারে খুঁজিলে তাঁহার প্রকাশ প্রকাশ পায়। কেবল ভাবের বিপরীতে বিপরীত দেখায়।

প্রকৃত পক্ষে গুরুর আদেশে আদিষ্ট হইয়া আমি যাহা করি, তাহাতেই আমার অহং জ্ঞানের খর্ব্ব হয়। আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান অভাব হইলে সেই স্ব-প্রকাশ। ধ্যান পরায়ণ

হইয়া গুরুর আদেশে এম্-এর পাঠ্য পড়িলে তাহাতে গুরু লাভ হয় না। যে স্থলে আমার আমিত্ব প্রবল ও আমির ইচ্ছা অনিচ্ছা রাতদিন যেখানে প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেইখানেই একে আর হয় —এম-এ, পড়াটা প্রতিবন্ধক বোধ হয়। এখন আমার প্রাণে এক ত্রাস আসিয়া পড়িয়াছে, কোন্ কথায় তোমাদের অপ্রিয় হই। একটু নিবিষ্ট মনে যখন চিন্তা করি তখন দেখি আমি মোহেতে ডুবিয়া গিয়াছি; তোমাদের যে প্রিয়া-প্রিয় তালাস করি, সে-ও কেবল আসক্তি বশে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা যে অপরের উপর দোষারোপ করি সেটা মূলেই ভুল; আমার আসক্তি বশেই যত ইতি সকল ঘটে। আসক্তি প্রবল হইলে ইচ্ছাও প্রবল হয়। সকলে আমার মত চলুক, আমার মত বলুক, ও আমাকে আমার আমার করুক ইচ্ছা হয়।

মনে হয় অমুকের আসক্তি না থাকিলে, আমার আর কোন আসক্তি থাকিবে না। প্রকৃত পক্ষে এটাও আসক্তি বশে বুঝি, আসক্তি বর্ত্তমান থাকিলে অন্য বস্তুতে যে আসক্ত হইব না, তাহার বিশ্বাস কি? আসক্তি আসক্তির ধর্ম্ম কিছুতেই ত্যাগ করে না, পদার্থ হইতে পদার্থান্তর গ্রহণ করে। ব্যক্তি বিশেষের পাঁচ পুত্র থাকিলে, আসক্তির পাত্রটির অভাব হইলেও, অন্যগুলিতে আসক্ত হইয়া সে সংসার করে। তবে কি আমার আর উপায় নাই? আমি একটু নিজের চিন্তা নিজে করিতে গেলেও তোমরা বিরক্ত; আসক্তি বশে বিরক্তির কারণ না হই, এজন্য আবার চিঠি-পত্র না লিখিয়া উপায় নাই। তাহার দৃষ্টান্ত তোমাদের কাছেই বর্ত্তমান; —চিঠি পত্র লিখা নিষেধ করা সত্ত্বেও চিঠি পত্র লিখিতে ত্রুটি কই?

আমি বেশী আদরের এই সোহাগ বাড়াইতে গিয়া ফল হইল আমি কেহই নাই। "থাকুক আমার তেল, বাপের কালের আলি গেল।" যাউক, আমি যা আছি, তা-ই থাকিতে পারিলেই বাঁচি। তোমরা বন্ধের সময় দয়া করিয়া আসিলেই যথেষ্ট মনে করিব।

[(৪০)—ন, স্থ]

সংসারে সকলেরই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী নিজের একটা মত থাকে; সেই অনুসারে আমারও আমার মত আছে। আমি আমার মত; আমার অবয়ব, আকার, প্রকার, জাতি, কুল, শীল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ভাল-মন্দ বিচার, লোভ, কামাদি বৃত্তি, সুবিধা-অসুবিধা, খাওয়া-পরা, বাস-স্থান—সকলই আমার মত। আমার বিচার, তর্ক, সিদ্ধান্তও আমার মত। বল দেখি আমার কোন্‌টা আমার মত নয়? আমার সকলই আমার মত, আমার আমি এই জগতের কোন বস্তুরই মত নয়। আবার কোন বস্তুও আমার মত নয়, সকল বস্তু বা সকল প্রাণীই স্ব স্ব মত। এক পদার্থ অন্য পদার্থের মত এ জগতে কিছুই দেখা যায় না। এই জন্যই স্ব স্ব মতানুসারে সকলের বুঝ্, এবং সেই স্ব স্ব মতানুরূপ বুঝ্ দিয়াই জগতের সকল বুঝে।

কিন্তু প্রাণীবর্গের মধ্যে সকলেরই উদর উপস্থানুরূপ একটা বুঝ্ আছে। এই বেলা ঐ দুইটা যন্ত্রের বুঝ্ রহিত কোন প্রাণী দেখা যায় না। তদ্‌ভিন্ন অন্য বুঝে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত পৃথক ও ভিন্ন। মানুষের মধ্যে যে ঐক্য ও সাদৃশ্য দেখা, তাহা

কেবল কথঞ্চিৎ ঐ দুইটা বৃত্তি বিষয়ে, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যাপারে প্রত্যেক আমি তাহার আমির মত। বিশেষ, যে সকল ব্যাপার, আমি আমার জ্ঞানের নিদানভূত কারণ, ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার জ্ঞানে বিষয় করে না, সে বিষয় আমার মত ভিন্ন বুঝে বুঝিতে চায় না। কেননা, আমি আমার মত বাদ দিলে আমাকেই বাদ দিতে হয়; সে স্থলে আমাকে বাদ দিতে আমি কিছুতেই রাজী না। আর বাদ দিলেও সে বাদ দেওয়ার মধ্যে আমার মত বাদ দিব, অপরের বুঝে গেলেও আমার মত যাইব ও বুঝিব। কোন স্থলে সম্পূর্ণরূপে আমাকে বাদ দিয়া অপরের মত আমি হইতে পারি না।

আমার আমিত্বের কারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞান বর্ত্তমানে; এস্থলে তর্ক-বিচার, সিদ্ধান্ত, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন যাহা কিছু করি, সমস্তেই আমার মত বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেখি, শুনি, চলি, বলি, বুঝি; সুতরাং আমার মত থাকিবেই। দেখা-শুনা, চলা-বসা, সমস্তই আমার। আমি বাদ দিয়া আমার এ সমস্ত কিছু থাকে না; সুতরাং আমার মত আমি কিছুতে ত্যাগ করিতে পারি না; আবার আমার মত বুঝে আমার মতই বুঝাইতে চায় ও বুঝিতে চায়। ইহাও আমার মতে আমার মত একটা জ্ঞান। এইজন্য অনন্যোপায় হইয়া মহর্ষি শতানন্দকে পিপ্পলাদৌ মুনি আমার মত ত্যাগের এক প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াছেন :—দ্বিদলে ভ্রূমধ্যে মনোনিবেশ করিয়া 'গুরু-গুরু' চিন্তা করিলে আমার মত ত্যাগ হইবে। কারণ, আমি জ্ঞানটা ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্ভূত এবং অন্যকে অপেক্ষা করিয়া আমি বুঝি।

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি করিলে ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাব হয় ও অপেক্ষার বিষয় কিছু থাকে না; কারণ ওখানে লক্ষ্য রাখিলে, দ্বিতীয় কিছুই বোধ থাকে না। বিশেষ গুরু শব্দের 'উ'-র ঘাটে গিয়া দ্বিতীয় জ্ঞান রহিত হইয়া, আমি জ্ঞানও রহিত হয়। তদবস্থায় জগতের অপর কিছু করা সম্ভব থাকে না! অতএব তোমাদের এম্-এ পাশ না করা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ে প্রকৃত উপায় অনুসরণ করা অসম্ভব; এই হেতু আমি ধর্ম্মোপদেশ কি ধর্ম্মালাপ সঙ্গত বোধ করি না। যেহেতু আমার মত আমি যাহা শুনি তাহাই বুঝিব; ধর্ম্মোপদেশও আমার মত গ্রহণ করিব। এই হেতু ঋষি বাক্যের নানা অর্থ ও নানা ব্যাখ্যা হইতেছে। স্বরূপ ব্যাখ্যা অভাবে অন্য ব্যাখ্যা জগতের মহা অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে।

তোমরা তোমাদের মত বুঝ, আমি আমার মত বুঝি। এই বুঝা-বুঝির ব্যাপারে বুঝের বিকার জন্মিয়া একটা বিকারাত্মক বুঝ্ স্থির ধারণা করিলে, পরে সেই সংস্কার মূলে একে আর হইবে। এইজন্যই ... ... বাবু লিখিয়াছেন, গুরুর বিন্দুমাত্র দয়া নাই, দয়া থাকিলে একটা উপায় হইত। গুরুর দয়াও আমি আমার মত বুঝি; আমার মত বুঝে নিবৃত্তির কথাই নির্দ্দয়তা; সুতরাং আর নির্দ্দয়তা প্রমাণ হওয়ার আবশ্যক নাই। যে অবস্থায়, যাহা যে প্রকার বুঝাইলে, অপার দয়া বুঝা যায় তাহা বুঝিবার সময় আসিলেই বুঝান উচিত। তত কাল বুঝানের চেয়ে নীরব থাকাই মঙ্গলজনক।

[(৪১)—জ]

সকলেই নিজের বুঝ্ মত বুঝে ; ব্রহ্ম নিজের বুঝের বাহিরে কি প্রকারে বুঝে সম্ভব হয় ? ব্রহ্ম বুঝের বাহিরে বলিলে বুঝে কি তাহা স্বীকার করিবে ? স্বীকার করা দূরে থাকুক, ভুলই বুঝিবে। আমার বুঝানুরূপ না হইলেই বা তাহার উপাসনা কেন করিব ? আমার সকলই আমার মত ; ব্রহ্ম কি আমার বুঝ্ ছাড়া আমার বুঝে বুঝিতে পারে ? সুতরাং বুঝ্ বাদ দিয়া উপাসনা করিতে গেলে, সকলেই বেবুঝ বলিবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আবার সাম্প্রদায়িকতা ভুল বলি ; কিন্তু নিজ নিজ বুঝ্ অনুসারে বুঝিতে গেলেই যে সম্প্রদায় হইরা উঠে তাহা বুঝি কৈ ? সম্প্রদায়টা যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন বুঝের মূলে সৃষ্টি হয়, তাহাই বা বুঝে বুঝিতে দেয় কৈ ? আমার মত থাকিতে আমি অভাব হওয়া কি সম্ভব ? এক মত হইতে হইলে যে মতামত ত্যাগ করিতে হয়, তাহা মতে বুঝে কে ?

[(৪২)—ন, স্থ]

গত সোমবার তোমাদের উভয়ের চিঠি পাইলাম। তোমাদের উভয়ের পত্রে বুঝিলাম যে গুরু বুঝিয়া আমাকে বুঝাইবা ! গুরু বুঝার পরেও বুঝ্ থাকে ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না ; এবং তোমরা সেই বুঝের অতীত বুঝে গিয়া আমাকে চিঠি-পত্র দ্বারা জানাইবা, ইহা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। গুরু বুঝিলে কে কারে বুঝায় ? তথায় আর

গুরু-শিষ্য ভেদ কোথায়? বুঝাবুঝিই বা কোথায়? আমি সর্ব্বোপনিষদ্ ও যোগসূত্রে ও বেদ বেদান্তের উপদেশে—কোথাও পাই নাই যে, বুঝ্ থাকিতে গুরু বুঝা যায়। আবার বুঝাবুঝির বুদ্ধিতে গুরু হইতে গুরুতর কোন পদার্থ থাকিলে গুরুতে লঘু জ্ঞান আসিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাই জানিতে চাহিয়াছিলাম এই মোহময় বুদ্ধিতেও গুরুকেই গুরু বুঝ কি না?

যাহা হউক, 'বিশাকার' গুরুতর চিন্তা আসিয়াছে যে, মোহবশেই সে বুঝে যে, তাহার গুরুই ভরসা এবং সেজন্য বড় অনুতাপ ও আক্ষেপ করিয়াছে। মোহ অভাবে কে কবে গুরু বুঝিয়াছে? মোহ না থাকিলেই বা গুরু কোথায়? গুরুর আবশ্যকতাই বা কি? গুরু শিষ্য এই পৃথকত্বই বা কই?

আমাকে হাবা পাইয়া একথা ওকথা সাত কথা পাঁচ কথা দিয়া কোন রকম সংসার করান—এই উদ্দেশ্য ভিন্ন ঐ চিঠির মর্ম্ম আমি আর কিছুই বুঝি নাই। আমার পরিষ্কার জিজ্ঞাস্য ছিল বর্ত্তমান জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কি এবং প্রাণ কি চায়? ভাল, একটা জিজ্ঞাস্য আসিল, এই সংসারে যে লোক স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা ইত্যাদি বুঝে তাহা কি মোহ বিমুক্ত হইয়া বুঝে, না মোহ বুদ্ধি দ্বারাই বুঝে? সেই মোহ বুদ্ধির বুঝার মধ্যে পদার্থ বিশেষে বুঝার ন্যূনাধিক্য ও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেই মোহ বুদ্ধি দিয়া গুরুকে গুরু না লঘু বুঝ, ইহাই আমার প্রশ্ন ছিল;

নগেনবাবু কত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন; দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা গুরুর উপরই সম্পূর্ণ অর্শিল, অন্য কোন

স্থলে নয়। আমি চিরকালই বোঝা ঘাড়ে বহন করিয়া গেলাম, আর মনে করিলাম এ আমার আছে, ও আমার আছে। এই আমার আমারটা লোকে সংসারাসক্তিতে করিয়া থাকে। তাই পরিষ্কার জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, আমাকে কেহ আমার মনে করে বলিয়াই আমি আমার আমার করি, না সংসারাসক্তিতে আসক্ত হইয়া, আমাকে আমার বলুক বা না-ই বলুক, আমার আমার করি! নগেনকার উত্তরটা যেন সেয়ানা লোকের উত্তর বলিয়া বোধ হইল; বিশাকার উত্তরটা যেন হাবা ছেলেপিলের ন্যায় পূর্ব্বাপর বিবেচনা শূন্য আট্‌কা জায়গায় একথা সেকথা বকাবকি।

কিন্তু, তুমি যে আমাকে দিশাহারা মনে করিয়াছ, আমিও সেয়ানা কম নই। তুমি লিখিয়াছ "আমি সর্ব্বদা সর্ব্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও আমার গুরু আছে এই ধারণা ও বিশ্বাস মোহ মূলে ছিল," আমার চিঠি পাইয়া মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। যার সর্ব্বদাই গুরু আছে এই নির্ভর আছে, সেটা কি তা'র মোহ না মোহাতীত অবস্থা? তোমার ঐ কথাটা বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়, ভগবান্ আছেন, ভগবান্ করেন, এই বিশ্বাসকে যেমন অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া থাকে, সেইরূপ হইল।

যাহা হউক তোমাদের উভয়ের চিঠি পাইয়া আমারই প্রকৃত চৈতন্য লাভ হইল; কারণ, যাহাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও ভুলিতে পারি না, তারা নাকি ক্ষণিক সাময়িক উত্তেজনায় মোহ বশে আমাকে আমার বুঝে! তাহা হইলে তোমাদিগকে যে আমি আমার বুঝি, সেটা তোমাদের মোহ না আমার মোহ? আমি মোহে

পড়িয়া যে আমার, তাঁহা হইতে অনেক দূরে যে পড়িয়াছি—উভয়ের চিঠিতে এই স্মৃতি আমার জাগাইয়া দিয়াছে; আবার এমনই মোহ, পরক্ষণেই বিশু 'আমার' আসিয়া পড়ে। তবু যদি বিশুর এ মোহ থাকে যে, গুরুকে সে মোহ বশে তাহার ভাবে তাহা হইলে শক্ত অনুপায়। এই পত্রের উত্তরেও যদি গুরু আমার, এটা সে মোহ বশে বুঝে, তাহা হইলে এই মোহ দূর হওয়া শক্ত ও মোহ বিনাশের ঔষধ দূরে সরিয়া পড়িবে।

নগেনকাও সোজাসুজি উত্তরটা বলিলে ভাল হইবে। মোহ-জ্ঞান নিয়াই প্রাণ কারে চায়? মোহ দূর হইয়া গুরু বুঝিলে গুরুর জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই ও বলিবারও কিছু নাই। বলাবলি, বুঝাবুঝি সমস্তই মোহ বশে। মোহ মুক্ত হইলেই জগতে এক ও একেরই অনন্ত খেলা স্বপ্নবৎ বোধ হইবে।

গুরু যে সর্ব্বদাই আমার মতের অনুকূলে চলেন এটা ভ্রম; আমার অনুকূলে চিরকাল চলিলে, আমি আমার মতই থাকিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। গুরুর কার্য্য বিচার না করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই ভাল। ইহা অপেক্ষা তোমাদের এই উত্তর করাই উচিত ছিল যে, 'তোমাকে কেমন বুঝি তাহা তুমিই বুঝ, আমার বুঝে আমি কি বুঝি তাহা আমি বুঝিতে পারি না'। আজ আর তোমাদের কোন হিতোপদেশের বাক্য আসিল না; তাহার কারণ তোমরা। এখন অন্য জিনিস হইতে মোহ বুদ্ধিতেও আমাকে বেশী ভাল না বাসিলে আমি ভালবাসি না।

[(৪৩)—জ]

যে প্রকারভেদ জ্ঞানে প্রকারভেদ অনুভব ও বোধ, সেই প্রকার ভেদের প্রকার বিশেষে বিশেষ জ্ঞান ; সুতরাং ভেদ বুদ্ধি বর্ত্তমানে অভেদ চিন্তা বা বুঝা কল্পনামাত্র। আমরা কোন সময়েই স্বরূপ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কল্পনায় স্থির থাকিতে পারি না ; এই হেতুই যুক্তি-তর্কে বা বিজ্ঞানবিদের বৈজ্ঞানিক প্রমাণে জগৎ এক বুঝিলেও, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ভেদ-বুদ্ধিতে ভেদানুরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব হইলে, এক বুঝা ভুল হইয়া যায় ও বিভিন্ন বোধানুরূপ কার্য্য হইতে থাকে এবং তদনুসারে দেহের ক্রিয়ার ইতর বিশেষ হইয়া, দেহাত্মক বুদ্ধিতে দেহানুরূপ ক্রিয়াতে মানুষকে চালায়। কি আশ্চর্য্য ! প্রতিনিয়তই বুঝ. ঠিক নয়, বুঝেই বুঝায়, কারণ জগতের যাবতীয় ব্যাপার প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তন হইয়া কোন অবস্থাই স্থির নয় বুঝি, অথচ ব্যবহারে স্থিরানুরূপ ধারণা করিয়া ব্যবহার করি। এই যে প্রত্যক্ষ ভ্রান্তিতে সত্য জ্ঞান, সে কেবল বস্তুর বা দৃশ্যমান জগতের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—এই তিনটা নিয়া চিন্তা না করাতেই—অর্থাৎ কেবল বর্ত্তমান নিয়া চিন্তা করাতেই, এ-ভ্রান্তি ঘটে। এজন্য মহর্ষি বিভাণ্ডক স্বীয় সূত্রে তত্ত্বদর্শী বা মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের জন্য বারংবারই বলিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত প্রত্যক্ষ ব্যাপারের অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নিয়া চিন্তা করা

অত্যাবশ্যক। কেবল বর্ত্তমান নিয়া চিন্তা করিলে ভ্রান্তি অপরিহার্য্য।

যে বুঝা নিয়া বা বুঝ্ নিয়া গোলমাল করিতেছি, তাহা সমস্তই বর্ত্তমান জ্ঞান নিয়া কালের বিচার করিয়া বুঝিলে পরস্পরের বুঝের মধ্যে এবম্বিধ অনৈক্য অসম্ভব। বর্ত্তমান জ্ঞান আবার ব্যক্তিগত পার্থক্যে যত পৃথক হয় অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়া চিন্তা করিলে, তত পার্থক্য হওয়া অসম্ভব। আসক্তি বর্ত্তমান জ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; আবার আসক্তি মূলেই জ্ঞান ও প্রকার ভেদের বিশেষ পার্থক্য হয়। সুতরাং বর্ত্তমান জ্ঞান বা বুঝ্ নিয়া কাজ না করা মুমুক্ষুদের পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ, ইহা বিভাণ্ডক, গৌতম ও পরাশর মুনি প্রভৃতি ঋষিদিগের অভিপ্রায়। আমাদের ঋষিবাক্য বুঝিতে হইলেই, ঋষিদের প্রকৃষ্ট পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। উপদেষ্টার উপদেশানুসারে কার্য্য না করিয়া, নিজ অভিমত অনুসারে চলিলে, কোন রূপেই উপদেশ কার্য্যকরী হয় না।

জ্যামিতির problem করিতে গিয়া, স্বীকার্য্য, স্বতঃসিদ্ধ, ও সংজ্ঞা বাদ দিয়া যেমন উহা কিছুতেই করা যায় না, সেইরূপ ঋষি বাক্য বুঝিতেও তাঁহাদের উপদেশানুরূপ আচরণ, ব্যবহার ও অনুধ্যান না করিয়া তাঁহাদের বাক্য বুঝা যায় না। এক পক্ষে ব্যবহারের বিরুদ্ধ জ্ঞান অসম্ভব। আমাদের ভ্রান্তি হেতু পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের বুঝগত পার্থক্য বর্ত্তমান; কিন্তু অভ্রান্ত পুরুষদিগের

বুঝ্ সকলেরই এক। তবে যে আমরা স্বকীয় বুঝ্ নিয়া ভাষার তফাতে পৃথক বুঝি, সেও ভাষাটা ব্যক্তি বিশেষের কল্পনার জিনিস বলিয়াই আমাদের কল্পনায়ই ঠিক জ্ঞান থাকা হেতু পৃথক বুঝি।

মানুষ যে নিজ মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিয়া স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে পৃথক পৃথক ভাবে পৃথক পৃথক কার্য্যে ধাবিত হইতেছে এবং পৃথক পৃথক ভাবে সুখ-দুঃখ অনুভব করিতেছে এবং প্রত্যেকের সুখের বিষয় পৃথক বলিয়া বুঝিতেছে তাহার কারণ স্ব স্ব কল্পনা। সেই কল্পনা বা বুঝ্ অনুসারে দেহেতে পৃথক ক্রিয়া হইয়া তদনুসারে পৃথক ধারণাও আসিয়া সুখ দুঃখের পৃথকত্ব জন্মাইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের যখন স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মে তখন সুখের পৃথক বিষয় থাকে না, সকলেরই সুখের বিষয় এক হয়। বিশেষ, যেস্থলে এক জাতীয় প্রাণীর সুখের বিষয় বিভিন্ন দেখা যায়, সেস্থলে ভ্রান্তি বই আর কি বলিব? আবার ইহাও দেখিতে পাই যে, এক ব্যক্তিই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় সুখের মনে করে, সুখের বিষয় এক থাকে না। তখন ক্রিয়া বৈষম্য বা বুঝের পার্থক্য ভিন্ন আর কি বুঝিব?

যে বুঝ্ নিজের পক্ষেই নিজের জ্ঞানে ঠিক্ নয়, সে বুঝ্ অপরকে ঠিক বুঝান বাতুলতা মাত্র। এজন্য বর্ত্তমানে আর্য্য ঋষিরা বর্ত্তমান থাকিলে পাশ্চাত্য দর্শনকে বাতুলের উক্তি বই আর কিছু মনে করিতেন না। পাশ্চাত্য দর্শনও যত কাল পর্য্যন্ত যে বিষয়কে ঠিক বুঝে তত কালই উহা ঠিক; বুঝের পরিবর্ত্তনে যখন উহাকে বেঠিক বুঝে, তখন উহাকে বাতুলের উক্তিই মনে করে।

[(৪৪)—স্থ]

মা'র মরার পর "বিশুর" সঙ্গ মিলার পূর্ব্বে 'গুরু' যেন আমার স্মৃতিতে ছিল না, তাই বুঝি নাই কোথায় কি ভাবে ছিলাম। এখন আর যেন জ্বালা সয় না, খেলা ভাল লাগে না, মন-প্রাণ-শরীর দিন দিন নিস্তেজ হইতেছে; কেবল বিশু গুরু ভক্তি শিক্ষা দিবে এ প্রত্যাশায়ই যেন জীবন দেহে আছে। যে কোন প্রকারেই হউক প্রত্যাশা অভাব হইলেই এ দেহের অভাব হইবে, ইহা ধ্রুব বুঝিয়া নিশ্চিন্ত আছি। আশু জ্বালা নিবারণ হইলেও অলক্ষিত ভাবে বর্ত্তমান জ্ঞানের অগোচরে বাসনা থাকিলে জ্বালা পাইতে হইবে, ইহা ভাবিলেই অস্থির করে।

জগতের কোন সুখ, দুঃখই ত আমার বুঝা না বুঝাকে অপেক্ষা করে না। আমার ইচ্ছায় ত শরীরের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিবর্ত্তনের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আমার বুঝা ও না বুঝাকে অপেক্ষা না করিয়া প্রকৃতির নিয়মানুসারে আমাতে রোগ, শোক, দৈন্য, বার্দ্ধক্যাদি সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। আমি ত দেখি আমার কিছুতেই আমার হাত নাই; তথাপি আমি করি, আমি বুঝি, ইত্যাকার অভিমান কিছুতেই ধ্বংস হয় না। ক্রমে মাস, বার, ঋতু, পক্ষ, বৎসর সর্ব্বদাই মানবের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যাইতেছে। গ্রহ উপগ্রহ পরিভ্রমণে শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু ভেদ হইতেছে; তৎ সঙ্গে সঙ্গে আমারও অনুভূতি ভেদ হইতেছে। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কিছুই নির্ভর করে না। তবুও আমার ইচ্ছা ইহা করি, উহা হউক, এ বাসনার নিবৃত্তি নাই।

দেশ, কাল ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত অবস্থায় না গেলে আমার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। 'বিশু'-চিন্তায় কি দেশ কালের অতীত জ্ঞানে থাকিতে পারি? না 'বিশু' প্রাণে থাকিতে দেশ, কাল জ্ঞান রহিত হইবে? এখন জিজ্ঞাস্য এই, আমার কর্ত্তব্য কি? এক সময়ে এমন সময় হইবার প্রত্যাশা কর কি না-'বিশু' আর 'আমি' মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে?

[(৪৫)—জ]

বহু কাল চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, যখন যেরূপ ক্রিয়া দেহে জন্মে তাহাই ঠিক বুঝা যায়; এমতাবস্থায় অর্থাৎ বিপরীত ক্রিয়া জন্মিবার কারণ বর্ত্তমানে, ব্রহ্ম জ্ঞান জীবের পক্ষে অসম্ভব। তবে ব্রহ্ম, শক্তি প্রভাবে অনন্ত প্রকার বুঝিতেছেন ও বুঝিবেন, এ ধারণা নিশ্চয় স্থির ধারণায় ধারণা হইলে, আর কোন ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনেই স্বরূপ জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হয় না। বাজীকরের বাজীতে অনেক প্রকারই প্রকার ভেদ দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বেব ভোজ বাজী এই জ্ঞান থাকায় সেই বাজী দেখিয়া আসক্তি-অনাসক্তি ও সুখ-দুঃখের ইতর বিশেষ হয় না এবং তজ্জন্য কোন কর্ম্মফলও অর্শে না। এইটা ভোজ বাজীর বাজীর মত এইটুকু বুঝাইয়া দিতে পারিলেই আর কোন কর্ম্মের জন্য কিছুই ভাল-মন্দ সম্ভব নয়।

তোমার সঙ্গে অনেক দিনই দেখা হওয়ার ইচ্ছা প্রবল, অথচ দেখা হইতেছে না; এখানে পৌঁছিয়াই জানিলাম তুমি শিলচর বদলি হইয়াছ, এ ব্যাপারে যে কতই কি প্রাণে আসিতেছে, বলিতে পারি না।

দুইজন একত্র থাক অনেক দিনের ইচ্ছা। এ ইচ্ছা কি এই তিন মাসেই শেষ হইবে বলিতে পারি না।

[(৪৬)—যো, এ]

আজ প্রাণে কত কি ভাব আসিয়া মনে আসিল ইন্দ্রিয় বর্ত্তমানে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াতীত একটা অবস্থা ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ অনুভব করিতে পারে না; এবং ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে চিন্তার বিষয়ও না। কারণ আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞান বাদ দিয়া চিন্তাই করিতে পারি না। ইন্দ্রিয়াতীত-পদার্থ যাহা বুঝি তাহাও ইন্দ্রিয় দিয়া বুঝি। সুতরাং ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ছাড়া বুঝি না। আর যদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ছাড়া বুঝিতে চাই তবে বুঝ্ থাকে না, যেহেতু বুঝ্ ইন্দ্রিয় জ্ঞান-মূলক। অতএব আমার বুঝের বিষয় ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় নহে। তবে তোমরা যে বুঝিতে চেষ্টা কর, বুঝ্ বাদ দিয়া স্বরূপ অবস্থা পাওয়া যায় কিনা, তাহা অন্য কাহারও বুঝে ঠিক বুঝিবে না; বরং বেবুঝ্ বলিয়া তোমাদিগকে বুঝিবে। সংসারে কাহারও বুঝের নিকট তোমাদের বুঝ্ স্থান পাইবে না। অতএব এ ব্যাপারে লাঞ্ছনা ও যাতনা পাইতে হইবে। তুমিও বুঝ্ দিয়া বুঝিতে গেলে বর্ত্তমান বুঝে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে ভুল করিতেছ মনে হইয়া প্রাণে আতঙ্ক আসিবে।

ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকিতে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় জ্ঞানের বিষয় হওয়া অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকিলে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় কি জ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব? যখনই ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিয়া

ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় চিন্তা করি তখনই জ্ঞানে অসম্ভব বোধ হইবে; সুতরাং আমার জ্ঞানেই আমাকে ভ্রান্তিতে ফেলিয়া ভ্রমকেই ঠিক বুঝাইবে। আত্মা ইন্দ্রিয়ের যোগে বুঝিয়া ইন্দ্রিয়কে বাদ দিয়া যখন চিন্তা বা কল্পনা করিতে সক্ষম নহে, তখন ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় জ্ঞানে সম্ভব বলিয়া সম্ভবপর হওয়া অসম্ভব। অসম্ভব ব্যাপারে আসক্তি বা চেষ্টা আসাও অসম্ভব। সুতরাং ইন্দ্রিয় জ্ঞান ভুল ইহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান না হওয়া পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান বাদ দিতে ইন্দ্রিয়ের বুঝ্ কিছুতেই রাজী হইবে না।

তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়ের বুঝ্ ঠিক কি বেঠিক সর্ব্বদা চিন্তা করা অত্যাবশ্যক। নচেৎ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান নিয়া বুঝিতে গিয়া সত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করিলেই ভুল বুঝিবে; এবং ভুলই ঠিক ধারণা হইয়া ঠিক অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি আর থাকিবে না। দিন দিন ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের যত উন্নতি দেখিতেছি ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের জন্য মানুষের যত আগ্রহ ও চেষ্টা, যত্ন দেখিতেছি ততই আমার প্রাণে হতাশা ও নিরুৎসাহ আসিয়া বর্ত্তমান যুগে আশ্রমাদি অসম্ভব বোধ হইতেছে। দেশের শিক্ষা, দীক্ষা আচার, ব্যবহার, আলাপ ও ভাষার উন্নতি দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমান লোকের ইন্দ্রিয়জ্ঞান ভুল প্রমাণ করিতে সাহস হয়? কেবলই চিন্তা হয় অপরের ভুল বুঝাইতে গিয়া নিজেই ভুলে ঘুরিতেছি। যেহেতু অপর বলিয়া কোন বস্তু নাই, কেবল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানেই অপর বুঝি ও বুঝাইতে চেষ্টা আসে। বুঝাইবার কোন বস্তু নাই, বুঝাই বা কাকে? নিজে বেবুঝ্, তাই বুঝাইবার বুদ্ধি আসে। স্বরূপ বুঝে গেলেই বুজিয়া যাইতে হয়, আর বুঝাবুঝি থাকে না। তবু যে বুঝাইতেছি

ইহা কেবল বুঝিবার অভাবে। বুঝাইয়া বুঝান যাইবে না। যখন বুঝিলে বুঝান থাকে না, তখন বুঝাইয়া বুঝাইব কেমন করিয়া?

বুঝাবুঝি জগৎ ভরিয়াই চলিতেছে ও চলিবে। বুঝ্ কিছু না, ইহা বলিলেই লোকে বেবুঝ্ বলিবে। সুতরাং বুঝাবুঝির ব্যাপারে যত ক্ষণ আছ তত ক্ষণ যত বুঝাইব ততই বুঝিয়া বুঝিবার ইচ্ছা প্রবল হইবে। বুঝার ইচ্ছা প্রবল হইলেই বুঝের অভাবে যাহা বুঝা যায়, তাহা হইতে সরিয়া পড়িবে। সমস্ত সংসারই বুঝিতে চায়, বেবুঝ্ দেখিলে পাগল বা নাবুঝ্ বলিয়া ঘৃণা করে। এ-জগতে থাকিয়া জগৎ জ্ঞান পরিশূন্য অবস্থা অসম্ভব। অতএব জগদতীত 'গুরুর ঘাটে' না যাওয়া পর্য্যন্ত বুঝাবুঝিতে কেবল বুঝাবুঝির মারামারিই বৃদ্ধি পাইবে। বুঝের মধ্যে থাকিলে সকলেই স্ব স্ব বুঝ্ অনুরূপ বুঝে ও বুঝের পার্থক্য কোন কালে অভাব হওয়া অসম্ভব। কারণ, যত দিন পৃথক জ্ঞান বা ধারণা বর্ত্তমান, তত দিন বুঝ্ও পৃথক থাকিবে। বস্তু পৃথক থাকিলে বুঝ্ পৃথক থাকিবে না? বুঝে পৃথক না বুঝিলে বস্তু পৃথক কিরূপে সম্ভবে? যত দিন বিভিন্ন প্রাণী জ্ঞানে বর্ত্তমান, তত দিন জ্ঞানও বিভিন্ন। যেহেতু বা যৎ কারণে পৃথক বল তৎ হেতু ও তৎ কারণেই পৃথক বুঝ্ থাকিবে। সুতরাং পৃথক জ্ঞানে এক বুঝ্ একেবারেই অসম্ভব। এজন্য পৃথক বোধে এক বুঝাইতে চেষ্টা আর আমার ইচ্ছা হয় না ও দিন দিন পণ্ডশ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে।

অপর পক্ষে আবশ্যক বা প্রয়োজন বোধ থাকিতে প্রিয় বস্তুর অভাব করা অসম্ভব; সুতরাং প্রয়োজন অভাব না হইলেই বা সেই

এক বস্তুকে প্রিয় মনে করিয়া তালাসের অবকাশ কৈ? প্রয়োজনীয় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তুর অন্বেষণ কে কবে কোথায় করিয়াছে? ইন্দ্রিয় জ্ঞানে কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নয়। যে সুখের প্রত্যাশায় জীব লালায়িত, সে সুখ এই ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভব নয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু হইতে লাভ হয় না, ইহা না বুঝা পর্য্যন্ত জীব ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের তালাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে কেন?

পূর্ণ সুখ বা প্রকৃত সুখ কি তাহাও এই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ধারণা হয় না; ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অনুরূপ সুখ বুঝে ও সেই সুখই খোঁজে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু একটা কল্পনা মাত্র। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সুখ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু ভিন্ন সম্ভবপর নয়। আবার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, অবশেষে অপ্রত্যক্ষ হয়; সুতরাং পরিবর্ত্তন ভিন্ন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের সুখ অনুভব করিতে পারে না; এবং পরিবর্ত্তনের পরিণামে অপ্রত্যক্ষ হওয়া। এজন্য ইন্দ্রিয়ের সুখ ক্ষণকাল পরে অভাব বা অপ্রত্যক্ষ হয়। কেবল সুখের অভাব হেতু অভাবই বর্ত্তমান থাকে। অতএব ইন্দ্রিয় জ্ঞান ভুল না বুঝা পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান ঠিক বুঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করিতে গিয়াই পূর্ণানন্দের পূর্ণ আনন্দ কিছুতেই সম্ভব না।

[(৪৭)—জ]

বাবা, জগৎ ভরিয়া কেবল প্রবৃত্তি মূলেই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছে। যা'র যে প্রবৃত্তি বা যে বাসনা বা যে ভাব প্রবল তাহাতে তদ্বিপরীত প্রবৃত্তি, বাসনা ও ভাবের অভাব; তজ্জন্য একে অপরের কাজ বুঝে না, অথচ বুঝাবুঝিতে বুঝি বলিয়া অভিমান আসিয়া, তাহা নিয়া বিচার ও বিবাদ করে। সততই অনুধ্যান করিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা প্রাণে প্রবল হয়, তদাকাঙ্ক্ষানুরূপ ব্যাপারই সর্ব্বদা সঙ্গত মনে করি; তদ্বিপরীত ব্যাপার অসঙ্গত অন্যায় মনে করি এবং স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ রাতদিনই ন্যায়ান্যায় বুঝিতেছি। প্রকৃত নিবৃত্তি না আইসা পর্য্যন্ত ন্যায়ান্যায় বুঝা অসম্ভব। প্রবৃত্তি থাকিলেই প্রবৃত্তি অনুরূপ ন্যায়ান্যায় বুঝিব এবং সেই ন্যায় অন্যায় অনুরূপই কর্ম্মে আসক্তি ও প্রবৃত্তি জন্মিবে। লোভের প্রবল অবস্থায় চোরে যে চুরি করে, সে তখন তা'র জ্ঞানে তাহাই সঙ্গত মনে করে; তদবস্থায় তাহার প্রবল লোভানুরূপই ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার। বুঝ্ একটা না বুঝিয়া কিছুতেই নীরব থাকে না; সুতরাং আমার বুদ্ধির অগম্য বিষয়ও আমরা বুদ্ধি অনুরূপ বুঝে একটা বুঝি। এজন্য ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থার বহুবিধ প্রকার ভেদ হইয়াছে। স্ব স্ব বুঝ্ অনুসারে সকলেই তাঁহাকে বুঝি; সূর্য্য যেমন বালক, বৃদ্ধ, যুবক ও বিজ্ঞানবিদের বুঝে নানা প্রকার। জগতের সকল পদার্থই প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণা হইতেছে; প্রকৃতির অতীত পদার্থকে যে বিভিন্ন রূপ দেখিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই বুঝের

মধ্যেও দেখা যায় সব সময়ে উহা এক রূপ থাকে না। তাহারও কারণ এই যে, প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনে বুঝের পরিবর্ত্তন হয়। এজন্য আর্য্য ঋষিরা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রবৃত্তির বাহিরে জীব বুঝিতে পারে না। সুতরাং যখন যেরূপ প্রবৃত্তিই জীবের থাকুক না কেন, এই জগতের অতীত ব্রহ্ম একটা পদার্থ, এটা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ বুঝে বুঝিলেও, তাহাতে জীবের মঙ্গল বই অমঙ্গল অসম্ভব। যে কোন প্রকারেই হউক 'তাঁহাকে' জীবের বুঝা ভাল।

অপর পক্ষে প্রকৃতির বৈচিত্র্যে স্বতঃসিদ্ধই তাহাকে ভিন্ন ভাবে বুঝা আসিয়া পড়ে; তাই ভিন্ন ভাবে লোক দেখিতেছে। প্রকৃতির প্রবল অবস্থায় তাঁহার স্বরূপাবস্থা বুঝান ভ্রান্তি; যেহেতু যেরূপেই যে বুঝাউক না কেন, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে বুঝিবেই বুঝিবে। সকলে এক বুঝে বুঝিলে প্রকৃতির অস্তিত্ব অসম্ভব হয় অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্নতা থাকে না এবং দ্বন্দ্ব, হিংসা, দ্বেষ, সকল অভাব হয়। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে বুঝে বলিয়া এক উপদেশই বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে ধারণা করে। স্বরূপ বুঝে যাইতে হইলেই নিবৃত্তির দরকার। সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সময়ে স্বভাবের নিয়মেই শিথিল হইয়া আসে; সেই সময়ে যদি পূর্ব্বাবধি সদুপদেশ ক্রমে নিবৃত্তির অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে আর সংস্কারানুরূপ চিন্তা আসিয়া শেষ সময়ে নিবৃত্তির বাধা জন্মাইতে পারে না। কেবল প্রবৃত্তির দাস হইয়া প্রবৃত্তির অনুসরণ করিলে, শেষ অবস্থায়ও প্রবৃত্তির সংস্কার জাগিয়া প্রবৃত্তির সংস্কার নিয়া ইহধাম ত্যাগ করিতে হয়।

[(৪৮)—ন, স্থ]

সর্ব্বদাই এক বিপদ জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে; পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেন বলিলাম, চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত রহিয়াছে। জীব, জগৎ নশ্বর ইহা না বুঝিয়া গুরুর নিকট গেলে, 'গুরুর ঘাটে' ঠিক না পৌঁছা পর্য্যন্ত—অর্থাৎ জগৎ থাকে না, কেবল গুরুই থাকে, এবম্বিধ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত—তাহার পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। যাহারা ভুলকেই স্বতঃসিদ্ধ ঠিক বলিয়া নিঃসংশয়রূপে ঠিক ধারণা করিয়া রহিয়াছে, 'গুরুর ঘাটে' না পৌঁছা পর্য্যন্ত, গুরু অনুসন্ধানকারী অথবা গুরু চিন্তা বা অনুধ্যান করে যে সব লোক, তাহারা পূর্ব্বোক্ত ভুলকে ঠিক ধারণাকারীদের সঙ্গে মিলিলেই স্বীয় অবস্থাচ্যুত হয়। কেননা, তাহার ধারণা বা চিন্তা নিঃসংশয় নয়। প্রকৃতির নিয়মানুসারে সংশয় যুক্ত প্রকৃতি নিঃসংশয় অবস্থাকেই গ্রহণ করে। যে প্রকৃতির লোক যে অবস্থাকে স্বতঃসিদ্ধ ঠিক বুঝিয়া আছে, সেই প্রকৃতির লোকের সঙ্গে, যাহার কোন বিষয়ে নিশ্চয় ধারণা নাই, সে মিলিলে, তদবস্থাপন্ন হইবেই হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা, সংশয় যুক্ত অবস্থা অবলম্বন ভিন্ন ঠিক থাকিতে পারে না।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় বৈশম্পায়নকে এজন্য ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে, বিপরীত ভাবাপন্ন জীবের সহ, নিঃসংশয় অবস্থায় না পৌঁছা পর্য্যন্ত, মিলিলেই নিজের সংশয় যুক্ত গুরু জ্ঞান স্থির থাকিবে না; এমন কি, বৈরাগ্য না আসিলে, 'গুরুর ঘাটে' ঠিক্ নিশ্চলভাবে থাকার পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তন সম্ভবপর। কেননা, মন সংশয় যুক্ত

অবস্থায় ঠিক থাকিতে পারে না, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। এরূপ স্থলে যে, যে প্রকার ক্রিয়া ঠিক বলিয়া ধারণা করিয়াছে, তাহার সহিত মিলিলে তদবস্থা ঠিক ধারণা করিবে। কেননা, মন শূন্য ধারণা করিয়া যেমন স্থির থাকিতে পারে না, তেম্‌নি সংশয় যুক্ত অবস্থায়ও ঠিক থাকিতে পারে না।

তবে অবস্থা বা অন্য বস্তু অভাবেও এক গুরুর ব্যবহার, বাক্য, ভাষা বা আকার নিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। সেই গুরু ভিন্ন অন্য চিন্তা যখন আসে এবং সে চিন্তা যদি নিশ্চয় ভুল ধারণা না হইয়া থাকে এবং ঐ চিন্তানুরূপ জিনিস ঠিক্ ধারণা হইলে ঐ পদার্থে যেরূপ ঠিক জ্ঞান বর্ত্তমান নিজেরও তদনুরূপ ঠিক ধারণা হইবে। এজন্য শাস্ত্রে নিষেধ আছে, বিপরীত বিষয় যাহাদের ঠিক ধারণা আছে তাহাদের ঠিক না বুঝিয়া ঠিক বুঝাইতে যাইও না। তবে যাহাদের কোন বিষয়ে ঠিক ধারণা নাই, সর্ব্বদাই সংশয়ে তালাসানুসন্ধান করে, তাহাদিগকে গুরু যত দূর প্রাণের সহিত বুঝিয়াছ তত দূর বুঝাইলে উপকার বই অপকার নাই। কেননা, তাহা দ্বারা তোমার যে সংশয় যুক্ত গুরু জ্ঞান তাহাতে আর সংশয় হইবার সম্ভাবনা নাই ; তাহার সংশয় তোমার সংশয়ানুরূপই হইবে, তাহার অনুরূপ তোমার হইবে না। যেহেতু সে সংশয় যুক্ত হইয়া তোমার নিকট জানিতে চায়। তোমার তাহার নিকট জানিবার বিষয় নাই, তাহার তোমার নিকট জানিবার বিষয় আছে। অতএব যদিও বা যোগ হইতে হয়, তবে ঐরূপ সংশয়-বিশিষ্ট লোকের সহিত যোগ হওয়া মন্দ নয়।

যোগসূত্রে অনেক জায়গায়ই প্রমাণ করিয়াছে সবিকল্প নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যেও ৮ প্রকার ভেদ আছে। ঐ ভেদের মধ্যে শেষ স্থানে না পোঁছা পর্য্যন্ত, বৈরাগ্য না হইলে অন্য প্রকার প্রকার ভেদের মধ্য হইতেও পতন সম্ভব। বাবা, এম্-এ পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে আমার বিশ্বাস তোমাদের সহিত আমার বুঝাবুঝি শেষ হইবে। বুঝিয়া বুঝা যায় না, ইহা না বুঝিলে বুঝাবুঝির মধ্যে থাকিয়া বুঝে নানা সময়ে নানা গোলমাল ঘটায়। সংসারে যত পাজি আছে, সকলের মধ্যে বুঝ্ বেটা ভীষণ পাজি। এ-পাজিকে দূর করিতে না পারিলে কেহই আমাতে রাজী হয় না, বুঝ্কে বাদ দিতে যারা রাজী না তাহাদের বুঝান নিষ্ফল, অরণ্যে রোদন। বুঝ্ বেটাই এ জগৎটাকে ঠিক বুঝাইতেছে, তাকে রাখিয়া জগৎ ভ্রম বুঝা কাঁঠালের আমসত্ত্ব। বুঝে বুঝায় গুরু বেটা বড় বুদ্ধিমান্, অমন নির্ব্বোধ জগতে আর একটি নাই। সকল বুঝ্ বাদ দিতে গিয়া বুঝ্ আবার শিষ্য বুঝিয়া রাতদিন ঝকৃড়া মকৃড়ি লাগায়। ঐ অবস্থায় শিষ্য না বুঝিলে আর কোন বুঝ্ই থাকে না, কেবল গুরু বুঝ্ই থাকে।

শিষ্য বুঝিয়াই গুরু বুঝ্ অনেক সময়ই বাদ পড়ে। তবে বৈরাগ্যসম্পন্ন শিষ্য, যে কেবল গুরুই বুঝিতে চায়, তা'রে বুঝাইতে গেলে, কেবল 'গুরু গুরু' বুঝাইয়াই গুরু নিস্তার পান এবং গুরুর বুঝ্ ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে বা বলিতে হয় না। তোমাদের মত শিষ্য বুঝিয়া গুরু কি বুঝেন তাহা একটু চিন্তা বা বিচার করিয়া দেখিবা। এখন দেখ কেন শিষ্যেরা গুরুকে পরম দয়ালু বলিয়া কাঁদিয়াছে।

[(৪৯)—জ]

যত ইতি গোলমাল সমস্তই জ্ঞান বা বুঝ্ নিয়া, বুঝ্ বা জ্ঞানের বাহিরে কিছু নাই। জ্ঞান বিষয়ে না থাকিয়া নিজের ভিতরে থাকিলে দেখিতে পায় কিছুই বুঝে না, বুঝিবার বাকী অনেক আছে; যতই যে বুঝে, তার বুঝে তত বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। ইতিহাসাদি পাঠে কোথাও বুঝের অভাব নাই। এরূপ মিলে না, যতই যে বুঝে বলিয়া বুঝে ততই সে বুঝিবার বাকীও অনেক আছে বুঝে। হয় বুঝিয়া বুঝা যায় না স্বীকার করিতে হয়, না হয় বুঝা সম্ভব নয় বুঝিতে হয়। এই উভর অবস্থায়ই বুঝের বা জ্ঞানের অযোগ্যতা প্রমাণ হয়।

প্রাণে জ্ঞান পিপাসা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, জ্ঞানেই অভাব অনুভব করে; তবে কিসের অভাব ইহা, এই অযোগ্য জ্ঞান দিয়া নির্ণয় করিতে গেলে ভুল হইবে। বুঝ্‌কে সাক্ষী মানিলে বুঝ্ বলিবে বুঝি না; অথচ যত ইতি কর্ম্ম করিতেছি সমস্তই বুঝে বুঝিয়া করি। এই ভীষণ ভ্রান্তির মূলেই বোধ্য বিষয় ও বিষয়াসক্তি; সুতরাং 'বুঝি না' না বুঝিলে বুঝান কঠিন। অপর পক্ষে বুঝের বিষয় থাকিয়াই বুঝ্ এই গোলমালে পড়িয়াছে। বুঝ্-রহিত হইবার একমাত্র উপায় গুরু চিন্তা—যে চিন্তায় 'হুঁ'-র 'উ'-র ঘাটে উঠিয়া ইন্দ্রিয়ের বুঝানুরূপ কোন বুঝ্‌ই থাকে না। ইহাই বর্ত্তমান যুগে কোন সম্প্রদায় স্বীকার করিতেছে না।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যাবতীয় ব্যাপারই পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসশীল; এই পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসশীল বস্তুর আসক্তিতে জগৎ আসক্ত; কিন্তু এমন

একটা স্থূল দেহে আসক্ত হইতে মন রাজী নয় যার চিন্তা আমাকে প্রতিনিয়ত 'হুঁ'-র 'উ'-র ঘাটে অলক্ষিত ভাবে নিয়া যায়। ইহা কেবল আমাদের প্রকৃতি ও রুচি বিরুদ্ধ বশতাই অলক্ষিত ভাবে হয় বলিয়া আপত্তি; ইহা ভিন্ন আমি আর অন্য আপত্তি কিছু দেখি না। যৎ সঙ্গে বিপরীত সঙ্গানুধ্যান বর্জ্জন হয়, যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ বর্জ্জন না করিলে, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু জ্ঞান সম্ভব নয়, তাহা করিতে মন রাজী নয়, ইহার কারণ বুঝানুরূপ বুঝের বিলোপ কিছুতেই ইচ্ছা করি না। 'বুঝি না' আপত্তি করি, ইহা বিপত্তি বই অন্য কিছুর কারণ নয়; তাই, মানব এই জ্বালাময় সংসারকে সুখের মনে করে।

হা হতোস্মি, কাঁদা-কাটি, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, মারামারি, খুনাখুনি সমস্ত পৃথিবীর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাই, সুতরাং এই সমস্ত অবস্থা জ্ঞানে ঠিক্ ধারণা হইলে বেঠিক বলিয়া কোন অবস্থাই নাই। অতএব সাধন বা উপায়ান্তর গ্রহণ করার কোন আবশ্যকতাই নাই। অপর দিকে দেখিতে পাই মানুষ প্রতিনিয়ত অভাব পূরণের জন্য ব্যাকুল ও অস্থির। এমন একটা অবস্থা কিছুই নাই যাহাতে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের জ্ঞান দিয়া অভাব পরিশূন্য অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। তথাপি ইন্দ্রিয় জ্ঞানকে ভুল না বুঝিলে ভুল বুঝান কোন মতেই সম্ভব না। যে বিষয়ই বুঝি তাহারই আদি বা মূল কি বুঝিতে গিয়া বুঝ্ নীরব হয়, অথচ সর্ব্ব ব্যাপারেই বুঝের বিরাম নাই। বুঝের বিরাম না হইলে আমার বিরাম বা অভাব পরিশূন্য অবস্থা অসম্ভব। এত বুঝ্ থাকিতে বুঝের বিরামের অবস্থা কোন মতেই সম্ভব হয় না। এজন্য অপরের বুঝে

চলিয়া নিজের বুঝের দুর্ব্বলতা না জন্মাইলে, বুঝ্‌কে বুঝাইয়া রাখা কঠিন।

যে সংজ্ঞা-শব্দ দ্বারা সকল বুঝি ও বুঝাই, এবং যাহা বুঝিয়া এই সংজ্ঞা-শব্দের সৃষ্টি বা কল্পনা করিয়াছি, সে বুঝেও স্পর্শানুরূপ স্পর্শের বিষয় সংজ্ঞা-শব্দের দ্বারা বুঝে না; অর্থাৎ লৌহ বা তুলার স্পর্শের দ্বারা যে স্পর্শের অবস্থা বুঝাইবার জন্য যে কঠিন বা কোমল শব্দ প্রয়োগ করি, ঐ শব্দের দ্বারা 'স্পর্শ' স্পর্শ করিয়া যেরূপ বুঝে, সেরূপ বুঝে না বলিয়া বুঝে, তথাপি বুঝি বা বুঝাই বলিয়া যে অভিমান ইহা কি ভ্রান্তি নয়? এইরূপ প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞানেন্দ্রিয় পর্য্যালোচনায় ভুল করি বলিয়া বুঝি; তবুও ভুলানুরূপ ব্যবহার করি না। এরূপ অবস্থায় ঐরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান নিয়া স্বরূপ অবস্থা বুঝা এই বিরূপ অবস্থাকে স্বরূপ বুঝা বই স্বরূপাবস্থাকে স্বরূপ বুঝা সম্ভব না।

[(৫০)—জ]

আজ প্রায় তিন মাস অতীত হইয়া যায় আমি এই জাগতিক চিন্তায়ই ব্যাকুল ও অস্থিরাবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াছি। গত কল্য অত্রি সূত্র মনে আসিল—মানুষ স্বীয় বুঝানুরূপ হইলে সুখী। নিজ বুঝের মত নিজে ভিন্ন, অন্য ব্যক্তি বা বিষয় কিছুতেই সম্ভবপর নয়; যেহেতু আমি ভিন্ন অন্য বস্তু আমার জ্ঞানের দ্বারাই পৃথক করিতেছি ও পৃথক বুঝিতেছি। বিশেষ vibration (স্পন্দন) এর পার্থক্যই পৃথকত্বের কারণ; সুতরাং আমি ভিন্ন

অপর আমার বুঝ্ মত হইবে ইহা বুঝ্ গোড়ায়ই ভ্রান্তি জন্মে। সেই ভ্রান্তির ফলেই মানুষ যাতনা ভোগ করে।

অপর পক্ষে প্রত্যেকেরই পার্থক্য হেতু পৃথক বুঝ্ থাকায় স্ব স্ব বুঝানুরূপ সকলেই ভালবাসে, এজন্য কেহ কাহারও বুঝের বাহিরে কিছু চায় না। অতএব কোন ক্রমেই একের দ্বারা অপরের সুখ সম্ভব নয়। তথাপি যে অপরের দ্বারা সুখী হইবার বাসনায় আমরা অন্য ব্যক্তিকে চাই, সে ব্যক্তিও স্বীয় সুখের জন্য আমাকে চায়—এ অবস্থায় যে আমি অপরের সুখ বিধান করি ও অপরে আমার সুখ বিধান করে ও পরস্পর পরস্পরের সুখের জন্য ব্যাকুল বলিয়া মনে করি, ইহা কি ভ্রম নয়?

বুঝে প্রথমেই বুঝা উচিত যে আমার বুঝ্ মত অপর বস্তুই এ জগতে নাই; জগৎ বলিতে আমারই ক্রিয়া বৈষম্য অবস্থা? সুতরাং জগতের প্রত্যেক পদার্থ আমার ক্রিয়া বৈষম্য অবস্থার জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে। অতএব জাগতিক যে কোন বস্তু আমি আমার সুখের মনে করি, ক্রিয়া-বৈষম্যে জ্ঞান ভেদ হইয়া সুখেরও ভেদ হয়; সুতরাং কোন বস্তুই আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখের কারণ বা হেতু সম্ভব নয়। অপর পক্ষে আমার ক্রিয়া-বৈষম্যকেই আমি সুখের মনে করি; সুতরাং ক্রিয়া বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু বৈষম্য অত্যাবশ্যক। এ অবস্থায়ও কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু আমার সুখের বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না।

তবে এক আপত্তি প্রাণে সর্ব্বদাই উপস্থিত হয় যে, কতকগুলি বিষয় আমরা সুখকর বলিয়া বুঝি—তন্মধ্যে আহার ও স্ত্রী-

পুরুষ-সংযোগ, সর্ব্ব প্রাণীই সুখের বলিয়া বুঝে। তাহার কারণ এই, যখন আমি দেহ, তখন দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধি-ধ্বংস, এজন্য সাধারণ ধর্ম্মীরা স্বীয় দেহের ধর্ম্মানুসারে দেহে আত্ম-বোধ থাকায় আহার, নিদ্রা, মৈথুন ইত্যাদি পরিবর্ত্তনশীল বস্তু ও ক্রিয়াগুলিকে সুখের মনে করে। ধর্ম্মী স্বীয় ধর্ম্ম কোন সময়েই ত্যাগ করে না ও করিতে পারে না। এই প্রকার সুখ-দুঃখাদি কেবল পরিবর্ত্তন ও নশ্বর ধ্বংসশীল দেহে আত্ম-বোধ থাকাতেই হইয়া থাকে।

আবার ইহাও পরিষ্কারই জ্ঞানে জ্ঞান হয় যে, যখন দেহে আত্ম বোধ, তখনই দৈহিক সুখে স্পৃহা এবং দৈহিক সুখকেই সুখ মনে করি। দেহাতিরিক্ত জ্ঞান, যাহা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, তাহা দেহে আত্ম বোধ রহিত হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থান-কালে এই দৈহিক সুখকে সুখ মনে না করিয়া অতি যাতনা ও কষ্টের কারণই মনে করিয়া থাকে, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাহার কারণও ধর্ম্মী স্বীয় ধর্ম্মের বিপরীত বিষয়কেই দুঃখের ও যাতনাদায়ক মনে করে। অবিনশ্বর আত্মা এই নশ্বর পদার্থের দ্বারা কিছুতেই সুখী হইতে পারে না। আত্মার স্বীয় স্বরূপ দেহ যোগে বিরূপ হওয়ায় এই বিরূপকে সুখের মনে করে। আত্মার ধর্ম্মের বা জ্ঞানের প্রকার ভেদ হইয়া যখন যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করে তদবস্থানুরূপই তাহার ধর্ম্ম হইবে এবং হয়। অতএব আত্মার ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ভিন্ন সুখ-দুঃখ, আসক্তি-অনাসক্তির পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

আমি পরিষ্কারই দেখিতে পাই যে, আমার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখ ও সুখের বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয়। আমি শূকর অবস্থায় কচু ভালবাসি, আমি কুকুর অবস্থায় পচা-গলা, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট মাংস খণ্ড পাইলে তৃপ্তি বোধ করি। আমি বালক অবস্থায় মাকে ভালবাসি, আমি যৌবনাবস্থায় স্ত্রীকে ভালবাসি ; আমি ক্রুদ্ধাবস্থায় খুন করা সুখকর মনে করি, আমি শোকাকুলাবস্থায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে ভালবাসি। আমি অবস্থা বিশেষেই অবস্থা বিশেষকে ভালবাসি। অতএব আমার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনই আমার সুখ-দুঃখ পরিবর্ত্তনের কারণ। আমার রুগ্ন পথ্যাদির পরিবর্ত্তন যেরূপ আবশ্যক হয়, সেইরূপ দেহে আত্ম-বোধ-রহিত হইলে আমার সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হইবে ইহা ধ্রুবই। যখনই আমি আমার উত্তাপের সেই অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইব, তখন এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সমস্তই আমার দুঃখের বলিয়া সর্ব্বথা পরিত্যাগের জন্য দেশ কাল কিছুরই অপেক্ষা করিব না।

ধর্ম্মীর পরিবর্ত্তন ভিন্ন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষাও ভ্রান্তি, আমাদের আসক্তি অনাসক্তির কোন স্থিরতা বা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। আমার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার আসক্তি অনাসক্তির পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনাদি ভাষায় বুঝিয়াও পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব ; কারণ ধর্ম্মী কোন অবস্থায়ই স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করে না। ধর্ম্মীর ধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম করা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সত্য বলিতেও আমরা স্বীয় স্বরূপানুরূপ সত্য বুঝি। কেবল অপরিবর্ত্তনশীল আত্মা স্বীয় স্বরূপকে অপরিবর্ত্তনীয় দেখে ;

পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় আত্মা স্বীয় পরিবর্ত্তনকে ঠিক বুঝে। তবে পরিবর্ত্তনের স্মৃতি পূর্ব্বাপর অবস্থার পার্থক্য বুঝায় বলিয়া এ জ্বালার কারণ। যে বাসনানলে জীব সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, সে বাসনা অর্থাৎ অতৃপ্তাকাঙ্ক্ষা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে অতৃপ্ত অবস্থায়ই জীব তৃপ্তি বোধ করিত। যদুপাদানে যৎ পদার্থ নির্ম্মিত তদুপাদানানুরূপই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্মীর ধর্ম্মের বাহিরে কোন আকাঙ্ক্ষা বা যোগ্যতা সম্ভব না। বাসনার নির্ম্মিত পুতুলে বাসনার জ্বালা কিছুতেই সারে না। বাসনার নিবৃত্তি হয় না, সে অবস্থায় নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা কোথা হইতে আইসে? যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহার প্রত্যাশাও নাই।

দেখিতে পাওয়া যায় জ্ঞানে যে বিষয়ের অভাব সে বিষয়ানুরূপ কোন কর্ম্মও জ্ঞানে নাই; সুতরাং অতৃপ্ত বাসনায় জ্ঞানে তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা কোন রকমেই সম্ভব না। জ্ঞানের এক অবস্থায় অন্য অবস্থা অভাব বলিয়াই যে অবস্থায় এই পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসশীল দেহকে জ্ঞানে আমি জ্ঞান জন্মে, তদবস্থায় আমার পরিবর্ত্তন ও ধ্বংস, আমি জ্ঞানে কিছুতেই অনুভব করিতে পারি না। তবে যে অভিমান ভরে এক অবস্থায় অন্য অবস্থা বুঝি বলিয়া বলি, সে শুধু ভ্রান্তি। আমার ছেলে ও অপরের ছেলে, এমন কি আমার বলিতে আমার যাহা তাহা অপরানুরূপ আমি কিছুতেই বুঝি না; অথচ বুঝে বুঝি বলিয়া বুঝি। তাহার তাৎপর্য্য এই, আমার জ্ঞানে বর্ত্তমানে যেরূপ বুঝা যায়, সেইরূপই সেই জ্ঞান দিয়া অপরকে অপর বুঝি। যদ্ জ্ঞান দ্বারা বুঝি তদ্ জ্ঞানে তাহা ঠিকও বুঝি; সেজন্যই বুঝি যে

বুঝি। অথচ বুঝের তফাৎ না হইলে বিভিন্ন বিষয় বুঝা যায় না, ইহা পাশ্চাত্য দর্শনের Vibration অর্থাৎ স্পন্দন জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝিলেও অনায়াসে বুঝা যাইবে।

বাবা, আমার যে অবস্থা গুরুর অবস্থা, যদবস্থায় গেলে দৃশ্যমান জগৎ জ্ঞানে জ্ঞান হয় না, তদবস্থায় না যাওয়া পর্য্যন্ত এ দৃশ্যমান জগৎ ভুল বুঝা অসম্ভব। আমার বিপরীত অবস্থায় বিপরীত অবস্থা বুঝা কোন অবস্থায়ই সম্ভবপর না। কেবল সাধনে যে হয় সে সাধনের প্রবৃত্তি হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আমাদের আবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ই তদবস্থাপন্ন না হইয়া বুঝি বলিয়া বুঝি না; কেবল যাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, তাহাই না বুঝিয়া বুঝ্ বুঝিয়া থাকে। অপরের রোগ শোকাদির জন্য যাতনা তদবস্থাপন্ন না হইয়া বুঝিয়া নিবৃত্ত হই; কিন্তু নিজের রোগ শোকের বেলায় ঔষধ ও শান্তি খুঁজিয়া থাকি। এই বুঝার পার্থক্যেই ক্রিয়া বৈষম্য ঘটায়।

আমরা কি কোন কর্ম্মে না বুঝিয়াই প্রবৃত্ত হই? কেবল যৎ কর্ম্ম করিতেছি, তৎ কর্ম্ম যেরূপ বুঝি, যাহাতে আসক্তি জন্মে না তাহা কি সেইরূপ বুঝি? এই বুঝের পার্থক্যেই রাতদিন গোলমাল চলিতেছে। যাহা যেরূপ পরিবর্ত্তনে বুঝা যায়, তদ্রূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া বিপরীত অবস্থায় বুঝিলেই বিরূপ জ্ঞান থাকিবে, যেমন বর্ত্তমান কালের ব্রহ্ম জ্ঞান। ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ভিন্ন কিছুই বুঝা যায় না; সুতরাং ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন না করিয়া বুঝিতে গেলেই ভুল বুঝিব, সে ভুলও কোন সময়ে ভুল বলিয়া বুঝে বুঝিবে না। যেহেতু

বুঝানুরূপ ঠিকই বুঝি। অতএব ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ভিন্ন কোন অবস্থাই বুঝা যায় না, ইহা প্রাণে দৃঢ় ধারণা না থাকিলে বুঝিবার জন্য ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা আসিবে না। আবার যাহা বুঝিতেছি তাহা ভ্রমে বুঝিতেছি ইহা না বুঝিলেই বা স্বরূপ বুঝের চেষ্টা আসিবে কেন? কোন সময়ে এক অবস্থায় থাকিয়া অপর অবস্থা বুঝিয়াছি বলিয়া বুঝিলে, স্বরূপ অবস্থা বুঝার চেষ্টা কোন সময়েই আসিবে না। এজন্য নিজের বুঝ্ ভুল এই অনুধ্যান সর্ব্বদাই থাকা উচিত।

[(৫১)—জ]

বাবা, বহু দিন পরে আজ আবার প্রাণ পাগল হইয়া উঠিয়াছে। আমার জ্ঞানের বাহিরে কিছু নাই; আবার দেখি আমার জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা আছে, জ্ঞান-পিপাসা জ্ঞানে সর্ব্বদা প্রবল। তবুও জ্ঞানকে ঠিক বুঝি; জ্ঞানে অভাব না থাকিলে আকাঙ্ক্ষা কেন জন্মে? জ্ঞান পূর্ণ হইলেই বা জ্ঞান-পিপাসা থাকে কেন? কি আশ্চর্য্য, জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না যে, জ্ঞান স্বরূপে নাই, জ্ঞানে ভ্রান্তি বর্ত্তমান !! যাহা কিছু করিতেছি তাহা কি অভ্রান্তবৎ করিতেছি?

জ্ঞানে অসীম অনন্ত আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান, অথচ আমি সীমাবদ্ধ দেহী; এই সীমাবদ্ধ দেহকেই 'আমি' বুঝিয়া কর্ম্ম করিতেছি। এই সীমাবদ্ধ 'আমি'র অসীম অনন্ত আকাঙ্ক্ষা কি ভ্রান্তি নয়? পক্ষান্তরে 'আমি' যদি অসীম অনন্তই হই তবে আমাকে যে সীমাবদ্ধ দেহী ভাবিতেছি তাহা কি ঠিক? যদি আমি ঠিকই

বুঝি, তবে বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা আমার ভুল নয় কি? আমি ত সবই বুঝি, তবে আমার বুঝিবার আকাঙ্ক্ষাটা কি ভ্রান্তিতে জন্মিতেছে না? অথবা আমি বুঝি না, তাই বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান? তাহা হইলে আমি বুঝিয়া যাহা করি, সকলই ভুল করি।

আমার বুঝের বাহিরে 'আমি' কৈ? যে প্রকারেই আমার বুঝ দিয়া বুঝিতে যাই, সব প্রকারেই আমাতে ভ্রান্তি দেখিতে পাই; অথচ আমি অভ্রান্তের মত কর্ম্ম করিতেছি। ইহা আমাকে কে করায়? আমি এই বহুরূপী শরীরকে 'আমি' বুঝিয়াই যখন যাহা বুঝি তাহা ঠিক বুঝি; কারণ, শরীর ক্ষণকালের জন্যও এক ভাবে বা স্থির ভাবে নাই। অপর পক্ষে জ্ঞান এই জগৎ ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমানুরূপই আকার ধারণ করে; সুতরাং স্বীয় স্বরূপানুরূপ ব্যাপারকেও স্বরূপই বুঝে। অতএব চিন্তনীয় বিষয় একটা অপরিবর্ত্তনীয় জিনিস না হইলে এই পরিবর্ত্তনানুরূপ ঠিক বোধ কোন সময়েও বেঠিক বলিয়া জ্ঞানে জ্ঞান হইবে না।

জ্ঞানের পরিবর্ত্তনে দৃশ্যমান জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে—ইহাই হউক, অথবা দৃশ্যমান জগতের পরিবর্ত্তনে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইতেছে—ইহা হইলেও পরিবর্ত্তন কে বুঝে? যথা, গতিশীল বস্তু আরোহণে গত্যাত্মক অবস্থায় গতিশীল বস্তু স্থিরই দেখি। আবার, গতিশীল বস্তুতে মনকে যোগ করিয়া দিয়া মন গতিবিশিষ্ট হইলেও স্থির দেখি। যখন আমি স্থির থাকিয়া গতিবিশিষ্ট বস্তু বুঝি, তখন আমি গতি বুঝি; অথবা, স্থির পদার্থে স্থির ধারণা রাখিতে পারিলে, আমার গতি অনুভব

করিতে পারি। ইহা ভিন্ন জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তু অনুরূপ হইয়া জ্ঞেয় বস্তু ভুল বুঝা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। জ্ঞান সমস্ত ব্যাপারেই স্বীয় জ্ঞানানুরূপ বুঝে ; সুতরাং নিজ বুঝ্ ভুল বুঝা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। কারণ, ভুল যে বুঝি তাহাও নিজের জ্ঞান দিয়া বুঝি ; কাজেই নিজের ভ্রান্ত অবস্থায় অভ্রান্ত অবস্থাকেই ভুল বুঝিব। জ্ঞান যখন স্বরূপে বা ঠিক অবস্থায় থাকে তখনই বিরূপকে প্রকৃত ভাবে বিরূপ বুঝে।

আবার বিরূপ অবস্থা যখন জ্ঞানের পক্ষে ঠিক, তখন স্বরূপ অবস্থা বিরূপ। সুতরাং স্বরূপ বিরূপের নির্ণয় করা জ্ঞানের স্বরূপ বিরূপের নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত সম্ভবপর নয়। তাহা হইলে আমার ভ্রান্তি আমার বুঝা কোন কালেই সম্ভবপর না। এইজন্যই অনাদিকাল পর্য্যন্ত আমার ঠিক-বেঠিক অপরে নির্ণয় করিয়া আসিতেছে—আমি স্বীয় ঠিক-বেঠিক কোন কালেই নির্ণয় করিতে পারি নাই ও পারিব না। সেই অভ্রান্ত আর্য্য ঋষিদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই।

বাবা, আমাকে কথার কথায় রাখিয়া কথার কথা অনুরূপই বুঝাইতেছ। বর্ত্তমান সমাজে, বিশেষ কলিকাতায় আসিয়া কত লোকের কত কথা শুনি ; এই দশ কথা পাঁচ কথার মধ্যে আমার বাবার কথাও থাকুক, কথার কথায় আমাকে রাখাতে আমার প্রাণে একথা আসিতেছে। আজকাল কথাবার্ত্তায় ধর্ম্ম ; সুতরাং কথাবার্ত্তা না কহিয়া এ সময় নীরব থাকিয়া নীরব করা যাইবে না।

[(৫২)—জ]

আমরা বুঝ্‌টা নিয়া বুঝিব ও কার্য্য করিব—এই জ্ঞান প্রবল থাকিতে আমার বুঝ্‌ যে ভুল ইহা বুঝা কি সম্ভব ? যেহেতু বুঝ্‌ ভুল বুঝ্‌লে, ভুল বুদ্ধিতে কোন কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না। যখনই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করি ও বুঝি বলিয়া বুঝি, তখন বুঝে ভুল নাই, বুঝ্‌ ঠিক ; এই ঠিক্ বুঝের বিপরীত বিষয়ে আসক্তি বা অনুকূল বুদ্ধি কোন ক্রমেই সম্ভব না। এই হেতুই নিজ বুঝের বিপরীতটা বিপরীতই বুঝি, ঠিক্ হইলেও বেঠিক্ বুঝি। এই ভ্রান্ত বুদ্ধি সংসার জ্ঞানকে দৃঢ় করে—যৎ সংসার-জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা বশে ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য, এবং যে আকাঙ্ক্ষা সংসারের কোন ব্যাপার দ্বারা নিবৃত্ত হয় না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পায় ; নিজের বুঝ্‌ ঠিক বুঝাতেই এই ভুল ও মোহকে ভুল ও মোহ বলিয়া বুঝি না।

আবার দেখিতে পাই যে ভাষা বা সংজ্ঞা-শব্দ আমার বুঝ্‌ ঠিক রাখিবার জন্য ব্যবহার করিতেছি, সেই ভাষাও 'আমি'র কল্পনা—যে আমি নিজের বুঝ্‌মত বুঝ্‌কে ঠিক রাখিতে না পারিয়া ভাষা বা সংজ্ঞার কল্পনা করিতেছি। এই ভাষা বা সংজ্ঞা আমার বেঠিক অবস্থায়ই কল্পনা করিতে হইয়াছে, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। যেহেতু আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞান কিছুতেই আমার জ্ঞানে স্থির না থাকায় স্থির রাখিবার উপায় স্বরূপ ভাষা কল্পনা করিয়াছি। এক পক্ষে ভাষাটাও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত ব্যাপার নয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বীয় জ্ঞানের বিষয় ঠিক রাখিতে পারে না বলিয়াই স্মৃতি বা সংস্কার বদ্ধ হওয়ার জন্য ভাষা কল্পনা করিয়াছে।

স্বরূপ অবস্থা অভাবে কল্পনা কল্পনারূপে ধারণা না হইয়া ঠিক ধারণা করাতেই কল্পনাকেই ঠিক বুঝিতেছি, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং এই ঠিক বুঝার দরুণেই সর্ব্ব ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়ই এক বাক্যের দ্বারাই বুঝি। এখন এই বাক্যেতে বা বাক্য দ্বারা বুঝি না, বা কল্পনা করিয়া বুঝি, ইহা না বুঝা পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি ইহা বুঝান আমার পক্ষে অসম্ভব। আর এই কল্পনা না করিলে আমার বুঝ্ কিরূপ থাকিত তাহা আমার পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, দেখিতেছি এমন কত বস্তু দেখিয়াছি যাহার নাম জানি না, কিছু দিন পরে তাহা আর মনে থাকে না। তাহা হইলেই যে সব বস্তুর সংজ্ঞা দ্বারা স্মৃতি থাকায় আমি এখন যে অবস্থাপন্ন, এই সংজ্ঞা স্মৃতি অভাবে বর্ত্তমান জ্ঞান নিয়া যদি আমি বর্ত্তমান থাকিতাম তাহাতে যে কিরূপ থাকিতাম তাহা এই জ্ঞান দিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব। তাহা হইলে বলিতে হয় আমার স্বাভাবিক প্রকৃত স্বরূপ আমার পক্ষে অজ্ঞেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন যে জগতের অপরাপর প্রাণী কি বস্তু, বিষয় দেখি, তদ্দর্শনে আমার অবস্থার পার্থক্য নিরূপণ করিতে গেলেও সংজ্ঞা জ্ঞান বাদ দিয়া করি না। তাহা হইলেই যে সব প্রাণীতে সংজ্ঞা নাই তাহাদের অবস্থাও যে আমরা ঠিক বুঝি, তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। যেহেতু যখন আমার নিজের অবস্থাই আমি ঠিক বুঝি না তখন অপর প্রাণীকে যে ঠিক বুঝি তাহা কিছুতেই সম্ভব না। কেননা মাদক দ্রব্য সেবনে মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে প্রত্যেক

বস্তুকেই বিকৃত দেখিয়া থাকি। এজন্য ঋষিরা ভূয়ো ভূয়োঃ নাম আর রূপ বাদ দিতে বলিয়াছেন। বর্ত্তমান জ্ঞানে নাম না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকে না মত জ্ঞান হয়। আমি নাম বা উপাধি জ্ঞান রহিত অবস্থাতেই এই জগতে প্রকাশ পাইয়াছি এবং নাম বা সংজ্ঞা-বিহীন অনেক প্রাণীই জগতে বর্ত্তমান আছে, অথচ আমার জ্ঞানে আমার অনুভব হইতেছে যে সংজ্ঞা না থাকিলে আমার বিশেষ অসুবিধা হইত। সে পক্ষেও দেখা যায় যে আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার এত দৃঢ় যে, এই জগৎ আমার জ্ঞানের বিষয় হওয়াই একমাত্র প্রার্থনীয়; নচেৎ এই জগৎ ভুল হইলে আমার পক্ষে সর্ব্বনাশ বুঝি এবং সংজ্ঞা বাদ দিয়া চিন্তা করিতে গেলেই আমি সংজ্ঞা শূন্য হই কেন? যাহা হউক তোমাকে কোন এক সময়ে একত্র না পাইলে আর আমার বলিবার বিষয় শেষ হইবে না।

[(৫৩)—জ]

কলিকাতায়···বাবু বিশেষ বাহাদুরীর জন্য আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে নিয়া যান এবং যাহাদের কাছে নেন তাহারাও বাহাদুর; কাজেই আমার ভুল জ্ঞানে আর তাদৃশ সুবিধা হয় নাই। প্রশ্ন মতে এক কথায় এক কথার উত্তর দিতে আমি শিখি নাই। আর কথার উত্তর কথায় যা হইয়া থাকে, তাই হয় এবং হইবে। ভাষা দ্বারা সকলি বুঝি, বুঝের বিষয় ভাষায় সকলই বুঝাই; অথচ ক্ষুৎ-পিপাসা, সুখ-দুঃখের বিষয় ভাষায় নিবৃত্তি হয় না। আমাদের জ্ঞানের অদৃশ্য সমস্তই, এমন কি আমি আমার জ্ঞানের

অদৃশ্য। তবে 'I' (আই) বা 'আমি' বলিয়াই যখন আমাকে আমি পূর্ণ মাত্রায় বুঝি বলিয়াই বুঝি, ও আমাকে তালাস করিতে গেলে প্রকৃত আমি কি খুঁজিয়া পাই না ও বুঝেও বুঝে না, সে স্থলে ভাষায় যাহা বুঝি স্বরূপ বুঝাবুঝি, তাহা কোন সময়ে টিকে না।

অভাবের অভাব করিবার জন্যই জগতের সমস্ত প্রাণী ব্যস্ত; অভাবের অভাব করিতে যাহা প্রকৃত উপায় বুঝে, তাহাতে অভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; তথাপি বুঝের ভুল বা বিরাম হইতেছে না। সেস্থলে কথার কথায় বুঝাইয়া বুঝ্ বিরাম করান কিছুতেই সম্ভব না। ব্রাহ্ম সমাজে আমি কোন সাধন মার্গের বা তত্ত্ব জ্ঞানের কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে আলাপ করা আবশ্যক মনে করি নাই।

[(৫৪)—ভ]

যে বুঝ্ স্বীয় কল্পিত কল্পনায় নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে ঠিক বুঝিতেছে, সেই আত্ম বুঝ্ ভুল বুঝিতে ও সংস্কার বাদ দিয়া নিজের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে কে রাজী হইবে? যাহা বুঝিলে বুঝ্ই থাকে না, তাহা বুঝিতে বুঝ্ রাজী নয়। তবে যে গুরু বুঝের বিষয় হইলে তোমার প্রবন্ধ বুঝা যায়, সে গুরু বলিতে সকলে কাণে হাত দেয়। বাবা, নিজে বুঝিয়াই নিজের বুঝ্‌কে অভাব কর, তাহা হইলেই জগৎ আর থাকিবে না; জগৎকে বুঝাইতেও স্পৃহা থাকিবে না। এই বুঝাবুঝির মামলাতে আট্‌কিয়া আমাকেও তোমার প্রবন্ধের লিখিত সয়তান বুঝে যে ভুলায় তাহা মনে হয়।

গুরু ভিন্ন অন্য বুঝাবুঝির জিনিস নাই—যাহা বুঝিতে গিয়া বুঝ্ আপনিই বিলোপ পায়—ভবের বাক্ বিতণ্ডা জল্পনা সব দূর হইয়া যায়। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব ভাব অতীত হয়; মায়ামোহের প্রবল তরঙ্গে সমুদ্র বক্ষে নিপতিত লোকের মত প্রতি তরঙ্গাঘাতে জলে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতে হয় না। কল্পনায় রসায়ন বিজ্ঞান কবিত্বের ছড়াছড়ি ভিন্ন আর কোন চিন্তারই উদ্রেক করায় না। যাঁহার চিন্তায় এসব চিন্তার অভাব হয়, সে চিন্তা যে দেশে বর্ত্তমানে বর্ব্বর বা মূর্খের চিন্তা বলিয়া উপহাসাস্পদ সেই দেশে 'জগতের' এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রবন্ধটি যে উপহাসাস্পদ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে তোমার বুঝে বুঝায় যে একথা অবশ্যই বুঝিবে। আমার বুঝেও এক সময় (অর্থাৎ হিমালয় হইতে নামিয়া আসিবার সময়) বুঝিতে হইবেই হইবে বুঝিয়াছিল। এত কাল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া এখন দেখি আমি নিজেই বেবুঝ্। সাধারণেই বুঝিবে বলিয়া যে বুঝিয়াছিলাম তাহা সবই ভুল। কল্পনায় সুখ কল্পনা করিয়া কত কি মহান্ অনর্থ ঘটিতেছে! তথাপি মানুষের কল্পিত সুখ-পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছে না। সেই সব ব্যক্তিকে স্বরূপ সুখের উপদেশ দিলে শুনিবে কেন?

[(৫৫)—সু, ন]

বাবা, বুঝান যে বুদ্ধির কার্য্য নয় তাহা বোধ হয় এত দিন বুঝ নাই; আজ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বুদ্ধি নির্দ্দেশক, বুদ্ধি ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়া উদ্দীপক নহে। বুদ্ধির নির্দ্দেশানুরূপ ক্রিয়া অপরের দেহে না জন্মান পর্য্যন্ত অথবা ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়া উদ্দীপনা না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝ্ একটা বোঝা মাত্র। সেই বোঝা বহন করিয়া কিছুদিন ক্লিষ্ট

হওয়ার পরে মাথা হইতে ফেলিয়া দেয়। যে অবস্থায়, অথবা যৎ ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়া দেহে যত কাল সঞ্চার না হয় তত কাল তৎ বিষয়ক বুঝা, বুঝিয়াছি মনে করিলেই বিপত্তি ও বুঝের মধ্যে নানা প্রকার আপত্তি উপস্থিত হয়। বিশেষ, যাহা বুঝের বিষয়ই নয়, তাহা বুঝের দ্বারা বুঝিতে গিয়া সম্পূর্ণ ভুল বুঝা যায়। অতএব বুঝাবুঝিটা বাদ দিয়া যা বলি তাই করিতে রাজী আছ কি?

এখন এম্-এ পড়িতে বলিতেছি, পড়; পূর্ব্বাপর ভাল-মন্দ বিচারের দরকার কি? যখনই আদেশ বা বাক্যে আপত্তি আসে তখনই স্বীকার করিতে হইবে নিজের মত প্রবল। যখন নিজের মত প্রবল তখন নিজানুরূপ সকলই নিজের মধ্যে—আমি গুরুতে কৈ? আমরা স্ব স্ব মতে অনেক সময়ে অপরের উপর নির্ভর করি অর্থাৎ আমার সকলই অপরের উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ এই দেহ আমির প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সুখই অন্য বস্তুকে অপেক্ষা করে; কিন্তু অনেক সময়ে আমরা মনে করিয়া থাকি, আমি অন্যের হইয়া কাজ করিয়া থাকি—এটা ভ্রম। যখন আমার মতামত একেবারে পরিত্যাগ হইবে, তখন আমি অন্যের হইতে পারি এবং অন্যের হইয়া কাজ করিতে পারি। আমার মতামত ত্যাগের মহৌষধ পূর্ব্বাপর বিবেচনা শূন্য হইয়া অপরের বাক্যানুসারে চালিত হওয়া এবং অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা হইলেও স্বীয় মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরের কার্য্যানুরূপ কার্য্য করা। এতদ্ভিন্ন আমার আমিত্বের পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

তুমি বলিবে সমস্ত জগৎ ক্রিয়াময়, ক্রিয়ার অভাব বা পরিবর্ত্তন হইলে সকলেরই অভাব বা পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু সে সময়ে কোন বস্তুই

যদি আর ক্রিয়া ভিন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হয়, তবে এ-কথা ঠিক অর্থাৎ এক 'মূলমন্ত্র' করা ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না—তখন একথা ঠিক। কিন্তু যদি বিভিন্ন কার্য্য করা ও বিভিন্ন বিষয়ে অনুধ্যান থাকে, এ-অবস্থায় অপরের আদেশে আদিষ্ট হইয়া কার্য্য করিতে না পারিলে নিজের নিজত্ব ত্যাগ হইবে না। নিজের মধ্যে নিজত্বটা প্রবল থাকিতে আমার এ-কথা সুন্দররূপে বুঝা যায় না বলিয়া এ কথাটা আরও বিশেষ করিয়া লিখিতেছি। আমি নানা প্রকার কার্য্যই করিতেছি, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র মত বা অমত নাই অথবা ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই, সে অবস্থায় আমার তৎ তৎ কার্য্যে লাভালাভ জয়াজয়, ইহা কি সম্ভবপর? বিশেষ, যদাদেশে কর্ম্মগুলি নিষ্পন্ন করি, তাহাতে আমার বিশেষ স্থির নিশ্চলভাবে লক্ষ্য না থাকিলে আমি ইচ্ছা অনিচ্ছা বাদ দিয়া কর্ম্ম করিতে পারি না। আবার প্রতিনিয়ত আদেশ পালন অভ্যাস না করিলেও সে-ই আমার একমাত্র লক্ষ্য, ইহা দৃঢ় হইতে পারে না। বিচার, তর্ক, বিবেচনা, নিজের অভিমত প্রবল থাকিতেই আছে। যেখানেই মতামত, অন্য লক্ষ্য সেখানে আমি (গুরু) নাই।

সংসারে বিচার তর্কেও দেখা যায়, এমন কি, পরিমাপাদি দ্বারা পরিমাপ করিলে শেষ গুরু একটাই দাঁড়ায়। সেই একটা যখন আমি আমাকে বোধ করি তখনই আর গুরু খুঁজিয়া পাই না; খুঁজিবার ইচ্ছাও থাকে না। যেখানে গুরুর মতে আমি না, আমার মতে গুরু, তখনও আমি গুরু। গুরু অন্যত্র যাইতে চাহিলে যদি আপত্তি হয় তবে সে আপত্তি বিপত্তির কারণ।

গুরু যখন গুরু বুঝেন, তখন আর কিছু বুঝেন না; আর কিছু বুঝিলে গুরু থাকেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ অবস্থা তোমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ না হইলে কি প্রকারে ইন্দ্রিয় জ্ঞানে সত্য বলিয়া ধারণা করিবে তাহা আমি বুঝি না। গুরু যদি দূরে থাকিলেই দূরে থাকেন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেই অপ্রত্যক্ষ হন, তাহা হইলে, বাবা, গুরু প্রত্যক্ষ করা বড় শক্ত হইবে।

গুরু প্রকৃতই ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ পদার্থ, আত্মার প্রত্যক্ষ বস্তু। আত্মা অসীম অনন্ত, সুতরাং গুরু অপ্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। তবে যদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ গুরুতে তোমাদের তৃপ্তি-সাধন হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব পদার্থে গুরু রূপ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ কর। ইন্দ্রিয়ের বিকার বশতঃ যদিও ভিন্ন রূপ দেখ তাহা হইলে মনে কর যে, যখন যে অবস্থা দেখ সেই অবস্থায় তোমার দর্শনানুরূপ বিকাশ পাইতেছে। তাহা না হইলে নিরাময় হইবার ঔষধ নাই। এম্-এ.র পাঠ্য পুস্তকের প্রত্যেক বর্ণে এই এক বৎসর গুরু রূপ দেখ, ইহা গুরুর আদেশ। এই আদেশের বিরুদ্ধে যা'র স্বীয় মত প্রবল, সে নিশ্চয়ই গুরু হইতে দূরে পড়িবে। ইহাও বিশ্বাস করা উচিত যে, একদিন না একদিন তাহাকে গুরু হইতে অলক্ষিত ভাবে দূরে সরিয়া যাইতে হইবে।

গুরুর বাঁচা-মরা, সুখ-দুঃখ নিয়া এত ব্যাকুলতা কেন? প্রতি পত্রে লিখি ব্যাধি নাই, তবু ব্যাধির সংবাদের জন্য ব্যস্ততার কারণ

কি? গুরু ত ভারতে অনেক দিনই মরিয়া গিয়াছেন; না হইলে গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া শিষ্য মরে কেন?

[(৫৬)—স্থ].

মানুষে মানুষে যে পার্থক্য সে কি সংস্কারের ভেদ নয়? সংস্কার-রহিত আত্মা দেহ-মূলে সংস্কার বিশিষ্ট হয়। দেহ যে এই সংস্কারের কারণ তাহা দেহ-জ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া থাকা অবস্থা-দ্বারাই প্রমাণ হয়।

এই বর্ত্তমান জ্ঞান দিয়া বিচার করিতে গেলেই বর্ত্তমান জ্ঞানের ভেদ হইয়া বিচারেরও ভেদ হয় এবং ভেদ-জ্ঞানও এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগেই জন্মে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয় সঙ্গ হইবার পূর্ব্বে আত্মার জ্ঞান যেরূপ ছিল, ইন্দ্রিয় সঙ্গ হইয়া আত্মার সেই জ্ঞানের ভেদ হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। তবে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ দ্বারা আত্মার সংস্কার পরিবর্ত্তন হইতেছে ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান দৃঢ় হইতেছে; আত্মার আত্মস্বরূপ আর পূর্ব্ববৎ জ্ঞান হইতেছে না বরং বিরূপটাই ঠিক বলিয়া দৃঢ় ধারণা হইতেছে। এ অবস্থায় বুঝ্ দিয়া বুঝিয়া বুঝের পরিবর্ত্তন কিছুতেই সম্ভব নয়। কেবল এক সঙ্গই জীবের নিদানের উপায়; কারণ সংস্কারও সঙ্গ মূলে পরিবর্ত্তন হয়, ইহা আমরা রাতদিন দেখিয়া থাকি। কিন্তু সংস্কার মুলক জ্ঞান সংস্কারের বিপরীতকে বিপরীতই বুঝে। বুঝ্ সঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

আত্মার দ্বিত্ব বোধও সঙ্গ মূলে উৎপত্তি। জ্ঞানে দ্বিতীয় বুঝার নামই সঙ্গ; দ্বিতীয় অভাবে একটা সঙ্গ সম্ভব হয় না। তাহা হইলেই

দ্বিতীয় ভ্রান্তি আসিয়াই বুঝের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব বুঝ্ দিয়া বুঝাইতে গিয়া দ্বিতীয় বাদ দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়; কারণ দ্বিতীয় অভাবেই বুঝের অভাব হয়। এই বুঝ্, ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহাকে আমরা 'বুঝ্' বলিয়া বুঝিতেছি, সেই বুঝের কথা। তাহা হইলেই আমাদের বর্ত্তমান বুঝ্ বর্ত্তমান থাকিবে; স্বরূপ বুঝার আশা করা ভীষণ ভ্রান্তি। এইজন্যই বারংবার বলা হইতেছে যে বুঝাবুঝি বাদ দিয়া সঙ্গই আমাদের একমাত্র উপায়। সঙ্গ মূলে যাহা করায়, তাহার উপর আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। বুঝে বুঝিবার চেষ্টা করাতেই ভ্রান্তি বুঝায়; এই ভ্রম ত্যাগের জন্যই সঙ্গের আবশ্যক। বুঝ্ বাদ দিয়া সঙ্গ করিলে স্বরূপ জ্ঞান সম্ভব হয়, ইহা বর্ত্তমান বুঝে কিছুতেই বুঝিবে না; সেজন্য বাক্য ব্যয়ও নিষ্ফল। সঙ্গ স্পৃহা জন্মিলেই জীবের আর বিপদ আশঙ্কা থাকে না।

[(৫৭)—যো]

আত্মা আত্ম-স্বরূপে যখন অবস্থান করিতেন, তখন আত্মাতে দ্বিতীয় বোধ ছিল না। আত্মা যদি দ্বিতীয় জ্ঞান লইয়াই থাকিতেন অর্থাৎ দ্বিতীয় জ্ঞান যদি আত্মার আত্ম-স্বরূপ হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় বোধে অভাব রহিত একটা অবস্থা কিছুতেই সম্ভব হইত না। কেননা, দ্বিতীয় জ্ঞান-রহিত অবস্থা ভিন্ন, এ জ্ঞানে অভাব রহিত অবস্থা সম্ভব নয়। বিশেষ, দ্বিত্ব বোধেই দুইটা পদার্থের পরস্পর ভেদ থাকে। যে অংশে পৃথক থাকে, সে অংশে অভাবও থাকে; সুতরাং অভাব রহিত অবস্থা আত্মার পক্ষে কোন কালেই সম্ভব হয় না।

অভাব বিশিষ্ট অবস্থায় অভাবকে অভাব বুঝা কি সম্ভব ? বর্ত্তমান জ্ঞানেও যৎ পদার্থের যে স্বরূপ জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে তৎ স্বরূপে আর কোনও অভাব বোধ হয় না। কিন্তু যে পদার্থকে যৎ স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেছি, তৎ স্বরূপের মধ্যে কোন অংশ না থাকিলেই, অভাব বোধ করি। তাহা হইলে আত্মাতে যে স্বরূপ ছিল সেই স্বরূপের অভাব হইয়াই, অভাব বোধ জন্মিয়াছে। অতএব দ্বিত্ব জ্ঞান রহিত আত্মায় দ্বিত্ব বোধ আসিয়াই অভাব বোধ জন্মিয়াছে। দ্বিত্ব জ্ঞান রহিত আত্মায় দ্বিত্ব বোধটা আত্মার পক্ষে ভ্রান্তি বৈ আর কি ? অপর কিছুই হইতে পারে না।

অশরীরী অবস্থায় অথবা স্থূল শরীর বিহীন অবস্থায় আত্মা যেরূপ ছিল, স্থূল শরীর বিশিষ্ট হইয়াও সেইরূপ আছে, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। কেননা, স্থূল শরীরের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের যন্ত্র গুলি স্থূল শরীর অভাবে স্থূল ভাবে থাকে না ; সুতরাং ভ্রান্তিও স্থূল রূপে বর্ত্তমান থাকে না। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদেও ভ্রান্তির ভেদ হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আবার স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি যোগে আত্মায় যে সংস্কারের বা ভ্রান্তির পার্থক্য হইতেছে, পর পর অবস্থায় ভ্রান্তির ভেদে আত্মার স্বরূপ বোধেরও ইতর বিশেষ হইতেছে। তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ আত্মা যত বার স্থূল শরীর গ্রহণ করিতেছে, ততই তাহার ভ্রমের মাত্রা বাড়িতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং স্বরূপ জ্ঞান আত্মার পক্ষে বিরূপ বলিয়া জ্ঞান হওয়াই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় জ্ঞানের উপদেশে কোন ক্রমেই ফল হওয়ার আশা করা যায় না।

তবে জ্ঞান যে সঙ্গ মূলে পরিবর্ত্তন হয়, সেই সঙ্গই জীবের একমাত্র উপায়। এ ঘোর কলিতে অর্থাৎ বহুবার এই দেহের সংস্কার লইয়া

যে দেহী বর্ত্তমান সময়ে বর্ত্তমান, তাহার পক্ষে সঙ্গই একমাত্র উপায়। আত্মা সর্ব্ব অবস্থায়ই ঠিক বুঝে ; ঐ ঠিক বুঝ্ সঙ্গ মূলেই। সঙ্গের পরিবর্ত্তনেই ঠিক বেঠিকের পরিবর্ত্তন রাত দিন ঘটিতেছে। এ স্থলে সঙ্গ ভিন্ন আর অন্য উপায় কি হইতে পারে ?

"বুঝিয়া-বুঝিব" এ কথাটাই ভুল ; কেন না, আত্ম-স্বরূপে বোধ্য বস্তু নাই। বুঝিয়া বুঝিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ভ্রান্তি বশেই ; সুতরাং ভ্রম দ্বারা বা ভ্রম স্থির থাকে যাহাতে তদুপায়ে, ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টাও ভ্রান্তি, তাই বলি ভ্রান্তি ত্যাগের একমাত্র উপায় গুরু চিন্তা ও গুরু সঙ্গ।

গুরু গরু হইলে তৎ সঙ্গে ভ্রম আরও বৃদ্ধি হইবে। এজন্য আমার দ্বারা তোমার কিছুই হইল না ; তুমি সদ্গুরুর অনুসন্ধান কর। অথবা নিজে নিজকে তালাস করিয়া দেখ যে গুরু ভিন্ন অন্য চিন্তা বা সঙ্গের বিষয় তোমার কিছু আছে কি না। যদি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে যে বস্তু তোমার চিন্তায় বা ইন্দ্রিয় সঙ্গে আছে, তদ্বস্তু উপর্য্যুপরি দেহাদি গ্রহণের পরে আত্মায় যে সংস্কার জন্মাইয়াছে সেই সংস্কার অনুরূপ। আমি বা গুরু তোমার সংস্কার অনুরূপ নই বরং তোমার সংস্কারের বিপরীত। দুইটা বস্তুর মধ্যে, আমার সংস্কারানুরূপ বস্তুতেই আসক্তি হওয়া সম্ভব, না সংস্কারের বিপরীত বস্তুতে আসক্তি সম্ভব ? আমার সংস্কারানুরূপ বস্তুকেই ঠিক বুঝিব, না সংস্কারের বিপরীত বস্তুকেই ঠিক বুঝিব ? আমার সংস্কারের অনুরূপ পদার্থের অনুধ্যান আমার পক্ষে স্বাভাবিক, না আমার সংস্কারের বিপরীত বস্তু অনুধ্যান স্বাভাবিক ? এস্থলে ঋষিরা এই বিধি করিয়াছেন যে সংস্কারের বিপরীত বস্তুতে আসক্তি জন্মাইতে হইলে, সংস্কারের

অনুরূপ পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ করাইয়া সংস্কারের বিপরীত বস্তু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ করাইয়া, ক্রমে তাহাতে আসক্তি জন্মান। তদ্ভিন্ন সংস্কারের বিপরীত বস্তুতে আসক্তি জন্মিতেই পারে না। তুমি আমার, আমি তোমার না হওয়া পর্য্যন্ত "বন্ধু" শব্দটা কেবল বিড়ম্বনার কারণ হইবে। আত্মা জন্মার্জ্জিত সংস্কার অনুরূপই ঠিক বুঝিবে; জন্মার্জ্জিত সংস্কার আত্মার স্বরূপ পক্ষে ভ্রান্তি। আত্মার জন্ম-মৃত্যু-দেহাদি কিছুই নাই। আত্মা অসঙ্গ, নিস্পৃহ, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য ইত্যাদি। কেবল দেহ সঙ্গেই আত্মার যত ইতি পরিবর্ত্তন ও ভ্রান্তি। ইতি—

[(৫৮)—স্ব]

সর্ব্বদা উপদেশ পূর্ণ চিঠি চাও। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই রাত্রিদিন জীবকে উপদেশ দিতেছে; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপদেশ শুনে কৈ? প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারাই জ্ঞানে দুইটি বিপরীত অবস্থা জ্ঞান হইতেছে। চক্ষু দ্বারা আলো ও অন্ধকার, স্পর্শ দ্বারা উষ্ণত্ব ও শীতলত্ব, শ্রবণ দ্বারা শ্রুতিমধুর ও কর্কশ, নাসিকা দ্বারা দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ, জিহ্বা দ্বারা সুস্বাদ ও বিস্বাদ। আমরা আমাদের ইচ্ছানুরূপ উভয়টার মধ্যে একটা আবশ্যক মনে করি এবং তদবস্থারই অনুধ্যান চিন্তা করি। জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইতেছে; বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য এ অবস্থা চতুষ্টয় ভেদও জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে; এই সকলের মধ্যে যেটা আমার জ্ঞানে সুখের বলিয়া কল্পিত হয়, অথবা দেহের স্বভাবে সুখের বলিয়া বুঝি সেইটাই গ্রহণ করি।

শরীরের তাপের পরিমাণ বাড়িলে শীতলতা অনুভব করি; গরম কালেও লেপ দরকার মনে করি; আবার শীতকালেও জ্বালা অনুভব করি। দেহের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইলেই সুখের বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয়; তাহা হইলে দেখা যায় যে সুখের একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা অবস্থা নাই। অথচ আত্মা নিরবচ্ছিন্ন নির্দ্দিষ্ট সুখের জন্য লালায়িত; ইহা দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণ হইতেছে যে নির্দ্দিষ্ট সুখের বিষয় আছে।

বুঝে এক সময়ে যাহা অনুকূল বুঝায়, আবার সময়ান্তরে তাহাকেই বিপরীত বুঝায়; সুতরাং এই বুঝাবুঝির কোন মূল্য নাই। তথাপি বুঝের উপর দৃঢ় বিশ্বাস; বুঝের পরিবর্ত্তন ভিন্ন বুঝাইয়া কি হইবে? বুঝের পরিবর্ত্তন সঙ্গ ভিন্ন অন্য উপায়ে হয় না, হইবেও না। যদি বিপরীত সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া গুরুর সঙ্গ কেহ করিতে পারে তাহা হইলে হইবার আশা আছে, নচেৎ নয়, ইহা আমি নিশ্চয় বুঝিয়া এক রকম নিশ্চিন্ত হইয়াছি। চিন্তা, অনুধ্যান ও সঙ্গের ফল ব্যতীত আমার আমিও নয়; সুতরাং সঙ্গ বাদ দিয়া অন্য চেষ্টা করিলে কি হইবে?

ক্রমে পুনঃ পুনঃ দেহ লইয়া দেহের সঙ্গমূলে জ্ঞানের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, জ্ঞান তাহা ঠিক বুঝে। অন্যের বুঝে তাহার কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হয় না। প্রত্যেকের বুঝই প্রত্যেকের সঙ্গ অনুরূপ, সুতরাং সঙ্গের পার্থক্যে বুঝের ভেদ জগতে আছে ও থাকিবে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ইয়ুরোপীয়দের সঙ্গ মূলে সামান্য পার্থিব সুখের বিষয় লইয়া কামড়াকামড়ির বুদ্ধি আসিয়াছে।

যে ভারত রাজ-ভক্তি, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, গুরু-ভক্তি ইত্যাদির আকর বা আধার ছিল, সেই ভারতে কুকুরের মত পার্থিব সুখের লালসা দিন দিন বাড়িতেছে। ইতি

[(৫৯)—যো, এ]

এতকাল অতিবাহিত করিলাম, নিজের ও পরের ভিতর তালাস করিয়া দেখিলাম, বুঝ্ কিছুতেই থামিবে না ও শুনিবে না। বুঝ্ না বুঝিয়াও নীরব হইবে না। বুঝ্ যে বুঝে না, না বুঝাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। বোধ্য বিষয় কিছু না থাকিলে বুঝ্ থাকে কোথায়? কারণ, বোধ্য বিষয় বাদ দিলে বুঝ্কেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবেই বোধ্য বিষয় মূলেই বুঝ্; ইন্দ্রিয় জ্ঞান বর্ত্তমানে বোধ্য বিষয় বাদ দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই বোধ্য বিষয় দ্বারা বুঝ্কে নীরব না রাখিয়া আর উপায় নাই। তবেই এমন বোধ্য বিষয় চাই, যাহাতে বুঝ্ দ্বিতীয় না বুঝে। সেই বোধ্য বিষয় ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় হইলে, দ্বিতীয় বোধ রোধ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারাই দ্বিত্ব বোধ জন্মে; এস্থলে আমিই আমার বোধ্য বিষয় না হইলে, ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাব হইবার কোনই আশা নাই। আমি আমার উৎপত্তি স্থানে না গিয়া, আমার স্বরূপ মাঝে কোন স্থানে বুঝিতে গেলেই, আমাকে আমি সম্যক্ বুঝি না।

আমার বোধ বা জ্ঞান দ্বিদলে হইতেছে; সুতরাং দ্বিদলে যাইবার উপায় যে গুরু চিন্তা তাই একমাত্র আমার উপায়।

ঐ উপায় অবলম্বনে ইন্দ্রিয়গুলি সকলই বিরোধী। ইন্দ্রিয়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া গুরু বুঝা আবশ্যক; গুরুকে ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া বুঝিতে গেলেই গুরুকে গুরু অনুরূপ না বুঝিয়া ইন্দ্রিয়ানুরূপ বুঝিব। ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহা বুঝায় তাহার মূলেই বুঝ্ পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং গুরুটাও পরিবর্ত্তনশীল। সর্ব্ব সময় এক অবস্থা এক রূপ বুঝা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ বুঝিলে, পূর্ব্ব বুঝের সহিত তুলনায় পরের বুঝে যে পার্থক্য তাহাতে ভাল-মন্দ বিচার আসিবেই ও রুচির পার্থক্যে আসক্তি অনাসক্তির তারতম্য ঘটিবেই। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের বুঝ্ বাদ দিয়া না বুঝিলে আত্ম-স্বরূপ বা গুরু বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়।

যত কিছু মারামারি বুঝ্ লইয়া; বুঝের মারামারি শেষ হয় দ্বিদলে গিয়া, সেই দ্বিদলে ভিন্ন গুরু চিন্তা শাস্ত্রে নিষেধ। অপর আর এক বিধি ব্যাসদেব ভাগবত শাস্ত্রে করিয়া গিয়াছেন। স্থূল ইন্দ্রিয়যোগে গুরু বুঝিতে হইলে গুরুর স্থূল দেহে সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুলিকে বদ্ধ রাখিয়া অপর বুঝ্ বাদ দিয়া কেবল গুরু বুঝিতে পারিলে অপেক্ষার বিষয় থাকে না বলিয়াই অপেক্ষারহিত এক বুঝ্ সম্ভব। তদবস্থায় আপেক্ষিক জ্ঞান জাত ঘৃণা-লজ্জাদি অষ্ট পাশ থাকা কিছুতেই সম্ভব নয় এবং তদবস্থায় কাম-কামনা থাকাও সম্ভব নয়। তাহারই নাম ভাগবতের মধুর প্রেম! এই দুই ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অধিকারী ভেদে এই দুইটার একটা অবলম্বন করিতে, কোন অবস্থায়ই দুই ব্যতীত তিন নাই।

দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দুই লইয়া অনন্ত জগৎ; এই দুইএরই

স্মৃতি মূলে বহু ; সুতরাং অপর স্মৃতি বর্জ্জন না করিয়া স্বরূপ চিন্তাই সম্ভব নয়। মন যুগপৎ দুইটা ধারণা করিতে পারে না ; একটাই ধারণা করে কিন্তু "বহু ধারণা করি" ইহা ভ্রমে বুঝি। সুতরাং ভ্রম বর্জ্জন ভিন্ন স্বরূপ জ্ঞান সম্ভব নয়। এই ভ্রমাত্মক বুঝের অপর পারে কে, তাহা যে কেবল এক বুঝিয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায়। এজন্য তত্ত্ব জ্ঞানী গুরুর অনুসরণ আবশ্যক। অথবা ব্রজ গোপী বা ব্রজ রাখালের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায়। ইহা ভিন্ন অপরের পরামর্শ লইলেই ভুলে পড়িতে হইবে।

তোমার পূর্ব্বাপর মান-সম্মান, ভাল-মন্দ বিচার আছে ; আমি ভাল-মন্দ বিচার-রহিত, অসামাজিক। আমি তোমাকে ভিন্ন অন্য বুঝি না ; তোমার বুঝিবার বহু আছে। আমি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ভেল্‌কী বিশ্বাস করি না, তোমার জ্ঞানে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত কিছুই নাই। আমি সামান্য কিছু খাইলেই পেট অসুখ করে, তুমি গণ্ডেপিণ্ডে আকণ্ঠ ভোজন করিলেও কিছু হয় না। সর্ব্বাংশে দুই জন বিপরীত অথচ ভাষায় বন্ধু, এ বন্ধুত্বের স্থায়ীত্ব কত কাল ? সন্তুষ্ট হইয়া ভালবাসিবে, এ প্রত্যাশা আমি করি না। বিরক্তির চক্ষে দেখিয়াও, আমাকে চক্ষের আড়াল না কর এই আমার শেষ প্রার্থনা। এমন কি, আমি যে তোমাকে ভালবাসি, তাহাও তুমি ভালবাস না। প্রকৃতি বিরুদ্ধ ব্যক্তির ভালবাসাও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। নচেৎ প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া কোন জিনিস নাই। আমি তোমার স্পর্শে গুরু হইতে বিযুক্ত হইয়া আবার গুরুতে যে সংযোগ হয়, এজন্য স্পর্শটা এক রকমে সুখ বোধ করি। তুমি আমার স্পর্শে তোমার জ্ঞানের অতীতে গিয়া তোমার স্পর্শানুরূপ স্পর্শ হইয়া জ্বালা বোধ কর। বন্ধু, কথাটা একটু শক্ত হইল। কারণ,

শীতে সঙ্কুচিত অবস্থাটাকেও আমরা কষ্টকর মনে করি, আবার গতির সীমা অতীত করিয়া গতি হইলেও যাতনা মনে করি, যথা অগ্নি স্পর্শ। আমি ত তোমার প্রকৃতি অনুরূপ কোন সুখ বিধান করিতেই অধিকারী নই। এজন্যই আমার প্রতি পদে আতঙ্ক। আমি তোমা হইতে তফাৎ হইলে তোমার সুখের বৈ আতঙ্কের বিষয় কি আছে ? আর যদি বল যে তুমি আমার সব ব্যবহারই প্রিয় মনে কর ও ভালবাস তাহা হইলে দূরে থাকাটা কি ভালবাস ? সে পক্ষেও আমি দূরে থাকিলে তুমি কষ্ট পাও একথা মনে আসিয়া, আমার সুখে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে ওর মধ্যে একটু আনন্দ এই আছে যে আমার বন্ধু আছে। আমার বন্ধু থাকিলে নিশ্চয় একদিন ভারতের বন্ধুর অভাব দূর হইবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধ অবস্থা যাহার প্রিয়, জগতে তাহার অপ্রিয় ব্যাপারই থাকিতে পারে না। সুতরাং আমার বন্ধু ভারতবন্ধু বা জগৎবন্ধু ইহা ভাবিয়া আমি আর আমার মধ্যে আনন্দের স্থান করিতে পারি না। আমার চরম উদ্দেশ্য এই শেষ কথা ; রাগ কর, মার ধর আমাকে ভুলিয়া যাইও না। তাহা হইলে আমি কেবল এই গাহিব—"গুরু চিন্তামণি কর চিন্তা বিরলে বসে, মন তুই র'লি কার আশে, ওরে এদেশে তোর বন্ধু নাইরে চল সে দেশে।"

[(৬০)—জ]

কোথাও বিষয়ীর বা বিষয়ে শান্তি নাই জানি ; তথাপি দেহের ভ্রান্তিতে জীব শান্তি খোঁজে। যে দেহ-মোহ বশতঃ আত্মা বুঝিতেছেন কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য রিপু ছয়টা আত্মার, দেহ জ্ঞান পরিশূন্য অবস্থায় এই বৃত্তিগুলি থাকা কি সম্ভব ? দেহের দ্বারাই

দেহজ মোহ জ্ঞানে জ্ঞান হইয়াও মোহ বলিয়া আত্মা বুঝে না। তাহার কারণ দেহ-জ্ঞানে মোহ ভিন্ন অন্য অবস্থাই সম্ভব নয়। দেহের যে অঙ্গ দ্বারা যে জ্ঞান হইতেছে তৎ জ্ঞান তদঙ্গ ভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়, ইহাও জ্ঞান দিতেছে। তথাপিও বুঝি না দেহই এই মোহের কারণ। বুঝা-বুঝিটাও দেহ মূলে, তাই বুঝ্ থাকিতে মোহ কিছুতেই ঘুচিবে না। কেবল দেহ লইয়া থাকা অবস্থায় গুরুই চিন্তার বিষয় না হইলে জীবের আর উপায় নাই।

(৬১)

সঙ্গের প্রভাব জীব কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না; কারণ সঙ্গ ভিন্ন জ্ঞানের কোন অস্তিত্ব নাই। বোধ্য বিষয় না থাকিলে বোধের কোনও অস্তিত্ব থাকে না; সুতরাং বোধ যে বোধ্য বিষয় অনুরূপ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। চিন্তা-অনুধ্যান বিপরীত রাখিয়া ভগবৎ জ্ঞান লাভ কেবল বিড়ম্বনা। প্রকৃতির সঙ্গ অলক্ষিতভাবে প্রতিনিয়তই হইতেছে, অথচ সে প্রণবাত্মক বা আকুঞ্চনের দিকের সঙ্গ অভাব। আমার বর্ত্তমান ভাবও সঙ্গ অনুরূপ; সুতরাং সঙ্গ বাদ দিয়া আমার আমিরই অস্তিত্ব নাই। আমার সঙ্গ অনুরূপই আমার আমির অস্তিত্ব এবং আমি অনুরূপই আমার বুঝ্। বুঝের উপর নির্ভর না করিয়া সঙ্গের উপরই নির্ভর করা কর্ত্তব্য।

[(৬২)—প, প্র]

আমার মা বাবা নাই এ কথা কিছুতেই আমি প্রমাণ করিতে

দিব না। আত্মা কোন্ বাবারে চায়, একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে, আত্মার চাওয়া অবস্থায় গুরু ভিন্ন অন্য কিছুই চাওয়ার বিষয় হইতে পারে না। আর আর যাহা, চাওয়ার অবস্থায় চাহিতেছে সে কেবল দেহের সংযোগে, বা দেহ-জ্ঞানেই চাওয়া; দেহ জ্ঞান পরিশূন্য অবস্থায় কেবল গুরু ভিন্ন অন্য কিছুই চাওয়ার বিষয় হইতে পারে না, দেহ জ্ঞান পরিশূন্য অবস্থায় দেহের চাওয়ার কিছুই থাকে না; সুষুপ্তিই ইহা প্রমাণ করিতেছে। সুষুপ্তি অবস্থায় কেবল আকর্ষণ ও বিক্ষেপণই থাকে—একটা গুরুর দিকেই গুরু টানেন; আর একটা আমাদের দেহের সংস্কার থাকায় নীচের দিকে গতি হইয়া থাকে এবং দেহের সংস্কারের ফলে নীচের দিকে নামিয়া আসি। বাহ্য জগতের জ্ঞান শূন্য হইলেই আপনা আপনিই নীচের দিকের গতি রোধ হইয়া যায়। এই বাহ্য জগতের সংস্কার বা চিন্তা গুরু সঙ্গ ভিন্ন অতীত হইবে না। যাহা হউক আমি কোলে স্থান পাইলেই হয়; হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই।

[(৬৩)—প]

সর্ব্বদা নিজের সন্ধ্যা বন্দনাদির সময় বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। সাধন করিতে শরীরের ধর্ম্ম-বাধা দেয়, সেইজন্য পুরুষকার বা বল প্রয়োগ ভিন্ন অভ্যাস হইবে না। দেহের ধর্ম্মে আত্মার বিপরীত জ্ঞানই জন্মাইতেছে। দেহ যে মোহের কারণ, তাহা জ্ঞান হওয়ার জন্যই আত্মা দেহ লইয়াছে। এখন দেহ দ্বারা মোহ না বুঝিয়া দেহের ক্রিয়ানুরূপ ঠিক বুঝিলে মোহেতেই থাকিতে হইবে। ইতি—

[(৬৪)—প. প্র]

ক্রমে "প" কয়েক পত্রে উপদেশপূর্ণ চিঠি চাহিতেছে। আত্মা দেহ ধারণের পূর্ব্বে কিরূপ অবস্থাপন্ন ছিল এবং সে কি বা আবশ্যক বোধ করিয়াছে, কিসের অভাবেই বা অভাব বোধ করিয়া এই দেহ লইয়াছে, এই দেহ দ্বারা সেই অভাবপূরণ সম্ভব কি অসম্ভব তাহারই বা কি বুঝিয়াছে? আত্মা যে পর্য্যন্ত আত্ম-স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম, সে পর্য্যন্ত তাহার অভাব কি করিয়া বুঝিবে? এই দেহই আত্মার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়, দেহের বাহ্য আবরণ ভিন্ন দেহের অভ্যন্তর দেখে না। দেহের ভিতরে ক্রিয়ার পার্থক্য হইয়া যখন দেহের উপরিভাগে বা দেহেতে ব্যাধি আদি প্রকাশ পায়, তখন ব্যাধি বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে ক্রিয়ার কি পার্থক্য হইয়া ব্যাধি হয় তাহা বুঝা যায় না। সেইরূপ দেহের অভ্যন্তরে আত্মারাম কি অবস্থায় কি জন্য কি করিতেছে কিছুই বুঝি না। কেবল বাহ্য দেহের স্পন্দন ও সঞ্চালনাদি দেখিয়া আত্মা-রামের অভিপ্রায় ও কার্য্য বুঝি।

এই সমস্ত স্পন্দনাদি ও কার্য্য, বাহ্য জগতের সহিত দেহের সম্বন্ধ যে পরিমাণে, সেই পরিমাণে স্পন্দনাদিরও পার্থক্য আছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যোগে বাহ্য জগতের সহিত দেহীর দেহযোগে যেরূপ সম্বন্ধ হইতেছে, আত্মা সেইরূপ বাহ্য জগৎ বুঝিতেছে ও সেই বুঝ্ অনুসারেই আবশ্যক বা প্রয়োজন বুঝিতেছে। আত্মার দেহাতীত অবস্থায় কি প্রয়োজন ছিল তাহা দেহ জ্ঞান ও দেহ সংস্কার বর্ত্তমান রাখিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না। কেননা যে স্পর্শ সুখ দেহযোগে আত্মারাম বুঝিতেছে, দেহ অভাবে দেহ অনুরূপ সে স্পর্শ সুখ

আত্মারাম কিছুই বুঝিতে পারে না, ইহা দেহ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় ; চক্ষুই রূপের জ্ঞানের কারণ, সুতরাং চক্ষু দ্বারাই বুঝিতেছি যে চক্ষু অভাবে রূপের জ্ঞান থাকে না। এই প্রকার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের যন্ত্রাভাবে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের, জ্ঞান আত্মাতে ছিল না। অন্ধের যে দর্শন জ্ঞান নাই তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই বুঝে। দুই জন্মান্ধের একজন আর একজনকে, চক্ষু কি জ্ঞান দেয়, তাহা বুঝাইতে পারে না। তবেই দেহ অভাবে দেহীর আকাঙ্ক্ষার বিষয় কি ছিল, তাহা দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি বা দেহ সংস্কার বর্ত্তমান রাখিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারে না। দেহী দেহযোগে যাহা বুঝে তাহা সঙ্গের মূলে বুঝে। কারণ, কোন ইন্দ্রিয়-সঙ্গের বিষয় না থাকিলে দেহী দেহ-যোগে কি বুঝিত ? দেহী বর্ত্তমানে যাহা বুঝে অর্থাৎ যাহা ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, বলিয়া ইন্দ্রিয় জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে, তাহা ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, অনুরূপই বুঝিতেছে। সুতরাং ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়ের পরিবর্ত্তন না করিয়া দেহ জ্ঞান ও দেহ সংস্কার-বিশিষ্ট দেহীকে বুঝাইবার আর কোন উপায় নাই। কারণ বর্ত্তমান বুঝ- যেরূপ শুনিয়াছি, যেরূপ দেখিয়াছি, যেরূপ স্পর্শ ও আস্বাদনাদি করিয়াছি, সেইরূপই। কোন ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করা যায় "তুমি যেরূপ দেখ নাই, শুন নাই, স্পর্শ কর নাই এমন একটা বুঝের কথা বল ;" সে বলিবে "ঘোড়ার ডিম"। সে ঘোড়াও দেখিয়াছে, ডিমও দেখিয়াছে, ইহাতে ইন্দ্রিয় জ্ঞানে জ্ঞান হয় না এরূপ বিষয় বলা হইল না। তবেই ইন্দ্রিয় সঙ্গ যেরূপ হইয়াছে জ্ঞান সেইরূপই, তাহার বাহিরে নয়।

আমরা যেরূপ ক্রিয়া করি তাহাও ইন্দ্রিয় যোগে হইয়া জ্ঞান ঐ

ক্রিয়ানুরূপ পরিবর্ত্তন হয়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ পরিবর্ত্তন ভিন্ন জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তনের কোন রকমেই উপায় আর হইতে পারে না, ইহা ইন্দ্রিয়গুলি রাতদিন জীবকে বুঝাইতেছে। সঙ্গের মূলে বুঝ্ বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া বুঝিতেছে না যে সঙ্গের মূলেই বুঝের পরিবর্ত্তন হয়। সঙ্গ অভাবে বুঝ্ থাকে না; সঙ্গই বুঝের কারণ। আবার সঙ্গের পার্থক্যে বুঝের পার্থক্য; তথাপি কেহ সঙ্গের পরিবর্ত্তন করিয়া বুঝের পরিবর্ত্তন করিতে রাজী নয়। সঙ্গমূলে বুঝ্ যাহা বুঝে ও যে অবস্থাপন্ন হয় তাহাই বুঝের পক্ষে ঠিক বলিয়া, সেই বুঝের পরিবর্ত্তন সেই বুঝ বর্ত্তমান থাকিতে ইচ্ছা করে না। অথচ অলক্ষিতভাবে, প্রকৃতির বিচিত্রতায় বিভিন্ন প্রকার সঙ্গ হইয়া আমাদের জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। ক্রমে, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য এই অবস্থা চতুষ্টয়ের ভেদে জ্ঞানেরও ভেদ হইতেছে; তৎ সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও ভেদ হইতেছে। সঙ্গের ভেদ মূলেই দেহ ও জ্ঞান উভয়েরই ভেদ হইতেছে, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুকেই নির্ভর করে না। বস্তু শক্তি আমার বুদ্ধি শক্তিকে অপেক্ষা না করিয়া শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতু ভেদে ক্রমে আমার শীত-গ্রীষ্মাদির অনুভূতির ভেদ হইতেছে। তাহা হইলে বস্তু শক্তিই আমার ভেদ জ্ঞানের কারণ ইহা না বলিয়া আর কি বলিব?

এই বিক্ষেপণময় বা স্পন্দনাত্মক সংসারে স্পন্দনমূলক ভেদ বুদ্ধির জন্য নিজের চেষ্টা যত্ন কিছুই আবশ্যক করে না। তবে স্পন্দন রহিত অবস্থায় যাইতে হইলেই স্পন্দনময়

সংসারী জীবের নিজের চেষ্টা ও যত্ন ও স্পন্দন রহিত জীবের সঙ্গ আবশ্যক। এই দেহ-সংস্কার রহিত গুরু স্পন্দনাত্মক সংসারীর জ্ঞান পক্ষে ভ্রান্তি বলিয়াই জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক। কেননা সঙ্গমূলে জ্ঞান যেরূপ পরিবর্ত্তিত হয় সেইরূপই ঠিক বুঝা যায়। গত্যাত্মক প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের সঙ্গমূলে জ্ঞানে "গুরু" ভুল না বুঝিয়াই পারে না। এই জন্যই অন্য অন্য যুগ অপেক্ষা কলি যুগের বিশিষ্টতা। কারণ সংস্কার রহিত দৃষ্টান্ত কলিতে বিরল। বিপরীত সঙ্গই সর্ব্বদা জীবের হইতেছে; সুতরাং গুরুতে বিপরীত জ্ঞান স্বাভাবিক। বুঝ্ যখন না বুঝিয়া নীরব হইতে পারে না; বিশেষ, বোধ্য বিষয় অভাবে বুঝের যখন কোন অস্তিত্বই থাকে না, তখন বুঝ্ যখন আছে, বোধ্য বিষয়ও আছে। আবার বুঝ্ সেই বিষয় অনুরূপই বুঝে। তখন বুঝ্‌কে একটা বিষয় দিয়াই বুঝাইতে হইবে; তাহা হইলে বিষয়ের পরিবর্ত্তনেই বুঝের পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

বোধ্য বিষয়ানুরূপ যখন বুঝ্, তখন বোধ্য বিষয়ের বিপরীত বিষয় দিলে, বুঝে বিপরীতই বুঝিবে। সেইজন্যই তোমার 'পূর্ণ' 'শিব শম্ভুর' মত আর একটা সাজিয়া তোমায় প্রাণ ভরিয়া মামা বলে। ব্যক্তিগত পার্থক্যে অথবা সঙ্গের ভেদে এই তিনের মধ্যে ভেদ থাকায় ঐ দুইজনের মত 'পূর্ণটা' আর মিষ্টি লাগে না। ক্রমে সঙ্গের প্রভাবে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া এক সময়ে নিশ্চয় মিষ্ট লাগিবে। কেননা, এখন সঙ্গের প্রভাবে ও অভ্যাস-মূলে তিক্তটাকে মিষ্ট বুঝিতেছ; যখন সঙ্গ প্রভাবে জ্ঞান পরিবর্ত্তন

হইয়া মিষ্টকে মিষ্ট বুঝিবে, তখন আর তিক্ত বস্তুকে মিষ্ট লাগিবে না। জ্বরে জিহ্বায় অরুচি জন্মিলে তিক্তটা মিষ্ট লাগে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় মিষ্টটাই মিষ্ট বোধ হয়। মা-গো মা কি কহিতে কি কহিতেছি!! না মা, তোর কোন ডর নাই; তোর এ পাগলটা মিষ্ট লাগিলে সকলটাই মিষ্ট লাগিবে; একথা শত বার সত্য। তবে যে কেবল ঐ দুইটিকেই মধুর বুঝ তাহা থাকিবে না; সমস্ত প্রাণীকেই মধুর বুঝিবে। এই জন্যই বিশ্বামিত্র নাম হইয়াছিল; এইজন্য জগজ্জননী জগদম্বা, ভগবতীকে বলে। বর্ত্তমান বুঝ্ লইয়া বুঝাবুঝি করিতে গিয়া বুঝ্ অনুরূপই বুঝিবে। বুঝের কারণ যে সঙ্গ, সেই সঙ্গের পরিবর্ত্তন করিয়া বুঝের পরিবর্ত্তন করিলে, বর্ত্তমান বুঝে যাহা বিপরীত বুঝ, তাহাই অনুকূল বুঝিবে। এই প্রকার জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সঙ্গের পরিবর্ত্তনে ঠিক বেঠিকের পরিবর্ত্তন হইতেছে ও হইবে। ইহাতে বাধা দেওয়ার কেহ নাই। শীতকালে কাল প্রভাবের সঙ্গে সকলকেই শীত বুঝিতে হয়, আবার গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম বুঝে, ইহা কি সঙ্গের প্রভাব নয়?

[(৬৫)—প]

গত কল্য তোমার এক পোষ্টকার্ড ও এক এন্‌ভেলাপ এক সঙ্গে পাইলাম। ভাষা ও প্রাণ দুই রকম, আমি এ জীবনে জানি না। তাই তোমাকে ও মাকে সতর্ক করিতেছি যে, আমার শেষ লক্ষ্য তোমরা দুইজন; তাহার সঙ্গে আমার আর কেহ থাকিলে থাকিবে। আমার এই বাসনার বিপরীত ব্যবহার করিয়া কিছুতেই সংসারে শান্তি পাইবে না, ইহা মনে রাখা উচিত।

সংসারের অর্থ দেহ ও দেহ জ্ঞান। দেহ বাদ দিলে অথবা দেহের সংস্কার ভুলিয়া গেলে, বর্ত্তমান আমির অভাব হইয়া কেবল গুরুর অবস্থা ও গুরুর অতীত যে অবস্থা আমার জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহাই মাত্র থাকে। গুরুর অবস্থা বলিলে মাত্র এই বুঝি যে জগৎ জ্ঞান অভাবে যে attraction ও repulsion মাত্র থাকে, তদবস্থায় কি অভাব বুঝি, তাহা বর্ত্তমান বুঝে কিছুতেই বুঝা যায় না; তবে, এই মাত্র বুঝা যায় যে গুরুর 'উ'-কারের ঘাট হইতে যখন প্রণবাত্মক অবস্থা হয় অর্থাৎ 'উ'-কারের উপর যখন ক্রিয়া আকুঞ্চন মূলে উঠে, তখন কোন অভাব থাকে না, অভাব বোধও থাকে না। আত্মার আত্ম-স্বরূপ অভাব রহিত অবস্থা। অভাব রহিত অবস্থা না হইলে অভাব জ্ঞান সম্ভব হইত না। আত্মার অভাব রহিত অবস্থা স্বাভাবিক বলিয়াই অভাব বোধও স্বাভাবিক। জ্ঞানে যে অবস্থা অবর্ত্তমান সেই অবস্থার জন্য আকাঙ্ক্ষাও অবর্ত্তমান। আকাঙ্ক্ষা অভাব মূলেই হইয়া থাকে। অভাব নাই আকাঙ্ক্ষা আছে, ইহা কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না। যে অবস্থায় অভাব বোধ বা অভাব পূরণেচ্ছা থাকে না সেই অবস্থারই নাম, প্রণবাত্মক অবস্থা। 'উ'-কারের পরবর্ত্তী অবস্থাই প্রণবাত্মক অবস্থা; সুতরাং আকর্ষণ-মূলে 'উ'-কারের পরবর্ত্তী অবস্থা লাভ করিয়াই আত্মার আকাঙ্ক্ষার বিরতি হয়। তদবস্থায় বিক্ষেপণ থাকে না; বিক্ষেপণ হওয়া মাত্রই স্বরূপ অবস্থার চ্যুতি হয় বলিয়াই তখন আত্মার অভাব বোধ ও আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

'উ'-কারের ঘাট হইতে বিক্ষেপণ হইয়াই আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়। 'উ'-কারের ঘাটই আমাদের গম্যস্থান; তাহার পর কি ও কি প্রকারে আত্মা আত্ম-স্বরূপে অবস্থান করেন, তাহা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান দিয়া নির্ণয় করিতে গেলে এইমাত্র বুঝি যে আত্মার আত্ম-স্বরূপ লাভের জন্য সততই তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া যে আকুঞ্চন তাহা, যে পর্য্যন্ত আত্মা আত্ম-স্বরূপে অবস্থান না করেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত, হইতে থাকে। যখন আত্মার আর কোন অভাব থাকে না, তখন আত্মাতে আর কোন ক্রিয়াও থাকে না। সুষুপ্তিকালে আমাদের অপর জ্ঞান রহিত অবস্থায়ও ঐ দুইটি ক্রিয়া (আকুঞ্চন ও বিক্ষেপণ) বর্ত্তমান দেখা যায়; সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইবে সেই অবস্থায়ও আমাদের অভাবের অভাব হয় না। অভাব রহিত অবস্থায় আত্মার আত্মাভিমুখে আকুঞ্চন কিছুতেই সম্ভব হয় না; কারণ আত্মার অবস্থান্তর বা অপর আর একটা কিছু না থাকিলে কাহাকে টানে? বহির্বিক্ষেপণ দ্বারা আত্মার যে অবস্থান্তর হয়, ইহা একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়; কারণ ঐ বাহ্য বিক্ষেপণই জগতে সমস্তের পরিবর্ত্তক বা পরিবর্ত্তনকারী। বাহ্য বিক্ষেপণ রহিত অবস্থায় জ্ঞান বা আত্মা পরিবর্ত্তন বুঝে না। আমার পরিবর্ত্তন হইলেও, বাহ্য বিক্ষেপণ ভিন্ন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। সুতরাং যতক্ষণ বাহ্য-বিক্ষেপণ আছে ততক্ষণ পরিবর্ত্তনও আছে। স্বতঃই স্বীকার করিতে হইবে।

যে জ্ঞানে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তক একটা গতি জ্ঞান হইতেছে, সেই জ্ঞানে গতি বর্ত্তমানে পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। তবে দেখা যায় যে, গতি বা বিক্ষেপণের তারতম্যে জ্ঞানের তারতম্য বা ভেদ হয়। গতির যে অবস্থায় যেরূপ

জ্ঞান হয়, সেই অবস্থায় অপর গতি অনুরূপ জ্ঞানের বিষয় বুঝা যায় না। বুঝের পরিবর্ত্তক বিষয়ের ভেদেই যখন জ্ঞান ভেদ, তখন পরিবর্ত্তন অনুরূপই জ্ঞান। এই হেতুই ক্রিয়া বা বিক্ষেপণ মূলে দেহের ও বিষয়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া ভাল-মন্দ বিচারের পরিবর্ত্তন হইতেছে।

নিদ্রাকালে বিক্ষেপণের পার্থক্য হইয়া যখন ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার বা জ্ঞানের সংযোগ থাকে না, তখন জগৎ-জ্ঞানও থাকে না। তাহা হইলে ইহা পরিষ্কার প্রমাণ হইতেছে যে, বিক্ষেপণ বা গতিমূলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার যখন সংযোগ থাকে তখনই জগৎ জ্ঞান। আর যে অবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ রহিত থাকে, তখন জগৎ বলিয়া কোন বস্তু নাই। বর্ত্তমান জ্ঞানে যে জগৎ বুঝিতেছি, ইহার কারণ দেহ। সেই দেহাতীত আত্মা কি প্রয়োজনে, কোন আবশ্যকে এই দেহ লইয়াছে? এবম্বিধ একটা জগৎ জ্ঞানের জন্যই কি আত্মা দেহ লইয়াছে? তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। কারণ, দেহ লইবার পূর্ব্বে আত্মার দেহানুরূপ কোন জ্ঞান ছিল না; যেহেতু দেহ অভাবে আত্মার এবম্বিধ ইন্দ্রিয়গুলিও ছিল না। যদি বল ছিল, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় এ দেহের আবশ্যক ছিল না; কারণ আত্মার যাহা আছে, আত্মা তাহা আর চায় না। তবেই এই ইন্দ্রিয় আত্মার ছিল না; তাই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ আত্মা আবশ্যক বোধ করিয়াছে।

এখন এই ইন্দ্রিয়গুলি কোন্ প্রয়োজনে বা কি কারণে, ইহা নির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায় যে, আত্মার যাহা প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজনও বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়যোগে বুঝা যাইতেছে না। ইন্দ্রিয়যোগে জীব উদর উপস্থই প্রয়োজন বুঝে; কিন্তু উদর উপস্থ আত্মার ছিল

না ; উদর উপস্থ প্রয়োজন বুঝা কি স্বাভাবিক ? তাহা হইলেই এই দেহ-দ্বারাই দেহী বা আত্মা এই বুঝিতেছে যে, দেহ যাহা বুঝায় তাহা আত্মার প্রয়োজন ছিল না। দেহ দ্বারা দ্বিতীয় বোধ জন্মে : অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই অপর একটা বস্তুকে বুঝায়, আত্মাকে বুঝায় না। আত্মাকে বুঝিতে অপর জ্ঞান রহিত হইতে হইবে, ইহা দেহ ভিন্ন আত্মার বুঝিবার অন্য উপায় ছিল না বলিয়াই আত্মা দেহ বিশিষ্ট হইয়াছেন। দেহ দ্বারা ভ্রান্তি বুঝাই আত্মার উদ্দেশ্য, কারণ ভ্রান্তি বশেই আত্মার দ্বিতীয় বোধ। সেই দ্বিতীয় প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারাই জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে।

ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার পার্থক্যে দ্বিতীয় জ্ঞানেরও ভেদ হইতেছে অর্থাৎ শরীরের তাপের পরিমাণ বাড়িলে, তাপের ন্যূনাবস্থায় যাহা গরম বোধ করিতাম, তাহা শীতল বুঝি। ইহা দ্বারা কি ইহাই বুঝি না, যে এই উষ্ণত্ব, শীতলত্ব কিছুই নয় ; কেবল আমার শরীরের তাপের পার্থক্যেই শীতলতা ও উষ্ণতা বুঝি। জ্বরের অবস্থা চিন্তা করিলেই বুঝিবে। তাহা হইলে আত্মার পরিবর্ত্তন অনুসারেই আত্মা ভাল-মন্দ বুঝিতেছে ; ভাল-মন্দ বলিয়া কোন অবস্থা বা জিনিস নাই। সেই প্রকার দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই ; আত্মা দ্বিতীয় বুঝে বলিয়াই বুঝে। দ্বিতীয় জিনিস নাই, অথচ বুঝে, ইহা ভ্রান্তি বই আর কিছুই নয়।

এখন দেখা যায় দেহের বুঝাবুঝি বাদ দিয়াও দুইটা ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে ; সেই দুইটা ক্রিয়া আকুঞ্চন ও প্রসারণ ; এই আকুঞ্চন ও প্রসারণের পার্থক্যেই সমস্ত জগৎ। প্রসারণ অভাব হইলে আমার আকুঞ্চনও থাকে না ; প্রসারণ বা বিক্ষেপণের অভাব করা ভিন্ন আমার আত্ম-স্বরূপে যাইবার অন্য উপায় নাই। অথবা যে দ্বিত্ব ভ্রান্তি-মূলেই

এই প্রসারণ বা বিক্ষেপণের উৎপত্তি, সেই দ্বিতীয় বোধ রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মার বিক্ষেপণ রহিত অবস্থা সম্ভব নয়। আত্মার আত্ম-স্বরূপে যাইতে হইলেই যে প্রণবাত্মক অবস্থার প্রথম বিশ্লেষণ অবস্থা, 'হুঁ'-র 'উ'-র ঘাট বা গুরুর ঘাট, সেই দিকে যাওয়া ভিন্ন তাহার আর আত্ম-স্বরূপে যাওয়ার অন্য উপায় বা পথ নাই। তাই আত্মা আত্ম-স্বরূপে যাওয়ার জন্য গুরু, গুরু করিয়া চীৎকার করেন। তাহার জ্ঞানে তাহার উপরে আর ধারণার বা জ্ঞানের বিষয় নাই। জীবের সেই চরম লক্ষ্য গুরু।

দেহের ভ্রান্তিতে স্ত্রী পুত্রে আসক্ত জীব ভুল বই গুরুকে ঠিক কেন বুঝিবে? তাই তুমি—র সংসার শক্তি কম থাকা অবস্থায় গুরু যে তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন সেই চিঠি দেখিয়া পাগল হইয়াছ। যে উদর উপস্থ ভ্রান্তি দেহ যোগে জন্মে, ভ্রান্তিমূলে যাহা কিছু চাই বা করি সবই ভ্রান্তি; যে দেহ-যোগে বুঝিবার জন্য দেহ, সেই দেহের মোহে মুগ্ধ ব্যক্তি কি করিয়া গুরু বুঝিবে বা আবশ্যক বোধ করিবে? যে দেহ ক্ষণকালও এক অবস্থায় স্থির থাকে না, সেই দেহের দ্বারা যে স্থায়ী নিত্য সুখের আশা করে, যে দেহ জ্বরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শীল সেই দেহের মোহে যে নিত্য সুখ বিসর্জ্জন দেয়, তাহাকে বুঝাইবার জন্য গুরু তত্ত্ব না।

[(৬৬)—প]

দেহ অনুধ্যান চিন্তায় দেহীর দেহানুরূপ জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান সম্ভবই নয়। আবার যেরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট দেহের চিন্তা আসে,

দেহীকে তদ্রূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতেই হইবে। ইন্দ্রিয়ে যাহা বুঝায় দেহী কেবল তাহাই বুঝিলে যাহা বুঝিত, ইন্দ্রিয়ের বুঝের বিষয় কল্পনা করিয়া, দেহী এখন আর কল্পনা ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ বুঝ্ অনুরূপ বুঝে না; কাজেই দেহীর স্বরূপ বুঝের আকাঙ্ক্ষা বিলোপ হইয়া কল্পনানুরূপ বুঝ্‌কেই ভালবাসে। এই হেতুই আত্ম-স্বরূপ চিন্তা করিতে দেহী রাজী নয়।

[(৬৭)—প]

মানব দেহের উদ্দেশ্য কি? দেহানুরূপ বুঝ্ মানব দেহের উদ্দেশ্য হইলে বুঝা উচিত যে মানব দেহ দ্বারা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না; আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল লাভ মানব দেহ দ্বারা সম্ভব নয়। আত্মার অসীম, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ দেহ দ্বারা কিছুতেই পূরণ হইতে পারে না। হয় আকাঙ্ক্ষা অন্যায় বা ভুল ক্রমে হইতেছে, না হয় দেহ দ্বারা আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছা ভুল হইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ পরিবর্তনশীল দেহ দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। হয় নিরবচ্ছিন্ন সুখের আকাঙ্ক্ষা ভুল, না হয় দেহ দ্বারা বা দৈহিক সুখের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন সুখের আকাঙ্ক্ষা ভুল। কখন দেহের ধ্বংস হয় তাহার সময় নির্দ্দিষ্ট নাই, এ অবস্থায় ভবিষ্যতের সুখ কল্পনা, কল্পনা বই ঠিক হইতে পারে না। বিশেষে শরীরের পরিবর্তনে সুখের ও বাসনার পরিবর্তন হয়। এ অবস্থায়ও বর্তমান জ্ঞানে যাহা সুখের বুঝি ভবিষ্যতে তাহা সুখের না হইয়া দুঃখেরও হইতে পারে; সুতরাং ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনা ভ্রান্তি বই ঠিক কিছুতেই নয়।

ব্যক্তিগত পার্থক্যে জ্ঞানগত ভেদ; সুতরাং দুই ব্যক্তির জ্ঞানে এক ব্যবহার সুখের ইহা ক্রিয়া বিশিষ্ট অবস্থায় কিছুতেই সম্ভব নয়। সঙ্গের পরিবর্ত্তনে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইতেছে; সুতরাং ঠিক ধারণা ঠিক থাকা বেঠিক বা বেঠিক বুঝের পক্ষে ঠিক হইতে পারে, কিন্তু ঠিক বুঝে ঠিক বুঝ্ কিছুতেই সম্ভব নয়। জরা, মৃত্যু, ব্যাধি দেহের স্বভাব, সুতরাং দেহের উপর নির্ভর বা বিশ্বাস করিয়া সুখের প্রত্যাশা বা ঠিক ধারণা সম্পূর্ণ বেঠিক। প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যেক ব্যক্তির সুখের জন্য পাগল; এই অবস্থায় একে অপরের সুখ বিধানের চেষ্টা,—কল্পনা ও কথার কথা; যেহেতু আমি আমার যাতনার জন্য কাহাকেও চাই না।

যে কারণে আত্মা সঙ্গমূলে যে স্বরূপে অবস্থান করে, সেই কারণে সেই স্বরূপের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ বুঝে; কোন অবস্থায়ই আত্মা আত্ম-স্বরূপ ত্যাগ করিতে রাজী নয়। আত্মা আত্ম-স্বরূপে অবস্থান জন্য সর্ব্বদা আত্মাভিমুখে আকর্ষণ অনুভব করিতেছে, সেই আকর্ষণ অনুরূপ ক্রিয়া ব্যতীত আত্মার আত্ম-স্বরূপে অবস্থানের অন্য উপায় নাই। বহির্মুখীন ক্রিয়া বা বিক্ষেপণ দ্বারা আত্মা আত্ম-স্বরূপ পরিত্যাগ করে বা পরিবর্ত্তন হয়; সুতরাং স্পন্দনাত্মক জ্ঞানে আত্মা আত্ম-জ্ঞান-বিহীন হয় বই আত্ম-জ্ঞান লাভ করে না। জ্ঞানের পরিবর্ত্তন অবস্থায়ও পরিবর্ত্তন অনুরূপ বুঝ্ই থাকে; সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল জ্ঞানে পরিবর্ত্তন অনুরূপই ঠিক বুঝে। এই হেতু সঙ্গমূলে মানবের যখন যে অবস্থা হয় সেই অবস্থানুরূপই সে ঠিক বুঝে। পূর্ব্বে যাহা ঠিক বুঝিয়াছিল পরে তাহা বেঠিক বুঝে। বালক কালের বুঝ্ বালক কালে যাহা ঠিক বুঝিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহা বেঠিক বুঝে। ক্রোধ হইলে খুন করা ঠিক

বুঝে। বৃত্ত্যাদি প্রবল হইলে বৃত্ত্যনুরূপ ব্যবহার ঠিক বুঝে। মানব যদি আত্ম-বুঝের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, বুঝাবুঝির যে কত পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা বুঝিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অথচ সর্ব্বাবস্থায়ই ঠিক বুঝে। এই ঠিক বুঝ্ কি ঠিক?

যখন যাহা বুঝি তাহাই যদি ঠিক হয়, তবে বেঠিক কোন অবস্থাই নাই। পরিবর্ত্তনশীল বুঝে বেঠিক বুঝ্ বাদ দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। তাহা হইলে অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় না যাওয়া পর্য্যন্ত বেঠিক বাদ দিয়া ঠিক বুঝা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আত্মার অভিপ্রেত কার্য্য কি—তাহা বুঝিতে হইলে আত্মা আত্মাভিমুখে যে আকুঞ্চন অর্থাৎ আকর্ষণ করিতেছে, ঐ আকুঞ্চন বা আকর্ষণ অবলম্বনে আত্মার নিকটবর্ত্তী না হওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আত্ম-সঙ্গ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, কিছুতেই আত্মার অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায় না।

সঙ্গ ভিন্ন কোন জ্ঞানই লাভ হয় না। জ্ঞান সঙ্গ অনুরূপ, সুতরাং দেহের সঙ্গ করিয়া আত্ম-জ্ঞান লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা কি ভুল নয়? দেহের সঙ্গ দ্বারাই আত্মার দেহেতে আত্ম-ভ্রান্তি জন্মিতেছে। এই জগৎ ভ্রান্তিও দেহের সঙ্গ মূলে। দেহের সঙ্গ রহিত অবস্থায়—সুষুপ্তিকালে—আত্মার দ্বিতীয় কোন জ্ঞানের বিষয়ই থাকে না। তবে দেহের সংস্কার লুপ্ত ভাবে আত্মাতে থাকায়, বহির্মুখীন ক্রিয়া অর্থাৎ বিক্ষেপণ হইতে থাকে। বিক্ষেপণ দ্বারা আত্মা আত্ম-স্বরূপ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে অথবা আত্মার বা জ্ঞানের আত্ম-স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয়। এই জন্যই আত্মা আত্ম-স্বরূপে অবস্থানের জন্যই

আকুঞ্চন বা আকর্ষণ করেন। বিক্ষেপণ রহিত অবস্থায় আকর্ষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, এ কথা বাক্য-ভাষায় না বুঝিয়া বিক্ষেপণ রহিত অবস্থায় থাকিয়া দেখিলেই দেখা যায়। বিক্ষেপণ না থাকিলে, আকর্ষণের কোন আবশ্যকতাই থাকে না ও হয় না। তাহা হইলে এই বিক্ষেপণই আকর্ষণের কারণ।

বিক্ষেপণ অবস্থান্তরেরও কারণ; যেহেতু অবস্থান্তরও জ্ঞানেই বুঝা যায়। অবস্থান্তরের অবস্থা বর্ত্তমানে, স্থির অবস্থার বা স্থায়ী অবস্থার আকাঙ্ক্ষা ভ্রান্তি। অথচ আত্মা একটা স্থায়ী স্থির সুখকে চাহিতেছে। নিজে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই যে নিজে ক্ষণকালের জন্যও স্থিরভাবে নাই ও দেহটাও কোন এক অবস্থায় ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী নয়। এ অবস্থায় স্থির বা স্থায়ী সুখের আকাঙ্ক্ষা ঘোর মোহ বা অজ্ঞানতা নয় কি?

ইহাও জ্ঞানে প্রতিনিয়ত জ্ঞান হইতেছে যে আমার জীবনের অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত, ক্রমে পূর্ব্বকে অপেক্ষা করিয়া, যত পরবর্ত্তী অবস্থা (যত ভবিষ্যৎ) অতীত হইয়াছে, উহার কোন ভবিষ্যতের কল্পনানুরূপ সুখ লাভ হয় নাই বা সুখের আকাঙ্ক্ষারও বিরাম হয় নাই। বর্ত্তমানকে অপেক্ষা করিয়া যে ভবিষ্যৎ বুঝিতেছি তাহাতে আমার কল্পনানুরূপ সুখ হইবে ও সুখের আকাঙ্ক্ষার বিরাম হইবে, ইহা কি আমার "অতীতের ভবিষ্যৎ" অনুরূপ নয়? অহো, মানব তুমি কেবল বহির্লক্ষ্যে সঙ্গমূলে আত্ম-চিন্তা হারাইয়া আত্ম-দৃষ্টি অভাবে ভুলিয়া মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া স্বরূপ বুঝ্ বাদ দিয়া বিরূপকে স্বরূপ বুঝিয়া ঘুরিতেছ। বুঝাইলেও বুঝিতে পার না,

ইচ্ছাও কর না। বোধ্য বিষয় বা সঙ্গ তোমাকে রাতদিন প্রতারণা করিতেছে। মরীচিকায় মৃগ যেমন প্রতারিত হইয়া উত্তপ্ত বালুকা স্তূপে পতিত হয় ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, তুমিও এই সংসার মৃগতৃষ্ণিকায় পতিত হইয়া কত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, তথাপি তোমার সুখের কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পার না। কেননা তোমার স্বরূপেই আনন্দ। তোমার আত্ম-স্বরূপ ভুলিয়া গেলে, তোমার পাইবার ও চাহিবার কি থাকে? তোমার পাইবার জিনিস কোথায়, কি, তাহা তুমি ঊর্দ্ধ দিকে দেহের ভিতর দিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। যত উপরের দিকে ক্রিয়ার খর্ব্ব হইয়া গমন করিতে থাকিবে, ততই তোমার আকাঙ্ক্ষা মন্দীভূত হইবে।

এখন চিন্তা কর তোমার গন্তব্য স্থান কোথায়? যতই বহির্মুখীন দৃষ্টি কর ততই উত্তরোত্তর তোমার আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হয়। তথাপি তোমার জ্ঞানে জ্ঞান হয় না যে বাহ্য জগৎ তোমার আকাঙ্ক্ষার বিষয় নয়। বুঝাইয়া কিছুতেই বুঝান যায় না, কারণ বুঝ্ সঙ্গমূলক; সঙ্গ বাদ দিলে বুঝের অস্তিত্বই থাকে না। আবার সঙ্গ অনুরূপ বুঝ; সুতরাং সঙ্গের বিপরীত ঠিকই বেঠিক।

বুঝাবুঝি সঙ্গমূলে। সঙ্গেরও পরিবর্ত্তন ভিন্ন বুঝা-বুঝিতে কিছুই হইবে না। নিদ্রার সঙ্গমূলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াই আত্মা জগৎ-জ্ঞান রহিত হয়; কোন উপদেশই আবশ্যক করে না, বুঝাবুঝির উপরও নির্ভর করে না। বরফের সঙ্গমূলে শীতলতা ও অগ্নির সঙ্গমূলে উষ্ণতা, অনুভব হইয়া থাকে, কোনও

উপদেশ অপেক্ষা করে না। তাই মোহাবৃত মন, তোমায় বলি তুমি গুরু সঙ্গ কর ; পূর্ব্ব সঙ্গের স্মৃতি ভুলিয়া কিছু কাল গুরুর সঙ্গ করিয়া দেখ, বুঝাবুঝি আপনিই বাদ পড়িবে।

বুঝাবুঝিতে বুঝান যায় না বলিয়াই ভাগবৎ। আত্মা আত্মাভিমুখে যে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার ডাক শ্রবণ কর। যে প্রণব ধ্বনিতে তোমাকে ডাকিতেছেন, তাঁহার ডাকে কর্ণপাত করিলেই তোমার মোহের চমক ভাঙ্গিয়া যাইবে। তুমি অহংএর আহ্বানে নানা প্রকার ধ্বনি শুনিতেছ। আহা কি মধুর বাবা শব্দ, মধুর মা শব্দে, তুমি বংশীধ্বনি শ্রবণে মৃগ যেমন বাস্তুবায় বদ্ধ হয়, সেইরূপ বদ্ধ হইয়া ছটফট করিতেছ। তুমি ত ভ্রমেও একবার অহং জ্ঞানের আহ্বান পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিদলে থাকিয়া কে তোমায় ডাকিতেছে তাহার চিন্তা করিতে অবকাশ পাও না। ঐ যে অহং জ্ঞান-বিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর ছবিগুলি দেখিতেছ, উহারা আবশ্যক হইলে অনায়াসে তোমার প্রাণও বধ করিতে পারে। উহারা স্ব স্ব প্রয়োজন অনুরোধে তোমাকে আমার আমার করিয়া পাগল করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা নিজে নিজের কি না ? তাহারাও ত অপরের। তাহারা তোমার, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস কর ? যে জগতের সাক্ষী-স্বরূপ তাহার কথা শুন। তাহাকে বিশ্বাস কর। ইতি—

[(৬৮)—প]

জগৎ বলিয়া যাহা বুঝিতেছি তাহা সমস্তই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মূলে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাহিরে আমার জ্ঞানের বিষয় কিছুই নাই ; এমন

কি, আমার জ্ঞানও আমার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাহিরে নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইন্দ্রিয় যোগে জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে অথচ জ্ঞান জ্ঞানে নাই। জ্ঞান ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুভব করে ; ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুই জ্ঞানের জনক। জ্ঞান, জন্য পদার্থ-বর্ত্তমান-জ্ঞানে জ্ঞান হয়। জ্ঞান বা চৈতন্য অভাবে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু বর্ত্তমান থাকিয়াও অবর্ত্তমানই ; জ্ঞানে বিষয় না থাকিলে আমার পক্ষে বিষয় নাই-ই। আছে বুদ্ধি জ্ঞানেরই, আবার নাই বুদ্ধিও জ্ঞানেরই। জ্ঞান অভাবে জগতেরই অভাব হয়। এই যত ইতি বোধ বা বিচার করিতেছি সমস্তই জ্ঞান দিয়া, অথচ জ্ঞানের অস্তিত্ব, বিষয় বাদ দিয়া অনুভব হয় না। ইন্দ্রিয় বা দেহ-মূলে জ্ঞান এমন অবস্থাপন্ন হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়ের সংস্কার বাদ দিয়া বর্ত্তমানে জ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাই জ্ঞান দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার বাদ দিয়া জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে পারে না।

এই বুঝাবুঝির মধ্যেও ইন্দ্রিয়ের সংস্কার বর্ত্তমান ; সুতরাং বুঝাবুঝি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার অভাব হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। যে গুরু চিন্তায় 'হুঁ'-র 'উ'-কারের ঘাটে এই স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় অবস্থান হয়, তদবস্থা ভিন্ন তদবস্থার বিপরীত অবস্থায় বিপরীত জ্ঞান স্বাভাবিক। জ্ঞান অনুকূল ও প্রতিকূল, এই দুইটা অবস্থা সঙ্গ ও জ্ঞেয়ের ভেদে ভেদ-জ্ঞান বুঝে। জ্ঞানের ভেদ হইয়াই ভেদ-জ্ঞান হয়। জ্ঞান ভেদ বর্ত্তমানে "অভেদ" একটা কল্পনামাত্র। কাজেই ভেদ জ্ঞানানুরূপ কর্ম্মই আমরা করিয়া থাকি।

অবস্থানুরূপই আমাদের এই দেহ-যোগে কর্ম্মাদি হইতেছে ; অথচ ভাষাযোগে আমরা সবই কল্পনা করিতে পারি। এই জন্য কবিরা যাহা তাহাই কল্পনা করিতে পারে।

আত্মার স্বরূপ পক্ষে দৃশ্যমান জগতের কোন অস্তিত্বই নাই ; কাজেই এই দৃশ্যমান জগৎ আত্মার বা জ্ঞানের ইন্দ্রিয়যোগে কল্পনা। এইজন্য কল্পিত জগৎ পক্ষে যাহা কল্পনা করি তাহাই ঠিক জ্ঞান হয়। জ্ঞান ইন্দ্রিয় যোগে আত্ম স্বরূপের কল্পনাও করিতে পারে না ; কেননা কল্পিত অবস্থায় স্বরূপ অবস্থা জ্ঞানের বিষয় হয় না। আবার স্বরূপ অবস্থায়ও কল্পনা সম্ভব নয়। এই উভয় অবস্থায়ই এক অবস্থায় অন্য অবস্থার অভাব। এই জন্যই ইন্দ্রিয় জ্ঞান বর্ত্তমানে স্বরূপ জ্ঞান সম্ভব নয়। আবার স্বরূপ জ্ঞানেও ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্ভব নয়। মূলে এক জ্ঞান বলিয়াই এক অবস্থায় অপর অবস্থার অভাব হয়। সুপ্ত ব্যক্তি যেমন জাগ্রৎ অনুরূপ বুঝে না অর্থাৎ জাগ্রত-বৎ দর্শন স্পর্শনাদি থাকে না ; এমন কি, জাগ্রৎ অবস্থার কল্পনাও আসে না এবং জাগ্রত ব্যক্তিও সুষুপ্তি অনুরূপ জগৎ জ্ঞান পরিশূন্য অবস্থা ধারণা করিতে পারে না ; সেইরূপ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সংস্কার-বিশিষ্ট জ্ঞান বা আত্মা ইন্দ্রিয় জ্ঞান রহিত অবস্থায় জ্ঞানের বা আত্মার কি স্বরূপ তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। এমন কি সঙ্গের পরিবর্ত্তনে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া যখন জ্ঞানের যেরূপ অবস্থা হয় তদ্বিপরীত অবস্থাকে বিপরীত অবস্থাই বুঝে। প্রবল ক্রোধের অবস্থায় হিতকর বাক্য অহিতকর মনে করে।

বর্ত্তমান অবস্থায় বালকোচিত জ্ঞান যে কারণে অভাব, ইন্দ্রিয়

সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানও জ্ঞানের পক্ষে সেই কারণেই অভাব। আত্ম-স্বরূপ বুঝিতে গিয়া বর্ত্তমান স্বরূপ ভিন্ন বর্ত্তমান আত্মাতে অন্য স্বরূপ নাই ইহাও বুঝি না। ইহার কারণ সঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞেয়। সুতরাং জ্ঞেয়ের পরিবর্ত্তন ভিন্ন জ্ঞানের পরিবর্ত্তনের অন্য উপায় নাই। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্র সঙ্গের প্রভাবই জ্ঞানের পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া গিয়াছেন। যে সঙ্গ বাদ দিয়া আমার নিজের অস্তিত্বই নাই, সেই সঙ্গ পরিবর্ত্তন ভিন্ন আমার পরিবর্ত্তন কিছুতেই সম্ভব নয়। একমাত্র সঙ্গই আমার অনুপায়ের উপায়। ইন্দ্রিয় সঙ্গ মূলে জগতের ভাল-মন্দ, হিতাহিত সমস্তই আমার জ্ঞানের সঙ্গ হইতেছে। সঙ্গের পার্থক্যে আমার জ্ঞানের ভেদ হইয়া আমার আবশ্যক, প্রয়োজন ও চিন্তা অনুধ্যানের ভেদ হইতেছে। দেহের সঙ্গমূলে দেহে আসক্তি আসিয়া ধ্বংসশীল দেহের ধ্বংস চিন্তা করিতেও মন রাজী নয়। দেহের সহিত আত্মার বা জ্ঞানের সর্ব্বদাই সঙ্গ হইতেছে; এইজন্য দেহ অপেক্ষা অপর কোন বস্তুকেই আমি প্রিয় মনে করি না বা নিকট বুঝি না। এইরূপ পুত্র কন্যাদির সঙ্গে সঙ্গ অধিক হয় বলিয়া পুত্র কন্যা প্রিয়। যে ব্যক্তি বা বিষয়ের সঙ্গে যাহার সঙ্গ বেশী হয় তাহাই তাহার প্রিয় হয়। এই জন্য আমরা আমাদের প্রিয় বস্তুর অনুধ্যান বেশী করি। অপ্রিয় বস্তুর চিন্তা করিতে জ্ঞান অপ্রিয় মনে করে; কেননা অপ্রিয় বোধ জ্ঞানেরই। এই প্রকার সঙ্গমূলে সঙ্গের ভেদ হইয়া চিন্তানুধ্যানের ভেদ হয়। আমাদের চিন্তানুধ্যান অনুরূপই জ্ঞান।

এখন চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি কোন্ চিন্তা আমাদের প্রবল।

যে চিন্তা প্রবল, তদনুরূপই জ্ঞান। চিন্তা বা মনের সঙ্গের বিপরীত বিষয়, বিপরীত বই অনুকূল বুঝিতেই পারা যায় না। এই জন্যই আমাদের জ্ঞান পক্ষে যাহা বিপরীত মনে করি, তাহাই ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞান পক্ষে অনুকূল ও ঠিক। জ্ঞানের ভেদেই ঠিক বেঠিকের ভেদ! প্রত্যেক ব্যক্তিরই ঠিক বেঠিকের ভেদ হইতেছে। এই ঠিক বেঠিকের ভেদের কারণ অনুসন্ধান করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে সঙ্গের মূলেই এই ঠিক বেঠিকের ভেদ হইতেছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে জ্ঞানে বা আত্মায় সঙ্গ হইতেছে ; আবার ঐ সঙ্গ অনুরূপ সংস্কার জন্মিয়া, ঐ সংস্কার অনুরূপ চিন্তা দ্বারা সঙ্গের বস্তুর অনুধ্যান প্রতিনিয়ত করিতেছি। সঙ্গের দৃঢ়তা অনুসারে জ্ঞানেরও অবস্থা বিশেষের দৃঢ়তা জন্মিয়া, জ্ঞানের সেই স্বরূপের সহিত অপেক্ষা বা তুলনা করিয়া ঠিক বেঠিক নির্দ্ধারণ করি। কাজেই দেহ-সংস্কার আমাদের দৃঢ় বলিয়াই আমরা দেহাতীত আত্মার স্বরূপকে ভুলই বুঝি। ভুলও ঠিক আত্মার সংস্কারের পার্থক্যের ফল। সংস্কার রহিত আত্মা সংস্কার বিশিষ্ট আত্মার পক্ষে নাই বলিলেও দোষ হয় না। আত্মার আত্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইলেই গুরু চিন্তা অনুধ্যান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যে গুরু চিন্তা অনুপায় মনে করে, তাহার সর্ব্বাবস্থায়ই অনুপায়। তাহার উপায় আর হইতে পারে না, হয় না।

[(৬৯)—প,প্র]

আত্মা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সংস্কার লইয়া যখন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংযোগ পরিত্যাগ করে, তদবস্থার নাম নিদ্রা ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কার কিরূপে আত্মাতে সংযুক্ত থাকে তাহা আমরা বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া যাহা বুঝি তাহাই বুঝি। আমাদের বুঝের মধ্যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কারের পূর্ব্ব স্মৃতি থাকাতে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সংস্কার আত্মাতে বুঝি ; ঐ বুঝ্‌টা জাগ্রৎ অবস্থায়ই বুঝি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়াই বুঝি, ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাবে বুঝি না। কাজেই নিদ্রাকালে সংস্কার কিরূপ থাকে, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় বুঝি না। জাগ্রৎ অবস্থায়, পূর্ব্ব সংস্কার অনুরূপ জিনিসগুলিকেই ঠিক বুঝি ; আর ঐ সংস্কার থাকা হেতুই আমার দেহে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের কার্য্য হইয়া দেহের অপরাপর ক্রিয়াদি হইতে থাকে। আকর্ষণ বিক্ষেপণ থাকা সত্ত্বেও নিদ্রিত অবস্থায় থাকা কালীন যেমন উহা আমার জ্ঞানে জ্ঞান হয় না, তেমনি আত্মাতেও যে ক্রিয়া-বিশিষ্ট অবস্থা সংস্কারমূলে থাকে তাহা জ্ঞানে জ্ঞান হয় না। কিন্তু যখন ক্রিয়া অভাব হইয়া আত্মা আত্ম-স্বরূপে যায়, তখন দেহে কোন ক্রিয়াই থাকে না ; ক্রিয়া অভাব হয় বলিয়া সংস্কারেরও অভাব হয়। এই হেতুতেই নিদ্রাকালে আর সমাধিতে মানবের জ্ঞানের অনেক পার্থক্য ; একটা আত্মার স্বরূপাবস্থা, অন্যটা জ্ঞানের তমসাচ্ছন্ন অবস্থা। নিদ্রা ও সমাধিতে কেবল ইন্দ্রিয় জ্ঞান বাদ থাকে, এই অংশে সাদৃশ্য আছে।

বহির্বিক্ষেপণ বা repulsion আত্মার ভ্রান্তি মূলে দ্বিতীয় বোধ আসিয়াই জন্মে। repulsion অবস্থায়ই আত্মার দ্বিত্ব

জ্ঞান ; সুতরাং repulsion বা বহির্বিক্ষেপণ বর্ত্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে যে আত্মায় দ্বিত্ব-বোধের সংস্কার বর্ত্তমান। এবম্বিধ ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ দ্বিত্ব বোধ থাকে না বটে, কিন্তু দ্বিত্ব বোধের সংস্কার থাকে। ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া বুঝিতে যাই বলিয়াই নিদ্রিতাবস্থায় জ্ঞান থাকে না বুঝি! সমাধিতে ক্রমে যখন সংস্কার ক্ষীণ হইতে হইতে একেবারে অভাব হয়, তখনই মোক্ষ বা নির্ব্বাণ ; তদবস্থায় ক্রিয়াও থাকে না। সংস্কারের সূক্ষ্ম অবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে অভাব না হয়, ততক্ষণ ব্যুত্থানের কারণ থাকে। নিদ্রাকালে আত্মার অভাবের অভাব হয় না বলিয়াই জাগ্রদবস্থা সম্ভব। পক্ষান্তরে নির্বীজ সমাধিতে আত্মার অভাবের অভাব হয় বলিয়াই আত্মা আত্ম-স্বরূপে সেই আত্মানন্দ-অনুভব করেন। নিদ্রিতাবস্থায় সেই আনন্দের অভাব থাকে বলিয়াই অভাব বোধে পুনঃ জাগ্রৎ অবস্থা লাভ করে ও ইন্দ্রিয়ের সংস্কারে যাহা সুখের বুঝায়, তজ্জন্য ব্যস্ত হয়। সবীজ সমাধি হইতে উঠিলে সংস্কারকে ভুল বুঝে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় যোগে যে সুখ তাহার জন্য ধাবিত হয় না। ইতি—

[(৭০)—প]

উপদেশ লিখিবার জন্য বারংবার তাড়না দিতেছ। আত্মা জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের ভেদ হইয়া যে অবস্থাপন্ন হয়, তদবস্থানুরূপ কথাই আত্মার পক্ষে ঠিক ও সত্য ; তদ্বিপরীত কথা বিপরীত

বলিয়াই জ্ঞানে জ্ঞান হয়, উপদেশও অনুপদেশ হইয়া পড়ে। ভাল, আত্মা যাহা ধারণা করিতে পারে না, যে বিষয় আত্মার জ্ঞানের বিষয় নয়, তাহার কারণও আত্মার জ্ঞানের বিষয় নয়। আত্মা আত্মস্থ হইয়া তাহার কারণ বুঝিতে পারে। আত্মা আত্ম-স্বরূপে গেলে আত্মার দ্বিতীয় বোধ বা জ্ঞানও থাকে না, তদবস্থায় কারণ-জ্ঞান জ্ঞানে থাকা কি সম্ভব? আত্মার দ্বিত্ব-ভ্রান্তি হওয়ার পূর্ব্বে কারণ বুঝে কে? দ্বিত্ব ভ্রান্তি হওয়ার পরই কারণ-জ্ঞান জন্মে।

ভ্রান্তি হইয়া কারণ বুঝে, সুতরাং ভ্রান্তির কারণ নাই; কারণের কারণই ভ্রান্তি। ভ্রান্তির কোন রূপ অবয়ব বা অবস্থা কিছু নাই; সুতরাং তাহার কারণ, আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই নাই। যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানে বিষয় বা বস্তু অনুরূপ ভ্রান্তিকে বুঝিয়া কারণ অনুসন্ধান আসিয়াছে, ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বুঝিলেই আর তাহার কারণ অনুসন্ধান আসিবে না। যখন ভ্রান্তির স্বরূপ বুঝা যায় তখন ভ্রান্তিটা "কিছুই না" এই জ্ঞান হয়; যাহা স্বরূপতঃ কিছুই না তাহার আবার একটা স্বরূপ কারণ কি? যেমন কাঁধে গামছা আছে, অথচ ভ্রান্তিতে গামছার অভাব বোধ করিয়া গামছা অনুসন্ধান করিলে, সেই ভ্রান্তির কারণ ভ্রান্তি বই আর কিছুই নির্দ্দেশ করা যায় না। এইরূপ সর্ব্বাবস্থায়ই ভ্রান্তির কারণ ভ্রান্তিই।

এক হিসাবে প্রত্যেক অবস্থাই প্রত্যেক অবস্থার কারণ; আবার এক অবস্থা অন্য অবস্থার কারণ নয়। দুইটা অবস্থার মধ্যে যে ভেদ থাকে, সেই ভেদ অংশের প্রতি অপর কিছুই উহার কারণ হইতে

পারে না; উহাই উহার কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুষুপ্তি কালে আত্মা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ না থাকায়, ইন্দ্রিয় জ্ঞানোচিত কোন স্বরূপই আত্মার থাকে না; তখন কার্য্য, কারণ ইত্যাদিও থাকে না; এমন কি, যে ক্রিয়া দেহে হইতে থাকে সেই ক্রিয়ার জ্ঞানও থাকে না। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ হইয়াই আত্মার এই জগৎ-জ্ঞান; সুতরাং এই পক্ষে ইন্দ্রিয়গুলিই বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা জগৎ জ্ঞানের কারণ। আত্মাই আত্মার সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ের কারণ; সে পক্ষে কার্য্য, কারণ সবই আত্মা। ইহা বুঝিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে আত্মেতর অন্য বস্তু নাই। "আত্মেতর অন্য বস্তু নাই" ইহা জ্ঞানে জ্ঞান হইলে আত্মা আত্ম-স্বরূপে যান। যেরূপ প্রত্যেক স্থূল ব্যাপারের সূক্ষ্ম কারণ তালাস করিতে গিয়া স্থূল ব্যাপার অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মে যাইতে হয়, সেই রূপ আত্মার পরিবর্ত্তনের কারণ তালাস করিতে গিয়া অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় উপনীত না হইলে পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝা যায় না। সেই অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলেই পরিবর্ত্তনের কারণ জ্ঞানও লোপ পায়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার কারণ তালাস করিলে, ক্রিয়াই পরিবর্ত্তনের কারণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞান হইবে; কারণ পরিবর্ত্তন বোধটাই ক্রিয়া মূলে বুঝি। এখানে যে ক্রিয়াকে কারণ বলিতেছি, ইহা পরিবর্ত্তন জ্ঞানের জ্ঞানেই বলিতেছি; কিন্তু অপরিবর্ত্তন জ্ঞানের অবস্থায় কারণ জ্ঞান সম্ভব নহে, কারণ নাই। পরিবর্ত্তন না দেখিলেই বা কারণ জিজ্ঞাসা আসে কোথা হইতে? পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই কারণ

জ্ঞান রহিয়াছে; তাই পরিবর্ত্তনের অবস্থায় কারণের জিজ্ঞাসা তোমাদের বারংবার আসিতেছে। অথচ আত্মার কোন অবস্থাই আত্ম-স্বরূপের পরিবর্ত্তনে হইতেছে বুঝে না। কেবল কল্পিত স্মৃতি মূলে যে পরিবর্ত্তন বুঝে সে পরিবর্ত্তনও ভ্রান্তি। কারণ কল্পনায় স্বরূপাবস্থা থাকে না, সুতরাং ভ্রান্তি ভিন্ন ভ্রান্তির অন্য কোন স্বরূপ বা কারণ কিছুই নাই। ভ্রান্তির ভ্রান্তি ভিন্ন অন্য কোন কারণ দিতেও পার না। যার নিজের স্বরূপ নাই, তাহার কারণের স্বরূপ থাকা কি সম্ভবপর?

কাজেই যাহার স্বরূপ নাই অথচ স্বরূপ বলিয়া বোধ হয় তাহাকে ভ্রান্তি বই আর কিছু বলা যাইতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আত্মা আত্ম-স্বরূপ না বুঝিয়া অপরের স্বরূপ বুঝিতে চায়, এ যে ভ্রান্তি নয় ইহা কে বলিবে? আমাদের বুঝাবুঝির মধ্যে যাহা কিছু গোলমাল তাহা ভ্রান্তি ভিন্ন ঠিক থাকা অবস্থায় সম্ভব হয় না। ঠিকেতে গোলমাল থাকিলে, বেঠিক বলিয়া কোন জিনিস নাই—বেঠিকই ঠিক হইয়া পড়ে; সুতরাং এই ঠিক বেঠিকের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলেও ভ্রান্তি বই আর কিছু নির্দ্দেশ করা যায় না। তাহা হইলেই ফিরিয়া ঘুরিয়া এক ভ্রান্তিই এই জগতের কারণ; ভ্রান্তির উপরে আর কোন কারণ দেওয়া যায় না। কেননা, ভ্রান্তি অভাব হইলেই জগৎ জ্ঞান অভাব হয়, এবং জগৎ জ্ঞান অভাব হইলেই ভ্রান্তির কারণ অনুসন্ধানও থাকে না। দ্বিত্ব বোধ অভাবে কারণ জ্ঞান কি সম্ভব? তাহা হইলে দ্বিত্ব বোধই কারণ জ্ঞানের মূলে; সেই দ্বিত্ব বোধও ভ্রান্তি বই আর কিছুই নয়। কেননা দ্বিত্ব বোধই যদি স্বরূপ হয়, তাহা হইলে আত্মার অভাব বোধ অনন্ত

কালই থাকিবে—জ্ঞান-জ্ঞেয় ভাবে পার্থক্য বোধ জনিত অভাব বোধ অনন্ত কাল থাকিবে এবং অভাব বোধই আত্মার স্বভাব হইয়া পড়ে।

এই যে তোমাকে বুঝাইতেছি, তুমি বুঝিতেছ, ইহার ভিতরেও ভ্রান্তি বর্ত্তমান, কেননা বোধ্য বিষয় আর বুঝ্ এক নয়; এক হইলে বুঝাবুঝি দুইটা থাকে না। দুই থাকিতে কারণ জ্ঞানও অভাব হয় না; সুতরাং সৃষ্টি জ্ঞান থাকিতে 'কারণ নাই' বলিলে জ্ঞান কিছুতেই বুঝিতে পারে না ও বুঝিবে না। নিদ্রাকালে বা সুষুপ্তিতে যখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার সংযোগ ছিল না, তদবস্থায় এই জগৎ-জ্ঞান যে অভাব আছে, তাহার কারণ জ্ঞানও জ্ঞানে জ্ঞান ছিল না; কিন্তু জাগ্রদবস্থায়ই নিদ্রার কারণ খুঁজি। জাগ্রদবস্থায় নিদ্রার অবস্থা থাকে না বলিয়াই কারণ খোঁজার বুদ্ধি আসে, আবার নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রদবস্থা থাকে না বলিয়াই কারণ জ্ঞানও আসে না, তাহা হইলে এই যে কারণানুসন্ধান, জাগ্রদবস্থাই তাহার হেতু কি না? তাহা হইলে এই যে ভ্রান্তি জ্ঞান সেই ভ্রান্তি জ্ঞানই কারণ জিজ্ঞাসা বা কারণ বোধের প্রতিকারণ। ভ্রান্তির অপর কারণ কিছুই হইতে পারে না। তবে ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বুঝিলে ভ্রমের প্রতিকারণ থাকে না, ইহা বলা যায়। কিন্তু "ভ্রম হইল কেন" ইহা ভ্রান্ত অবস্থার জ্ঞানেরই প্রশ্ন, অভ্রান্ত অবস্থায় ভ্রান্তিই থাকে না, তাহার আবার কারণ হইবে কি?

আমরা সর্ব্বদাই ভ্রম বুঝিতে গিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হই; কেননা বোধ্য বিষয়ই বোধের বা জ্ঞানের ভ্রান্তির কারণ। যে স্থলে বিষয়

নাই, বিষয় জ্ঞান আসিয়াই ভ্রমে পড়ি, সে স্থলে বিষয় খুঁজিতে গিয়া ভ্রম অভাব করিবার চেষ্টা করা ভ্রান্তি বই আর কিছুই না ; সুতরাং কারণ খোঁজাটাই ভ্রান্তিতে হইতেছে। এই বুঝাবুঝিতে বুঝাবুঝির শেষ হইবে না। কারণ বোধ্য বিষয়ানুরূপ বোধ বা জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া জ্ঞান যাহা বুঝে তাহার বিপরীতটাই বিপরীত বুঝে। তবেই যে পর্য্যন্ত বোধ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিয়া বোধ আত্ম-স্বরূপে না যায়, সে পর্য্যন্ত বুঝাবুঝি কেবলি মারামারি ও বিড়ম্বনা। বর্ত্তমান জ্ঞানে প্রত্যেকের বুঝ্ই স্বীয় স্বীয় বোধ্য বিষয়ানুরূপ বুঝে এবং তাহা লইয়া রাতদিন মারামারি হইতেছে। এই জগতে কে বুঝে যে "আমি বুঝি না ?" সকলেই বুঝে 'বুঝি' এবং সকলের বুঝ্ মতই সকলে চলে। সমস্ত মানবই এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বিশিষ্ট এবং সকল মানবেরই কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে কর্ম্ম হইতেছে। কর্ম্মও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কার্য্য সকলের মধ্যেই এক রূপ দেখা যায়। এখন বিভিন্ন রূপ বুঝার কারণ কি ?

ইহার উত্তরে ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মগত অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞেয়ের ভেদ বই আর কি নির্দ্দেশ করা যায় ? অথবা কল্পনা পার্থক্যেই এই পার্থক্য। সুতরাং জগৎ বা ভ্রান্তির প্রতিকারণও কল্পনা মাত্র। আজ আর বলিবার কি আছে ? গুরু জ্ঞেয় হইলে কারণ নিশ্চয়ই নির্ণয় হইবে। জ্ঞানের ভেদ না হইয়া জ্ঞানে বিষয়ের ভেদ বুঝা যাইবে না। গুরু অনুরূপ জ্ঞান হইলেই কারণ যাহা তাহা বুঝিবে। তোমার বুঝে এক অবস্থায় থাকিয়া অপর অবস্থা বুঝ না ; বালকাবস্থার বুঝ্ যে কারণে ভুলিয়া গিয়াছ, সেই কারণে কারণও বুঝ না। ইতি

—০—

[(৭১)—প]

দেহের সঙ্গে আত্মার সর্ব্বদাই এমন ভাবের সম্বন্ধ যে মুহূর্ত্তকালও জাগ্রত অবস্থায় দেহের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মা থাকিতে পারে না ; সুতরাং দেহ অনুরূপই আত্মার ভাল-মন্দ বিচার, বুদ্ধি ও জ্ঞান। বর্ত্তমান জ্ঞানকে সাক্ষী মানিলেও সে সাক্ষী দিবে যে দেহ যোগেই তাহার বর্ত্তমান বুঝ্। এই বর্ত্তমান বুঝে যাহা বুঝি, সেই বুঝ্ লইয়াই আমার জিজ্ঞাসা, বিচার ও বুঝাবুঝি। তাই আমার এই বুঝে যাহাই আপত্তি বা প্রশ্ন আসে তাহা এই বুঝের ধর্ম্মেতেই বুঝায় ; এই দেহের বুঝ্ বাদ দিলে দেহানুরূপ কোন আপত্তি বা জিজ্ঞাসা থাকিতে পারে না। তুমি যে প্রশ্নগুলি করিয়া পাঠাইয়াছ তাহা কি তোমার দেহ জ্ঞান পরিশূন্য অবস্থার প্রশ্ন না দেহ জ্ঞানেরই প্রশ্ন ? নিদ্রাকালে দেহ-জ্ঞান পরিশূন্য অবস্থায় ত কোন আপত্তি বা প্রশ্নই আসে না। এ বর্ত্তমান জ্ঞান অতীত হইলে কার্য্য-কারণ, ভাল-মন্দ আদি বর্ত্তমান জ্ঞানানুরূপ কিছুই থাকে না। জ্ঞানের পরিবর্ত্তন অবস্থাও এই জ্ঞান দিয়া বুঝি বলিয়া পরিবর্ত্তন অবস্থায়ও এই জ্ঞানানুরূপ কার্য্য-কারণ বুঝি। এই জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া জ্ঞানের অন্যতম অবস্থা যাহা ভাবি বা বুঝি তাহা এই জ্ঞান দিয়াই কল্পনা করি। এই জ্ঞানের কল্পনাও এই জ্ঞানানুরূপ না হইয়া অন্য রূপ হওয়া কি সম্ভব ? এজন্য আমাদের জ্ঞানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনারও পরিবর্ত্তন হইতেছে।

যে পর্য্যন্ত দেহানুরূপ জ্ঞান বর্ত্তমান সেই পর্য্যন্ত দেহানুরূপ জ্ঞানের আপত্তিও বর্ত্তমান থাকিবে। জ্ঞানের বাহিরে যখন কিছুই নাই, তখন যাহা থাকে, সব জ্ঞানানুরূপই থাকিবে। যে জ্ঞান দিয়া

বুঝিতে চাহিতেছ, সেই জ্ঞানে কারণ রহিত অবস্থা বুঝিতেই পারে না ; এজন্য জ্ঞানের ধর্ম্মের বিপরীত উপদেশ বিপরীতই হইবে, অনুকূল কিছুতেই হইতে পারে না। জ্ঞানের বিপরীতটাকে অনুকূল বুঝি না, অনুকূলটাকেও বিপরীত বুঝি না। আমি তোমাকে যুক্তি-তর্ক দ্বারা যতই বুঝাই, ঐ যুক্তি-তর্কের মধ্যেও দেহজ জ্ঞান বর্ত্তমান এবং দেহজ জ্ঞান দিয়া বুঝিয়া আবার দেহজ জ্ঞানানুরূপই পুনঃ পুনঃ আপত্তি আসিবে। বিষয় অভাবে আপত্তি কি সম্ভব? বিষয় অনুরূপই আপত্তিও হয় ; সুতরাং বিষয় অভাবে কোনই আপত্তি নাই। পরে বিষয় বুদ্ধিতে এই আপত্তি আসে যে, বিষয় রহিত অবস্থায় বিষয় কোথা হইতে আসে? একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, বিষয় রহিত অবস্থায় বিষয় নাই ; বিষয় রহিত অবস্থায় বিষয় বুঝিলেই বা বিষয় আসিয়াছে ভাবিলেই ভ্রান্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই ভ্রান্তি হওয়ার পরেই বিষয় জ্ঞান ও বিষয়ানুরূপ নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন আসে। এ সব ভ্রান্তিবশেই ঘটে, ভ্রান্তির কোন স্বরূপ নাই। স্বরূপ থাকিলে ভ্রান্তি বলাটাই ভ্রান্তি হইতেছে ; সুতরাং ভ্রান্তি স্বীকার করিলে তাহার কোন কার্য্য-কারণ বা ভাল-মন্দ কিছুই নাই। তবে যে ভাল-মন্দ, কার্য্য-কারণ বুঝিতেছি, তাহা ভ্রান্তিবশে। যাহা নাই তাহা আছে বুঝার বা কল্পনার নাম ভ্রান্তি। চিঠিতে উপদেশাদি লিখিয়া দিয়া ঠিক বুঝানও বেঠিক।

জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের ভেদ হয় একথা স্বীকার করিলে, জ্ঞেয় প্রত্যক্ষ থাকা অবস্থায় আমার জ্ঞানের যেরূপ ভেদ হয়, অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় সেরূপ ভেদ হয় না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমারও পায়ের যন্ত্রনায় জ্ঞানের ভেদ হইয়া অদ্যকার চিঠি সংক্ষেপ করিলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এক বুঝ্ বর্ত্তমানে, অপর বুঝ্ অনুরূপ বুঝি না, তবুও যে বুঝিবার চেষ্টা সেটা বেবুঝেরই লক্ষণ। বর্ত্তমান বুঝ্ অনুসারে যাহা বুঝি সেই বুঝে কি কোন আপত্তি বা ত্রুটি জ্ঞান আছে? অতএব বর্ত্তমান বুঝের বিরুদ্ধ বিষয়কে বিরুদ্ধ না বুঝিয়া ঠিক বুঝা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়; এ বুঝ্ অনুরূপ না হইলেই ভুল বুঝিতেই হইবে। ভ্রান্তি অবস্থায় এই হেতুই ঠিককে ভুল বুঝি। অতএব বুঝের পরিবর্ত্তন না করিয়া এই বুঝে অপর বুঝ্ অনুরূপ, অর্থাৎ বুঝের বাহিরের বুঝ্ অনুরূপ, বুঝিবার চেষ্টা ভ্রমেই জন্মিতেছে। এই অর্থাৎ দেহজ বুঝ্ অনুরূপ যাহা কিছু বলি, সবই দেহ-মোহে জ্ঞান যেরূপ বুঝে সেই অনুরূপ। এই হেতুই আমার বুঝ্ অনুরূপ কার্য্য-কারণ ইত্যাদি আপত্তি।

"আমার জ্ঞান পরিবর্ত্তনের কারণ কি?"—এই প্রশ্ন জ্ঞানে জাগিলে জ্ঞানের স্বতঃই স্বীকার করিতে হইবে, জ্ঞেয়ই সেই কারণ। তাহা হইলেই জ্ঞেয়ের ভেদ করা ভিন্ন জ্ঞানের ভেদ হইবে না এবং জ্ঞান ভেদ না হইলেও এই বর্ত্তমান ভেদ বুদ্ধি ঘুচিবে না। জ্ঞানের ভেদ যেরূপ থাকিবে আমাকে সেইরূপ বুঝিতেই হইবে ও সেই বুঝের বাহিরে আপত্তিও আসিবে। বর্ত্তমান বুঝ্ বুঝে না বলিয়া বুঝিয়া বসিবে যে জ্ঞেয়ের ভেদে জ্ঞানের ভেদ করিলে, আবারও তো ভেদ হইতে পারে। কিন্তু এইটুকু বুঝে না যে জ্ঞেয়ের ভেদ, এই দেহের পূর্ব্বে করিলে দেহের প্রতিকারণ হইত না ও দেহজ মোহও জন্মিত না। এই দেহ মুলেই মোহ জন্মিতেছে আত্মা ইহা বুঝিয়া গেলে আবার দেহ গ্রহণ করিবে কি না, দেহ মোহের কারণ না বুঝা পর্য্যন্ত কিছুতেই বুঝে না। যে অবস্থায়ই যে অবস্থা জন্মায় সেই

অবস্থাই সেই জ্ঞানের প্রতিকারণ। এইজন্য মুক্তাত্মা, যে অবস্থায় মোহ উৎপত্তি করে, তদবস্থায় আসিয়া মোহই বুঝে ; এই হেতু আর পুনরায় মোহের কারণ থাকে না।

আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশদরূপে বুঝান অসম্ভব। প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে ফলের ইতর বিশেষ হয়। এজন্যই মোহও জ্ঞানে প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত ভাষায় প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না ; যেহেতু মোহের কোন অবয়ব বা আকারাদি কিছুই নাই। তোমার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বিষয় সংজ্ঞা-শব্দের দ্বারা যেরূপ প্রত্যক্ষ কর বা বুঝিয়া থাক, ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ ব্যাপার ভাষায় সেরূপ বুঝান যায় না। তুমি গুরু-মূর্ত্তি সর্ব্বদা মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ কর, মোহের রূপ বুঝিবে। ইতি

[(৭২)—প, প্র]

আমার জ্ঞানে আমি কতই জানিতে চাই, বুঝিতে চাই, কিন্তু আমি আমার খবরই রাখি না। আমি মাতৃ-গর্ভে কি অবস্থায় ছিলাম জানি না। আমার স্মৃতি থাকার পুর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত স্মৃতি বা স্মরণ আছে তাহার পূর্ব্বে কি করিয়াছি, কি ভাবিয়াছি, কি অবস্থায় ছিলাম, কিরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছি তাহার কিছুই আমার জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না। মৃত্যুর পর কোথায় যাইব, কি অবস্থা ঘটিবে, তাহা জানি না। বর্ত্তমানে যে জ্ঞানের অভিমান করিতেছি, তাহা আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে আমাকে যেরূপ বুঝায়, তাহাও ভাষা ব্যতীত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ানুরূপ বুঝে, বুঝি না ও বুঝাইতে পারি না। চক্ষু যাহা দেখে, ভাষাযোগে তাহা অপরকে বুঝাই, আমার চক্ষু দ্বারা

অপরকে বুঝাইতে পারি না। কর্ণের বিষয়ও কর্ণ দ্বারা বুঝাইতে পারি না, স্পর্শের বিষয়ও স্পর্শ দ্বারা বুঝাইতে পারি না। আমি যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝি সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপরকে বুঝাইতে পারি না; কেবল ভাষা দ্বারাই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় অপরকে বুঝাই, অথচ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞান দিতেছে।

তাহা হইলে ইহা পরিষ্কারই দেখিতেছি যে, আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞান অপরকে দিতে পারি না; তথাপি বুঝি ও বুঝাই। এই বুঝ্ আমার মধ্যেই বর্ত্তমান; বুঝার বিরাম নাই, বুঝানেরও বিরাম নাই। অপর পক্ষে "বুঝি না" ইহা বুঝিতে কিছুতেই রাজী নই। অথচ বুঝ্ যে কি তাহাই বুঝি না। কেন বুঝি, কে বুঝে তাহাও বুঝি না। এই বুঝাবুঝিই বা কেন, কোন্ প্রয়োজনে তাহাই বা কে বুঝে? দেহ-যোগে বা দেহ-জ্ঞান বর্ত্তমানে এই বুঝাবুঝি; দেহ-জ্ঞান অভাব হইলে আর বুঝাবুঝি থাকে না। দেহের শেষ হইলে বুঝাবুঝির শেষ হয় কি না, এই প্রশ্ন মনে আসিলে দেখিতে পাই যে, নিদ্রাকালে বুঝাবুঝি অভাব থাকিয়া আবার দেহ-জ্ঞান জন্মিবা-মাত্রই জাগ্রৎ অবস্থায় পূর্ব্ব জ্ঞানানুরূপ সমস্ত জ্ঞানের বিষয়গুলি ঠিক-ঠাক মত জাগিয়া উঠে। তাহা হইলে এই দেহ অভাবে আবার দেহ গ্রহণের কারণ থাকিলে বর্ত্তমান দেহের জ্ঞানানুরূপ সংস্কারগুলি সকলই জাগিয়া উঠিবে। দেহের সংস্কারের মূলে দেখি উদর উপস্থের চিন্তা; ইহার সুবিধার জন্য যত ইতি কল্পনা। এই উদর উপস্থের সংস্কার সর্ব্ব দেহীর মধ্যেই বর্ত্তমান; কিন্তু কল্পনা কেবল মানব দেহেতেই বর্ত্তমান দেখি। অপর কোন দেহীর মানব দেহ অনুরূপ কল্পনা নাই। তাহার

প্রমার্ণ স্বরূপ মানবের কৃত বিজ্ঞান, রসায়ন, চিত্র-বিদ্যা, চিকিৎসা, গৃহ ও জলযানাদি নির্ম্মাণ নিপুণতা। এই সমস্ত কার্য্য সকলই দৈহিক সুখের জন্য। মানব দিবারাত্রি দৈহিক সুখের জন্য কত কি কল্পনা করিতেছে; কিন্তু কোন অবস্থায়ই দৈহিক সুখের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। তথাপিও জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে না যে কল্পনা-মূলক স্বরূপ সুখ লাভ হয় না।

মানুষ 'বুঝি' বুঝিয়া বুঝের চরম ফল কেবল অভাবই বৃদ্ধি করিতেছে; অথচ অভাবের অভাব করা জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় বাসনার বিপরীত ফল মানবের স্বীয় কর্ম্ম ও বুঝের দ্বারাই ঘটিতেছে। তথাপি বুঝি না বুঝিতে মানবের প্রাণ রাজী নয়। মানব জানে না কেন এ সংসারে আসিয়াছে, কতদিন থাকিবে, কখন কি অবস্থা ঘটিবে। সর্ব্বদাই যে তাহার কল্পনার বিপরীত ফল ফলিতেছে! সুখ বলিয়া যাহা কল্পনায় বুঝিতেছে, তাহাতে সুখের স্পৃহা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে; সুখের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না। তথাপি যাহা বুঝে, তাহা ঠিক না ভুল, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করে না। এই বুঝাবুঝির মারামারি বাদ দিলে মানুষের ধর্ম্ম যে এক হয় তাহা কিছুতেই স্বীকার করে না। বুঝাবুঝির মারামারিতে কোন মানবই উদর-উপস্থ বাদ দিতে পারে না; এক উদর উপস্থের উপাসনাই সমস্ত মানব জাতি করিতেছে। মূলে কাহারও উপাস্য দেবতার ভেদ দেখি না, কিন্তু উদর-উপস্থ বাদ দিয়া উপাস্য দেবতা বহু জাতির বহু প্রকারে প্রকার-ভেদ হইতেছে!

মানব, দেহের ধর্ম্মে যাহা বুঝে তাহা দেহের স্বভাবে ভিন্ন বুঝিবার উপায় নাই বলিয়াই, এক বস্তুরই উপাসনা সকল মানবে করিয়া

থাকে। যেখানে দেহের ধর্ম্মে বাধা দেয় না, সেইখানেই স্ব স্ব কল্পনা অনুরূপ যে যাহা বুঝে তাহাই ঠিক মনে করে; কিন্তু আত্মার নিবৃত্তির অবস্থার পথ এক, ইহা সকল মানবকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই সকল ধর্ম্মেই নিবৃত্তি মার্গের কথা এক। না বুঝিয়া বুঝে বলিয়াই বুঝের মধ্যে এত ভেদ। বুঝিয়া বুঝিতে হইলে বুঝের মধ্যে কোন ভেদই থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের বুঝের ব্যাপার মানব মাত্রেরই এক, ইন্দ্রিয়ের বুঝের বিষয় ভাষায় বুঝিতে গিয়াই কল্পনায় ভাষা বহু হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের বুঝের বিষয় ভাষায় বুঝা যায় না বলিয়াই বহু ভাষার সৃষ্টি। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে দর্শন, স্পর্শ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এই ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের জ্ঞানের বিষয়ে মানবে মানবে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। ঐ ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের জ্ঞানের বিষয় ভাষায় বুঝাইতে গিয়াই ভিন্ন হইয়াছে। ভাষারও ধ্বনি জন্য জ্ঞান মানুষের মধ্যে এক প্রকারই হইতেছে। 'C' বা 'ক' ধ্বনি উচ্চারণ করিলে সকল মানুষের কর্ণেই 'C' ও 'ক' অনুরূপই শোনায়; শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন পার্থক্য হয় না। কিন্তু সংজ্ঞা-শব্দের দ্বারা যে অবস্থা বা বিষয়ের কল্পনা করি, তাহা স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র রূপেই করিয়া থাকি; ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বুঝ্‌কে অপেক্ষা করি না, এই জন্যই বিভিন্নতা!

একে অপরের কল্পনা বুঝিতে পারে না। ঐ কল্পনা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বুঝ্‌ অনুরূপ নয় বলিয়াই মানবে মানবে কল্পনার ভেদ হয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ানুরূপ কল্পনা করিতে অক্ষম মানব, অতীন্দ্রিয় আত্মার কল্পনা করিতে কোন্‌ সাহসে সাহসী হয়? মানুষ যে

কল্পনার প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, তাহা পৃথিবীস্থ মানব মণ্ডলীর প্রতি আত্ম-কল্পনা ভুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পারা যায়। কল্পনাবশে আত্মা আত্ম-স্বরূপ হারাইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে যে না বুঝিয়াও বুঝে। বুঝিলে বুঝের অভাব কেন? বুঝিলে সুখ চাহিয়া দুঃখ পায় কেন? বুঝিলে এই পরিবর্ত্তনশীল দেহের দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয় সুখের আশা করে কেন? মৃত্যু ধ্রুব তথাপি মৃত্যু জন্য আতঙ্ক কেন? বুঝিলে, সকলেই স্ব স্ব দৈহিক সুখের জন্য পাগল, এ অবস্থায় অপরের দ্বারা আমার সুখ হইবে, এ ভুল বাসনা কেন? বুঝিলে, আমার মতে যে কার্য্যে আমিই দুঃখ বোধ করি, সে কার্য্যে অপরেও দুঃখ বোধ করে, ইহা বুঝি না কেন? বুঝিলে, "কিছুই বুঝি না" ইহা ঠিক ধারণা হয় না কেন? বুঝিলে, বুঝিবার আকাঙ্ক্ষাই বা কেন? বুঝি বলিয়া যে বুঝি ইহা কেবল ভাষাযোগেই বুঝি; ইন্দ্রিয়ের বুঝে ভাষা বাদ দিলে বুঝি কৈ? মানবের বুঝ্ যে কেবল ভাষায়ই বুঝায়, ভাষা বাদ দিলে বুঝ্ থাকে না, ইহা বুঝিয়া কি ভাষায় বুঝে? বুঝে অভাব না থাকিলে বুঝাবুঝি নিয়া এত মারামারি কেন? এই মারামারি কাটাকাটি সবই কি বুঝাবুঝির ফল নয়? তবে কি 'বুঝাবুঝি' মারামারি কাটাকাটির জন্য, না শান্তির জন্য? বুঝাবুঝি শান্তির জন্য হইলে সে বুঝের ভিতরে দ্বন্দ ভাব থাকিতে পারে না ও বুঝের মধ্যে মতদ্বৈধ ও পার্থক্য কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, যে বুঝে গেলে কাহারও সঙ্গে বিবাদ নাই, তাহাই ঠিক। এক রূপ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট এক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন বুঝ্ বর্ত্তমান, ইহা দেখিয়া "বুঝ্ ঠিক" ইহা বুঝা বেবুঝেরই কার্য্য।

অনেকেই আপত্তি করিবেন যে ইন্দ্রিয়ের বুঝের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্বরূপ অবস্থায় ঐ বিভিন্ন বুঝ্ বিশিষ্ট ব্যক্তির উপনীত হওয়া অসম্ভব। ভাষার কল্পনা বাদ দিলে ইন্দ্রিয়ের বুঝের মধ্যে এতাদৃশ ভেদ কি সম্ভব ছিল? ভাষা অভাবে প্রতারণা, মিথ্যা, আত্ম-গোপন ইত্যাদি মানবের পক্ষে কি এতাদৃশ সহজ হইত? এতাদৃশ ভেদের হেতুই ভাষা। যে ভাষা স্বরূপ জ্ঞান বিলোপ করে, তাহার দ্বারা স্বরূপ জ্ঞান লাভ কিছুতেই হইতে পারে না। দুইটা বিপরীত জ্ঞান, একই অবস্থায় বা জ্ঞানে কিছুতেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। আমরা বুঝিয়া দেখিলেই "বুঝি না" এটা বুঝি। তবে না বুঝিয়া "বুঝি" অভিমান আসিয়াছে। এই 'না-বুঝ' বুঝ্ লইয়া আত্মাকে বুঝিতে যাই বলিয়াই বুঝি না; সুতরাং এই বুঝ. ত্যাগ করিলেই আত্মার আত্ম-স্বরূপ স্বপ্রকাশ বুঝিব। আমার বুঝেই তাহাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। যতই এই ভ্রান্তি বুঝ্ লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করি ততই আরও সে আবৃত হইয়া পড়ে। হায়, কবে এই বুঝের হাত হইতে নিস্তার পাইব? কে আমার এই বুঝের অভাব করিবে?

সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া অনুসন্ধান করিলেও ত তাহাকে খুঁজিয়া পাইব না। আরও ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া কেবল ইতস্ততঃ উন্মাদবৎ খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবসন্ন শরীরে এই সংসার হইতে বিদায় লইয়া আরও গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিব। কে যেন আমাকে স্বরূপ উপায় দেখাইবার জন্য উপরের দিকে টানিতেছে,

তালাস অনুসন্ধানে জানিলাম তাহার নাম গুরু। অপর চিন্তা রহিত হইয়া দেখিলাম, তাহার নাম করিতে করিতে আমার জগৎ-মোহ সমস্ত ঘুচিয়া গেল। হায় গুরু, তোমাকে ছাড়িয়াই ত এত কাল এই বুঝাবুঝির মারামারি করিয়া কত লাঞ্ছনাই না ভোগ করিয়াছি। ইতি—

[(৭৩)—প, প্র]

মা, আজ তোমার চিঠিখানা পাইয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। রাজ-কুমারীকে বাঙ্গালায় আসিয়া; ভক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া সেই মা বলার দায়ে আমার এই বন্ধন। পরে অনেককেই মা ডাকিয়াছি, কোথাও শান্তি না পাইয়া তোমাকে পাইয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি এমন কুসন্তান যে সকল মায়েরই জ্বালার কারণ হইলাম, কাহারও শান্তির কারণ হইলাম না।

সর্ব্বদাই চিন্তা করি, সকলেই ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিশিষ্ট জীব, ইন্দ্রিয় জ্ঞান বাদ দিয়া জ্ঞানও জ্ঞানের বিষয় হয় না। ইন্দ্রিয়গুলি যেরূপ দেখে বা ইন্দ্রিয়ের যেরূপ সঙ্গ হয়, মানুষের জ্ঞান তদ্রূপই পরিবর্ত্তিত হয়। মানুষ মনের দ্বারা যেরূপ কল্পনা করে, মনও সেই কল্পনানুরূপ ঠিক বেঠিক বুঝে। বুঝাবুঝির মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ ও মনের কল্পনার ভেদে বুঝ্ বা জ্ঞানের ভেদ হইতেছে ; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ ও কল্পনার পরিবর্ত্তন না করিয়া জ্ঞান বা বুঝের পরিবর্ত্তন কিছুতেই সম্ভব নয়। মানব জাতির মধ্যে যে বিভিন্ন রূপ বুঝাবুঝি দৃষ্ট হয়, তাহা কি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গের পরিবর্ত্তন ও কল্পনার পরিবর্ত্তনের ফল নয় ?

মা যদি কল্পনা করে পুত্র অবাধ্য, কথামত কাজ করে না, তখনই তাহার ক্রোধ হয়; আবার যদি কল্পনা করে যে, আমারই প্রকৃতির অনুরূপ আমার সন্তান, কাজেই তাহার প্রকৃতিও এইরূপ, তাহা হইলে নিজের উপরই নিজের ধিক্কার আসে। মা যদি ইহা কল্পনা করে যে আমার যত্ন ও শিক্ষার ত্রুটিতে পুত্রের এই দোষ জন্মিয়াছে, তাহা হইলেও পুত্রের প্রতি বিরক্তির কারণ হয় না। মা ইহাও কল্পনা করিতে পারে, পুত্রের মন ও শরীর ভাল নয়; কাজেই আমার কথা মত চলিতে অক্ষম। কল্পনায় যখন কলা গাছে ভূত দেখি, তখন যাহাই কল্পনা করি তাহাই করিতে পারি এবং কল্পনানুরূপই ঠিক বুঝি।

মানুষের ইন্দ্রিয় সর্ব্বদাই মানুষের পরিবর্ত্তন দেখিতেছে। মানুষ মানুষের ভিতরে কত দুঃখ যাতনা; কত অন্ধ-আতুর, ধনী-দরিদ্র কত মানুষ, প্রতিনিয়ত নানা সময়ে নানা বয়সে মরিতেছে, জন্মিতেছে; কতজন বা সদুদ্দেশ্যে জীবন যাপনের চেষ্টা করিতেছে, কত লোক পাপ কর্ম্ম করিয়া লাঞ্ছনা ও যাতনা ভোগ করিতেছে—ইহা দেখিতেছ। এই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যাহার যদবস্থানুরূপ চিন্তা অনুধ্যান অধিক, তাহার তদবস্থানুরূপ জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে তদবস্থানুরূপই বুঝাইতেছে। বুঝের পরিবর্ত্তনের কারণ যখন ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও মনের কল্পনা, তখন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ও কল্পনার পরিবর্ত্তন করিয়াই বুঝ্ বা জ্ঞানের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় ও কল্পনা যেরূপ তদ্বিপরীত বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিলে "বুঝা যায় না", ইহাই বুঝা যায়।

কল্পনা ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান মূলে দেখিতে পাই আমাদের মধ্যে যে

সঙ্কোচন ও বিস্তার দুইটি ক্রিয়া বর্ত্তমান, ঐ ক্রিয়াদ্বয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াই আমার জ্ঞান ও দেহের যাবতীয় পরিবর্ত্তন ঘটে ; সুতরাং ঐ ক্রিয়াদ্বয়ের পরিবর্ত্তন করিলে, আমার ইন্দ্রিয়াদি ও কল্পনার স্বতঃই পরিবর্ত্তন হইয়া ঐ ক্রিয়ানুরূপ হইতে থাকে। দেহের ভিতরে ঐ ক্রিয়াদ্বয়ের পরিবর্ত্তন হইয়া ব্যাধি জন্মিলে, সেই ব্যাধি অনুরূপ চিন্তা আমার যেমন অন্য ক্রিয়া বা কার্য্য-কলাপ, কল্পনা ইত্যাদি রহিত করিয়া, ব্যাধির চিন্তা প্রবল হয় ; কামলা রোগ জন্মিলে আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুকে অপেক্ষা না করিয়া সমস্তই যেমন হলুদবর্ণ দেখায় ; প্রবল জ্বর অবস্থায় যেমন আমি গ্রীষ্মকালেও শীত অনুভব করি ; সেইরূপ যে ক্রিয়াদ্বয় মূলে আমার আমিত্ব বর্ত্তমান, সেই ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে আমার আমির পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ও কল্পনামূলেও আমার ঐ ক্রিয়াদ্বয়ের পরিবর্ত্তন হইয়া আমার বুঝ্ বা জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হয়। এ অবস্থায় আমার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ, কল্পনা ও ঐ ক্রিয়ার পরিবর্ত্তক মূল-মন্ত্র ; এই তিনই এক প্রকার পরিবর্ত্তনানুকূল হইলে আমার বুঝ্ পরিবর্ত্তন হইবে না, ইহা কি স্বীকার করিতে পারি? ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ও কল্পনা বিপরীত থাকিয়া ক্রিয়া বিপরীত দিকে পরিবর্ত্তন করিতে গেলেই চাড় বাজে। ক্রিয়া বিপরীত দিকে করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ও কল্পনা বিপরীত থাকিলে যেটার প্রবলতা বেশী, ক্রিয়া সেইরূপ হইয়া জ্ঞান সেইরূপ হইবে। তখন ক্রিয়া জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান হইয়া ক্রিয়া করার আসক্তি ক্রমে

হ্রাস হইয়া ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ও কল্পনানুরূপই ক্রিয়া হইতে থাকিবে।

কল্পনা ও ইন্দ্রিয়-সঙ্গ দ্বারা যখন আকুঞ্চন ও প্রসারণ, এই দুই ক্রিয়ার ভেদ জন্মায়, আবার ঐ ভেদানুরূপ যখন মানবের জ্ঞান বা অনুভূতি, তখন ক্রিয়ার সঙ্কোচনের ও ক্রিয়ার প্রবলাবস্থায় কল্পনার ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ভেদ হইবেই হইবে। আবার ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ও কল্পনার প্রবলাবস্থায় ঐ ক্রিয়ার ভেদ, কল্পনা ও সঙ্গ অনুরূপ হইবে। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সঙ্গ, চিন্তানুধ্যান ও মূলমন্ত্র এই তিনটি ক্রিয়ানুকূল না হইলে জীবের মুক্তির উপায় নাই। এজন্য শাস্ত্রে গুরু-চিন্তা, জগতের নশ্বরতার অনুধ্যান ও গুরু-সঙ্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

জ্ঞান সঙ্গ রহিত অবস্থায় স্বীয় অস্তিত্ব অনুমান পর্য্যন্ত করিতে পারে না। বর্ত্তমান জ্ঞানে যাহা জ্ঞান বলিয়া বুঝিতেছি, তাহা শুধু সঙ্গ বই আর কিছুই নয়। তাহা হইলে সঙ্গের পরিবর্ত্তনে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গের পরিবর্ত্তনও সঙ্গ ভিন্ন হইবার অন্য উপায় নাই। সঙ্গই সঙ্গের কারণ; সঙ্গই ভাল-মন্দ ভেদের হেতু। সঙ্গ মূলেই ক্রিয়ার আধিক্য ও খর্ব্বতা। বরফ ও অগ্নি স্পর্শের সহিত সঙ্গ হইলে, দেহের ক্রিয়ার ভেদ হইতে, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আবশ্যক করে না; বিকট শব্দ শ্রবণে ও অরণ্য মধ্যে সহসা সিংহ ব্যাঘ্র দর্শনে আমার দেহের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া জ্ঞানের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা আমার বুঝ্‌কে অপেক্ষা করে না। সঙ্গ মূলেই সঙ্গের ফলানুরূপ ফল ফলে; তাহা

বিপরীত সঙ্গে থাকিয়া বিচারের দ্বারা বুঝিতে গেলে কিছুই বুঝা যায় না।

বুঝ্ই সঙ্গ মূলে, সুতরাং সঙ্গ ব্যতীত বুঝা বা বুঝার ইচ্ছা ভুল বই ঠিক নয়। সঙ্গমূলক জ্ঞানে সঙ্গ ব্যতীত অন্য উপায়ে বুঝিবার চেষ্টা করাই ভ্রান্তি। বর্ত্তমান জ্ঞানে সমস্ত জগৎই ক্রিয়ার সঙ্গ মূলে বুঝি বলিয়া, জগৎকে ক্রিয়ার ফল বলিয়া জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে। আমি যাহা বলিয়াই বুঝি তদনুরূপই আমার সঙ্গ হইতেছে বলিয়া তাহাকে তাহাই বুঝি। আমার এই বুঝাবুঝির মধ্যেও দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, বুঝে যাহাকে যাহা বুঝে. তাহাকে তাহাই বলে ও বুঝে। মানব, সঙ্গ বাদ দিয়া তোমার কোন অস্তিত্ব নাই, তাই সঙ্গের পরিবর্ত্তনে তোমাকে পরিবর্ত্তিত হইতেই হইবে। তুমি যাহা বল, বুঝ, কর, সর্ব্বাবস্থাতেই তোমার জ্ঞান সঙ্গ বাদ দিয়া আত্ম-স্বরূপে নাই। ঐ সঙ্গের পার্থক্যই তোমার বুঝা, বলা, করা ইত্যাদি।

তোমাকে অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় যাইতে হইলেও সঙ্গের পরিবর্ত্তন করিয়াই যাইতে হইবে। অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা হইতেও তুমি সঙ্গ মূলেই পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছ। আবার সঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়াই তোমাকে সেই অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় যাইতে হইবে। জ্ঞেয় ভেদে জ্ঞানের ভেদ, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। তোমার বর্ত্তমান জ্ঞান, জ্ঞেয় অভাবে এই জ্ঞান পক্ষে নাই বা অবর্ত্তমান। আবার তোমার জ্ঞানে যাহাই বুঝে সবই বোধ্য বিষয়ানুরূপ; সুতরাং তুমি বুঝাবুঝির মারামারি ত্যাগ করিয়া বোধ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন কর, তাহা না হইলে বোধ্য বিষয়ের বাহিরে কিছুই বুঝিবে না। ইতি—

[(৭৪)—প]

সংসারে যেরূপ চিন্তা যখন আসে, সেই চিন্তায় অভিভূত হইয়া উন্মাদের মত তাহাই করিতে থাকি এবং সেই চিন্তানুধ্যান অনুরূপ কর্ম্মকে ঠিক বুঝি ও ঠিক করি বলিয়া পূর্ব্বাপর ঠিক থাকে না। পূর্ব্বাপর ঠিক বিবেচনায় কর্ম্ম করিলে, বর্ত্তমানে যাহা করিতেছি, তাহাতে দোষ গুণ বাহির হইয়া পড়ে। এই আমার আমার চিন্তা কেবল আমার চিন্তার ফলই; 'আমার' বলিয়া যে কিছু আছে, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না, যেহেতু 'আমি'ই আমার ঠিক নাই। এক্ষেত্রে 'আমার' কেবল কল্পনায় বুঝায় ও বুঝি। এই বুঝাবুঝির মারামারিতে জগৎ ভরিয়া মারামারি হইতেছে ও হইবে। বুঝাবুঝির শেষ কোথায় তাহা আজ পর্য্যন্ত কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের মীমাংসায় শেষ হয় নাই; বুঝ্ অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত শেষ হইবেও না। বুঝিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না; অন্ততঃ বোধ্য বিষয় বাদ দিয়া বুঝ্‌কে কিছুতেই বুঝা যায় না—বুঝিতে গেলে বুঝ্‌ই বুঝের বোধ্য হইয়া পৃথক জ্ঞান জন্মিয়া ভ্রান্তি হয়। সুতরাং বুঝের নিবৃত্তি স্থান বোধ্য-বিষয় বাদ দেওয়া। বুঝ্, বোধ্য-বিষয় মূলেই বর্ত্তমান, আবার বোধ্য বিষয়ানুরূপই বুঝ্; সুতরাং বোধ্য বিষয়ের ভেদ করা ভিন্ন বুঝের ভেদ হইবে না। এজন্য কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, কি করি, কেন করি, ইহার মীমাংসার জন্য যতই চিন্তা করিবে, ততই চিন্তা বৃদ্ধি পাইবে, চিন্তার নিবৃত্তি হইবে না। জানিবার বা বুঝিবার পিপাসা যত বৃদ্ধি পায়, ততই মোহের গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া বুঝাবুঝির পার কূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই হেতুই "গুরু" "গুরু" চিন্তায় বুঝের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাই

বুঝের পক্ষে ঠিক ; তদ্ভিন্ন বুঝিয়া বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। গ্রীষ্মাবকাশে বুঝাবুঝির শেষ করিতে পারি কিনা দেখিব ; কয়েক দিন বিশ্রাম কর।

[(৭৫)—স্ব]

বাবা, বুঝাবুঝিতে কোন কাজ হইবে না ; কারণ বুঝিব, নিজের বুঝ্ দিয়া। এখনও নিজের বুঝ্ দিয়াই বুঝ। নিজের বুঝ্, সঙ্গ ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যে অবস্থাপন্ন হইয়াছে, সেই অবস্থা দিয়া অপর অবস্থা বুঝিতে গেলেই অবস্থানুরূপ বুঝা যায় না, ইহা বুঝের বুঝা উচিত। বুঝ্ অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিপরীতটাকেও ঠিক বুঝে। এ অবস্থায় বুঝের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কোন্ সাহসে ? অবস্থা বিশেষে যে কর্ম্ম আমা দ্বারা সম্ভবপরই নয় বলিয়া জ্ঞানে জ্ঞান হয়, অবস্থা পরিবর্ত্তনে সেই কর্ম্ম অনায়াসেই আমা দ্বারা সাধিত হয়। আমি এক বহুরূপী সং। আবার আমার উপর এত বিশ্বাস যে, আমার বুঝ্ বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ় ও ঠিক। এই বিপরীত অবস্থা আমাতে আসিয়াই, আমি আমার স্বরূপ বুঝি না। গুরুর ঘাট হইতে অতি নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থাই আমার জ্ঞানে ঠিক। সর্ব্বাবস্থায় বেঠিক বলিয়া একটা জ্ঞান থাকাতেই আমাকে বেঠিক করিয়া তুলিয়াছে। ঠিক আর বেঠিক দ্বন্দ্বাবস্থা আমাতে কিছুতেই সম্ভব নয়। ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমার কোন একটা অবস্থা ঠিক আছে, যাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না। সেই অপরিবর্ত্তনীয় ঠিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বেঠিক বুঝি। সেই অবস্থাই গুরু

যে অবস্থায় গেলে বেঠিক জ্ঞানই থাকে না। যে অবস্থায় বেঠিক জ্ঞান ঠিক বুঝায়, সেই অবস্থায় স্বরূপ ঠিক বা অপেক্ষা রহিত ঠিক জ্ঞানের বিষয় হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাকে ঠিক বুঝাই ভ্রম।

আত্মা পরিবর্ত্তনকে ঠিক বুঝিলে, পরিবর্ত্তনে সুখ-দুঃখ কিছুই বোধ করিত না; পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সুখ-দুঃখ বোধ যখন আছে, তখন আত্মা পরিবর্ত্তনকে ঠিক বুঝে না, একটা অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থাকেই ঠিক বুঝে। সেই অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা কি? অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা 'গুরু' যাহা পাতঞ্জল সূত্রে "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ" এই কথা দ্বারা গুরুকেই অর্থাৎ গুরুর অবস্থাকেই ঠিক বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন; যদবস্থায় গেলে অর্থাৎ যে দ্বিদলে স্থিতি হইলে ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্ভব নয়, সেখানে পরিবর্ত্তনও সম্ভব নয়। কারণ, পরিবর্ত্তন হইয়া জ্ঞান দ্বারা বুঝে ও বুঝায়। এই বুঝাবুঝি বর্ত্তমানে, ইন্দ্রিয় বুঝের অপর পারের ভব কর্ণধার আমার জ্ঞানের বিষয় হয় না। আবার আমার জ্ঞান, আমার জ্ঞানানুরূপ না বুঝিয়া বুঝাবুঝি বাদ দিতে পারে না। এই হেতুই ভগবান্ সাকার অবতার। "বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তি অপেক্ষা করে না" ইহা বুঝাইবার জন্যই ব্রজলীলা; ইহা বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে গেলেই ভুল করা হইবে। বস্তু অনুরূপ ক্রিয়া হইবেই হইবে, তাহাতে কোন রূপ জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। ইতি

[(৭৬)—জ]

গত কল্য তোমার চিঠিখানা পাইয়া হাসি-কান্না যুগপৎ

আসিতে লাগিল। শিশু যেমন খেলার অতি আদরের পুতলটি অতি যত্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে পাছে বা ভাঙ্গিয়া যায়; আর ভাঙ্গিয়া গেলে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়, তোমার চিঠিখানা পড়িয়াও আমার মনে হইতে লাগিল এই ক্ষণ-ভঙ্গুর নশ্বর পুতুল যাহা যত্ন করিলেও রক্ষা করা যায় না, তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছোট শিশুর মত ডাক্তার কবিরাজ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছ। অনিদ্রা, আহারেও রুচি নাই; কিন্তু বিশেষ নিরানন্দ আর কিছু বুঝি না। মাঝে মাঝে চারিদিকের কল্পনায় পুতুল দিয়া কল্পনাকারীদের কল্পনা পরিপূর্ণ চিঠি দেখিয়া হাসি পায়, কান্নাও আসে। আশ্রমের কেহ কেহ ভাষায় গুরুকে সুখ-দুঃখের অতীত বলিয়া বুঝিতেছে, কেহ বা তজ্জন্য বিরক্তি প্রকাশ পুর্ব্বক কোন চেষ্টা-যত্ন কেহ করে না বলিয়া, একে অপরকে গালাগালি দিতেছে।

এক স্পর্শেরই প্রকার ভেদ হইয়া সুখ আর দুঃখ আত্মা দেহ-যোগে অনুভব করিয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে—এই হাসি-কান্না উভয়ের কারণেই দেহ। সে দেহ যে চিরস্থায়ী নয়, তাহা ভাবিবার অবকাশ কৈ? কল্পনায় দেহকে অমর বা অবিনশ্বর করিয়া চিরকালই দেহের সুখের কল্পনা করিতেছে, দেহের ক্রিয়ার ভেদ হইলেই আর কল্পনায় কুলায় না; ক্রিয়ানুরূপই সুখ-দুঃখ অনুভব হয়। এই অসুখে আমার বিশেষ অসুখ এই হইয়াছে যে, আমার তোমাদের নিকট যাওয়ার বাসনা প্রবল অথচ দেহটাই বাধা দিতেছে। অশান্তি যদি বুঝিয়া থাকি তবে এইটুকুই বুঝিতেছি।

গুরু শরীরী নয়; তবে শরীর-যোগে আত্মারামকে বুঝি

বলিয়াই গুরুকে দেহ-যোগে বুঝি। এখন কি দেহাতীত গুরুতে প্রাণটা যোগ করার চেষ্টা করা উচিত নয়? এই ঘোর দুর্দ্দিনে দেহ নিয়া গুরুর থাকা কি বিড়ম্বনার বিষয় নয়? যাহা হউক আমি চেষ্টা নিব তোমার খেলার পুতুল যাহাতে আরো কিছুদিন থাকে। তোমরা আমার শরীরের জন্য বেশী ব্যাকুল হইলে আমিও যাতনা পাই, দেহের যাতনায় আমি বেশী অধীর হইয়া পড়ি না বরং যখন ঐ অবস্থায় অন্যমনস্ক হই, তখন অধিমাত্রায় আনন্দ অনুভব করি।

[(৭৭)—জ]

আজ মনে হইল উপাসনা কি? উপাসনা কি আমার পরিবর্ত্তন, না, আমার অভীষ্ট অনুরূপ ফল লাভের প্রত্যাশায় স্বীয় অভীষ্ট দেবতার উপাসনা? আমার অভীষ্ট কি? আমার বর্ত্তমান জ্ঞানে আমার যাহা আবশ্যক বা প্রয়োজন তাহা আমার অভীষ্টানুরূপ লাভের জন্য অভীষ্ট দেবতার উপাসনা। যখন আমার প্রাণ ধন-মান-যশঃ-আয়ু-আরোগ্য লাভের জন্য পাগল, ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝে না, কিছু চায় না, তখন অভীষ্ট দেবতার নিকট আমার বুঝের বাহিরে কি চাহিব? দেহ চিরদিন স্থায়ী বা স্থির নাই; সুতরাং দেহ নিয়া অমরত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব। বর্ত্তমানেও অতীতের এমন কোন দেহী বর্ত্তমান নাই, যে দেহ নিয়া সৃষ্টি অবধি একাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান সুখ-দুঃখ দেহ-যোগেই বুঝি; সুতরাং দেহ বাদ দিয়া সুখ বা দুঃখ কিছুই কল্পনাও করিতে পারি না। দেহও ক্রিয়াবিশিষ্ট পদার্থ; দেহ এক রূপ ভাবে স্থির ও স্থায়ী থাকা কিছুতেই সম্ভবপর

না। তবে দেখা যায় যে সুখ-দুঃখ ভোগের আধার যে দেহ, তাহাতে কেবল আমার মতলবে বা গরজে কেবল সুখেরই কল্পনা করি; মন দুঃখের কল্পনা করিতে কিছুতেই রাজী না। সেইরূপ এই দেহটাই চিরকাল একরূপ ভাবে থাকিবে ও দুঃখ বাদ দিয়া কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ এই দেহযোগে ভোগ করিব, ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মত দেহের পক্ষে এইরূপ কল্পনা আসা অসম্ভব নয়। যে কল্পনা করিয়া সুখ পাই, সেই কল্পনা ভিন্ন মন কিছুতেই রাজী নয়। জগতে যত প্রকার কল্পনায় অসম্ভব কল্পনা সম্ভব হয়, তার চেয়েও দেহের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ কল্পনা ও দেহ চিরস্থায়ী করার কল্পনা করা অধিকতর অসম্ভব। ইহার চেয়ে অসম্ভব আর কিছুই হইতে পারে না। সম্ভব অসম্ভব দেহ-যোগেই বুঝি।

কোন্ জ্ঞান নিয়া উপাসনা করিতেছি? সেই জ্ঞানের বাহিরে উপাস্য দেবতা জ্ঞানে জ্ঞান হওয়া কিরূপে সম্ভব জ্ঞান হয়? এই সম্ভব জ্ঞানও নিজের জ্ঞান ছাড়িয়া কি করিয়া বুঝি? আত্ম পরিবর্ত্তনই উপাসনা না বুঝিয়া উপাস্য দেবতা নিজের জ্ঞানের বাহিরে কি প্রকারে বুঝিব? উপাস্য দেবতা আমি ভিন্ন অন্য পদার্থ হইলে দুইএর মধ্যে চিরকাল ভেদ আছে ও থাকিবে এবং স্বীয় প্রয়োজন ও বুঝানুরূপ সুখের জন্যই উপাস্য দেবতার আরাধনা ভিন্ন উপাসনা সম্ভব হয় কি? বর্ত্তমান জ্ঞানে যাহার বাহিরে চাওয়ার বা পাওয়ার নাই, তাহার বাহিরে চাওয়া সম্ভব হয় কি? যদি কেহ আপত্তি করে যে, উপাসনার দ্বারা জ্ঞানের ভেদ হইয়া চাওয়ার পাওয়ারও ভেদ হইবে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে

যে, যাহা চাই কি পাইতে ইচ্ছা করি, তাহাতে আমি তৃপ্ত নই অর্থাৎ বর্ত্তমান বিষয়কে আমি ভুল বুঝি। তাহা হইলে আমার বুঝে ভুল আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। এস্থলে আমার উপাস্য দেবতার ভুল নাই কে বলিবে? ইহাতেও যদি এই আপত্তি আসে যে অপরের কথা বিশ্বাস করিয়া আমি উপাসনা করি; অপরের জ্ঞানে ও আমার জ্ঞানে যে পরিমাণ ভেদ আছে, বিশ্বাসেও সেই পরিমাণে ভেদ আছে। যদি বল উপাসনা করিতে করিতে এই ভেদ দূর হইবে, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের ভেদ না ঘুচিবে সেই পর্য্যন্ত চাওয়ার বিষয় কি তাহা জানি না। উপাসনাই চাওয়া, চাওয়ার বিষয় না জানিয়া উপাসনা সম্ভব হয় না। উপাস্য দেবতাতে ও আমাতে যে ভেদ আছে, এই ভেদ অনন্ত কাল আছে, থাকিবে এবং সেই ভেদ-জ্ঞানের জ্ঞানে অভেদাত্মক অবস্থার অভাব কোন কালেই হইতে পারে না। আত্মাতে অভাব থাকিবেই এবং অভাবানুরূপ চাওয়াও থাকিবে। কেবল চাওয়ার প্রকার ভেদকেই উপাসনা বলা হয়।

যে আমি আমার বাসনার বিষয় কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না, সেই আমি আমার বাসনার বিষয়ের জন্য ভিন্ন উপাসনা করিব, ইহা কি সম্ভব হয়? এই জন্যই বাসনা ভেদে উপাস্য দেবতার ভেদ ও উপাস্য দেবতার রূপ-গুণের ভেদ ও প্রার্থনার ভেদ। এই ভেদ অনন্ত কাল আছে ও থাকিবে। যে দেহ-যোগে এই জগৎজ্ঞান, সেই জগতের বাহিরে চাওয়ার ও পাওয়ার বিষয় আমার জগৎ জ্ঞানের জ্ঞানে কিছুতেই সম্ভব না। এই জগতের

মধ্যেই এই জগৎ জ্ঞান সম্ভূত কল্পনার ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইবে। আর যদি ভ্রান্তি হেতু আমি আমার স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া এই দুঃখাদি ভোগ করিতেছি স্বীকার করি, তাহা হইলে আমার বর্ত্তমান অবস্থা ভ্রান্তির ফল ইহা না বুঝিলে, আমার স্বরূপের জন্য আকাঙ্ক্ষা বাসনা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক বুঝিলে, এটা আমার বিরূপ অবস্থা বা ভুল, ইহা কথার কথা মাত্র।

অপর দিকে দেখি সঙ্গের প্রভাবে আমার সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইয়া রাত দিনই ঠিককে ভুল ও ভুলকে ঠিক বুঝিতেছি। সংস্কারানুরূপ কল্পনার পরিবর্ত্তন হইয়া ঠিককে ভুল ও ভুলকে ঠিক এই ধারণারও পরিবর্ত্তন হইতেছে। তবে কোন্ সাহসে এই বুঝে আস্থা স্থাপন করিয়া ঠিক আছি? এই পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে পাঁচ প্রকার বুঝিয়া জগৎ বুঝি—চক্ষু দিয়া রূপের জ্ঞান, জিহ্বা দ্বারা রস, আবার কর্ণের দ্বারা শ্রবণ ও ত্বকের দ্বারা স্পর্শ। এই ইন্দ্রিয় গুলি এই ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুরূপ জ্ঞান দিয়া অথবা জ্ঞানের প্রকার ভেদ করিয়া জগৎ বুঝাইতেছে, তথাপিও বুঝি না যে, এই ইন্দ্রিয়-যোগেই জগৎ বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ বুঝেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। রসনা বিকৃত হইলেই আর রস বুঝি না, শরীরের তাপের পরিমাণ বাড়িলেই, ত্বকের স্পর্শানুরূপ আর গ্রীষ্ম বুঝি না, তথাপি স্বীকার করিব না যে, ইন্দ্রিয়ের বুঝ্ পরিবর্ত্তনশীল। এখন এই ইন্দ্রিয়ের বুঝ্ দিয়া উপাসনা করিতে গেলে উপাস্য দেবতারও পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা কে অস্বীকার

করিতে পারে? বুঝ্ ঠিক বা স্থির না থাকিলে কি বোধ্য বিষয় ঠিক বা স্থির থাকিবে? কৈ, কোথায় কাহারও স্থির থাকে না। এই আমি বুঝের পরিবর্ত্তনে কত কর্ম্ম না করিয়া বসি, আত্মীয়কে অনাত্মীয় বলিয়া ত্যাগ করি, আবার অনাত্মীয়কে আত্মীয় বলিয়া প্রাণের সহিত ভালবাসি। আজ যাহা রুচিকর, কাল তাহা অরুচিকর; সর্ব্বদাই বুঝের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইতেছে। কেবল উপাসনার বেলায় ঠিক বা স্থির থাকিবে ইহা কি সম্ভবপর? হিন্দু, মুসলমান ও মুসলমান, খৃষ্টান বুঝের পরিবর্ত্তনে রাত দিনই হইতেছে। এই বুঝের উপর যে ধর্ম্মের ভিত্তি তাহার স্থায়িত্ব ও স্থিরতা বুঝের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্ত্তন হইবেই। নিজের মনকে 'কেন উপাসনা করি?'—জিজ্ঞাসা করিলে দেখা যায় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য; সুতরাং মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভীষ্টের পরিবর্ত্তন হইবে। আর যদি সুখের জন্য বলা যায়, তবে এই দেহযোগে এই বুঝে যাহাকে সুখ বুঝি, সেই সুখের জন্য ভিন্ন অন্য কোন কারণে উপাসনা সম্ভব হয় না। এই দৈহিক সুখের জন্য উপাসনা করিয়া দেহ ও জ্ঞান শূন্য হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় এবং দেহের দ্বারা যে সুখ কল্পনা করিতে পারি, তদতিরিক্ত সুখের প্রত্যাশাও উপাসনা দ্বারা সম্ভব নয়। এই দেহযোগে নিরবচ্ছিন্ন সুখ একটা আমাদের জ্ঞানে বা কল্পনায় আনিতেই পারি নাই; সুতরাং দেহী দেহ-যোগে বা দেহ সংস্কার নিয়া উপাস্য জিনিস ধারণাই করিতে পারি না। অতীন্দ্রিয় অবস্থায় আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবই না। অন্য বস্তুর জ্ঞান

জ্ঞানে ইন্দ্রিয়-যোগেই হইতেছে। ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার বাদ দিলে শুধু আত্মারই অস্তিত্ব-মাত্র থাকে। এই আত্মারই ভ্রান্তি হেতু এবম্বিধ পরিবর্ত্তন হইয়া, এই বর্ত্তমান অবস্থায় বর্ত্তমান এবং এই ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বুঝিয়া আত্ম-স্বরূপে যাওয়াই আত্মার অভীপ্সিত হয় বা তাই উপাসনা। তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থাকে ভ্রান্তি বুঝাই একমাত্র উপায়; নচেৎ বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক বুঝিলে বুঝের প্রকার ভেদের সঙ্গে সঙ্গেই উপাস্য বা আরাধ্য-বস্তুরও ভেদ হইবে ও কল্পনার ভেদানুসারে ফলেরও ভেদ হইবে, এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কল্পনায় যেমন সুখের কল্পনা করিয়া সুখ পাই, উপাসনায়ও তেমন কল্পনানুরূপ উপাস্য দেবতা নির্ণয় করিয়া, প্রকৃতি অনুরূপ ফল কামনা করিয়া, ঠিক বুঝি ও সুখী হই; বিন্দুমাত্রও এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। বাবা, তুমি গুরু রূপেও সেই ভেদাতীত সচ্চিদানন্দরূপে ছিলে, এখনও আছ। ভ্রমের প্রকার ভেদে প্রকার-ভেদ হইয়া হা হতোস্মি করিতেছ। বর্ত্তমান ভ্রান্তির অবস্থাকে ভ্রান্তি না বুঝিলে আর উপায় নাই। তুমি তোমার গুরু রূপে এই রূপকে ভুল বুঝিয়া অবস্থান করিলেই সব জ্বালা দূরে যাইবে। তুমি কল্পনার বেলায় যেমন যখন যেরূপ কল্পনা কর সেইরূপই হও; এই বেলায়ও গুরু রূপ ভাবিয়া গুরু চিন্তা করিয়া গুরু হইতে হইবে। ইতি—

[(৭৮)—যো,এ]

জ্ঞানের প্রকার ভেদেই এই সৌরজগৎ; জ্ঞানাভাবে এই জগতের অস্তিত্ব কোথায়? জগতের প্রকার ভেদে জ্ঞানের ভেদ না জ্ঞানের প্রকার ভেদে জগৎ? ইহা জ্ঞান দিয়া বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে উভয় অবস্থায়ই জ্ঞানের প্রকার ভেদ না হইয়া জগৎ-জ্ঞান সম্ভব না। অপর পক্ষে জগৎ আর জ্ঞান, এই উভয় অনন্ত কাল বর্ত্তমান থাকিয়া জগদনুরূপ জ্ঞানের পরিবর্ত্তন ঘটিলে অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞান—জ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। "জ্ঞানের পরিবর্ত্তন" এই সংজ্ঞা-শব্দ দ্বারাও জ্ঞানের একটা অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা স্বীকার করা হইতেছে। একটা স্বরূপের অবস্থান্তর না হইলে পরিবর্ত্তন শব্দ দ্বারা জ্ঞান কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহা হইলে জ্ঞান হইতে দৃশ্যমান জগতের অভাব না করিয়া জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা সম্ভবপর হয় না।

অপর পক্ষে জ্ঞান প্রতিনিয়তই দৃশ্যমান জগতেরও পরিবর্ত্তন দেখিতেছে; যথা জন্ম-মরণ, বাল্য-যৌবন, প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্য, দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম, কৃষ্ণ-শুক্ল পক্ষাদি। এই স্থলে উভয়কেই পরিবর্ত্তনশীল জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, পরস্পর পরস্পরের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; না হয়, একের পরিবর্ত্তনেই অপরের পরিবর্ত্তন বুঝা যাইতেছে। পরিবর্ত্তন বুঝা বা অনুভব করা জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া এক অবস্থাকেও ভিন্ন দেখি; এই কারণে এক ব্যক্তিতেই আসক্তি বিরক্তি ঘটে। যে

ইন্দ্রিয়-যোগে এই দৃশ্যমান জগৎ জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে, সেই ইন্দ্রিয় অভাবে আত্মার জ্ঞানের পক্ষে দৃশ্যমান জগৎ অভাব; তখন জ্ঞান আত্ম-স্বরূপে অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় বর্ত্তমান। এখন দেখা গেল এই ইন্দ্রিয় মূলেই জগৎ সৃষ্টি হইয়া সেই জগতের দ্বারা জ্ঞানের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জগৎ থাকাতেই যদি আমার ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-গুলি জগদনুরূপই হইয়াছে; জ্ঞানানুরূপ হইয়াছে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। কেন না, ইন্দ্রিয়-অভাবে জ্ঞানে জগৎ-জ্ঞান ছিল না। ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের অনুকূল বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানের সে পক্ষেও ভ্রান্তি জন্মিতেছে। ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের স্বরূপের অভাব করিয়া অনন্ত প্রকার প্রকার-ভেদ করিতেছে। সেই প্রকার ভেদানুরূপই জ্ঞান বুঝিতেছে, ভেদ রহিত অবস্থা জ্ঞানের জ্ঞানাভাব।

জ্ঞান ও সৃষ্টি উভয়ের অনাদি কাল অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জ্ঞানের অভাব রহিত অবস্থা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না; সুতরাং অভাবই জ্ঞানের স্বভাব হইয়া পড়ে। এবং অভাবকে অভাব বুঝাও জ্ঞানের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানের অভাব রহিত অবস্থা থাকাতেই অবস্থান্তরে অভাব বোধ হয়। তাহা হইলে সৃষ্টি বা ভ্রান্তি অনাদি বুঝাটাই ভ্রান্তি। সৃষ্টি আর ভ্রান্তি অনাদি বুঝা; ভ্রান্তিতে সৃষ্টি জ্ঞান জন্মে

বলিয়াই অনাদি বুঝি। অভ্রান্তাবস্থায় সৃষ্টি বা ভ্রান্তি কোথায়? তখন অনাদি বুঝে কে? ভ্রান্তির অবস্থায়ই ভ্রান্তিকে অনাদি বুঝি। ভ্রান্তি অনাদি হইলে, ভ্রান্তি আর ভ্রান্তি থাকে না, জ্ঞান পক্ষে তাহাই স্বরূপ হয়। তাহা হইলে যে জ্ঞানে ভ্রান্তি বুঝিতেছি, সে জ্ঞানে ভ্রান্তিকে অনাদি বলাই ভ্রান্তি। পরিষ্কারই দেখিতে পাই, গুরুর ঘাটে গেলে, দৃশ্যমান জগৎ ও ভ্রান্তির কিছুই থাকে না। জ্ঞান গুরুর স্বরূপ ত্যাগ করিয়া যখন অহং অনুরূপ স্বরূপ ধারণ করে, তখনই ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-লব্ধ জগৎ ও ঠিক-বেঠিক ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি বা বিরূপাবস্থায় স্বরূপ অবস্থাকে বিরূপ বা ভ্রান্তি বুঝিতেছ।

জ্ঞানের ভ্রান্ত স্বরূপ দিয়া অভ্রান্ত অবস্থা জ্ঞানই হয় না। স্বরূপ বুঝা দূরে থাকুক, বুঝের বিষয়ই হয় না। গুরুর (দ্বিদল) 'উ'-কারের ঘাট হইতে 'হুঁ' আসিয়াই নীচে 'উ'কার পরিত্যাগ করিয়া হ-কার আকার ধারণ করে, যে হ-কার হওয়ার পরেই অকারের সৃষ্টি হইয়া জ্ঞানে অহং জ্ঞানানুরূপ জগৎ জ্ঞান প্রতিভাত হয়। এই 'হ'-কারের সৃষ্টি গুরুর নিজকে ভুলিয়া অপর যে কোন প্রকারের চিন্তা বা লক্ষ্য আসুক, তাহাতেই হয়। ভাষায় না বুঝিয়া দ্বিদলে লক্ষ্য করিয়া দেখ, হ-কারের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-জ্ঞানের অভাব হইবে। তাহা হইলে অপর বস্তুর অস্তিত্বকে কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না; জ্ঞান নিজে নিজকে বুঝিতে গেলেই দ্রষ্টা-দৃশ্য ভাবে অন্তর্ব্বহির্লক্ষ্য আসিয়া

পড়ে ; যে বর্হিলক্ষ্য মূলে হ-কারের সৃষ্টি হয় এবং এই হ-কার হইতেই জ্ঞানের প্রকার-ভেদ হইয়া জগৎ-ভ্রান্তি জন্মে। হ-কার বিলোপে জ্ঞানে জগৎ-জ্ঞান অভাব। জ্ঞান হইতে হ-কার উৎপত্তি হইয়া জগৎ উৎপত্তি হইল ; তাহা হইলে জ্ঞানের প্রকার ভেদ হইয়া জগৎ হইয়াছে না বলিয়া জগতের প্রকার ভেদে জ্ঞানের প্রকার-ভেদ কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। এই হেতুতেই হ-কারের অভাব করাই জ্ঞানের জগৎ-ভ্রান্তি নাশের মহৌষধ ; অথবা দ্বিদলে মন রাখিয়া গুরু-চিন্তা করিলেও হ-কারের বিলোপ হয়। অহং ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইয়া জ্ঞান আর সেই অভ্রান্ত অবস্থাকে চায় না ; অথচ জ্বালা যন্ত্রণাও সয় না। ভ্রান্তিতে যাহা কিছু করে তাহাতেই আত্ম-স্বরূপের অভাব বৃদ্ধি হইয়া কেবল অভাবের তাড়নায় জীব ধড়ফড় ছটফট করিয়া থাকে ? এই ভব রোগের মহৌষধ গুরু।

[(৭৯) যো, এ]

আত্মা আত্ম-স্বরূপে থাকা অবস্থায় আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না। এই অনন্ত জগৎ কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্নের উত্তর, আত্মারই কল্পনাবশে অনন্ত প্রকার প্রকার-ভেদ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? এই প্রকার ভেদের আদি অবস্থা গুরু আর অন্ত অবস্থা স্থাবরত্ব। এখন তুমি আর আমি এই উভয়

অবস্থার মাঝখানে দণ্ডায়মান। গুরুর অবস্থায় উভয়ই এক ছিলাম ; দেহ জ্ঞানে তুমি আর আমি ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ক্রমে জ্ঞানের ভেদ হইয়া এই অবস্থার নীচে যত সরিয়া পড়িব ততই ভেদ বৃদ্ধি হইয়া কারো সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকিবে না এখনও দুইজন দুইজনকে চিন্তা অনুধ্যান করিতে ও ভালবাসিতে পারি ; ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষেও কল্পনার সাহায্যে পরস্পর পরস্পরকে কল্পনা করিতে পারি ও একের জন্য অন্যে ব্যাকুল হইয়া থাকি। মানব দেহের পরবর্ত্তী নিম্ন অবস্থায় কল্পনার শক্তি থাকিবে না, কেবল প্রত্যক্ষে সাময়িক একটা জ্ঞান জন্মিতে পারে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে উভয়ে গুরুর ঘাটে গিয়া অভেদ হইয়া থাকাই বাঞ্ছনীয়, না, এই বর্ত্তমানে কয়েকদিন উভয়ে উভয়ের স্বার্থের জন্য কুটুম্বিতা করিয়া চলিয়া যাওয়াই ঠিক? আমি তোমাকে সর্ব্ব অবস্থায়ই অনুধ্যান চিন্তা করিয়া থাকি ; তুমি আমাকে আমার মত সর্ব্ব অবস্থায় অনুধ্যান চিন্তা করিলে তোমাতে আর আমাতে তফাৎ থাকা কিছুতেই সম্ভব না। এই জগতের যত প্রকার প্রকার-ভেদ দেখি সবই জ্ঞানের কল্পনার প্রকার ভেদের ফল। আমি আমার জ্ঞানের স্বরূপের প্রকার ভেদ কেবল তোমার চিন্তা অনুধ্যানেই পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে এই অবস্থায় বর্ত্তমান ; নচেৎ আমি গুরু রূপে সুখ-দুঃখের অপর পারে পরমানন্দ ধামে বিরাজ করিতাম। অনেক দিনই জিজ্ঞাসা করি, আমি কি করিলে তুমি বা তোমরা সুখী হও ; কই কোন উত্তর ত কর না। তুমি তোমার মতই থাকিতে ভালবাস, তাই তোমার প্রকৃতি অনুরূপ কার্য্য গুরু সমর্থন করুন তাহাই চাও।

[(৮০)—প]

গুরু সুদৃঢ় আট গাছি শিকলে* বদ্ধ জীবকে ডাকিতেছেন 'আমার নিকট আইস'। ঐ শিকল দিয়া বাঁধিয়া গুরু পাঠান নাই; শিষ্য নিজে নিজেই সঙ্গ করিয়া এই সুদৃঢ় বেড়ী পরিয়াছে। এই বেড়ীতে জীব কি প্রকারে কি কৌশলে বদ্ধ হইয়াছে, এখন আর তাহা ঠিক পায় না ও তাহা উন্মোচন করিয়া মুক্ত হইবার উপায় বুঝে না। গুরু বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে চাহে না—আতঙ্ক এই যে, এই বেড়ী ছুটিলে কি জানি কোথায় গিয়া পড়ে! এমন কি, সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় দৃষ্টিতে বদ্ধ থাকা হেতু, এই বন্ধন ঘুচিলে কোথায় কি যে অবস্থায় গিয়া ছুটিয়া পড়িবে তাহারও কিছু বুঝিতে পারে না। বহু জন্ম জন্মান্তর পর্য্যন্ত এই ভাবে বদ্ধ থাকায় এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, এই বদ্ধ অবস্থাটাকে আর দুঃখের মনে করে না। গুরুর আহ্বানে সাময়িক প্রাণে উৎসাহ ও উত্তেজনা আসিলেও বেড়ী শুদ্ধ যাইতে চেষ্টা করিয়া বদ্ধ অবস্থার সীমার বাহিরে আর যাইতে পারে না; তখনই নীরব হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে ও আবার সেই অবস্থাকেই সুখের মনে করিয়া নীরব থাকে। আবার প্রাণ যখন উড়ু উড়ু করিয়া উঠে, তখন আবার উঁকি ঝুঁকি মারে; কিন্তু বদ্ধ থাকা হেতু পূর্ব্ববৎ ফলই ফলিয়া থাকে। ইতি

[(৮১)—প]

তুমি তোমার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বরূপেও নাই। বর্ত্তমানে কেবল কতকগুলি কল্পিত সংজ্ঞা-শব্দের সমষ্টিই তোমার আমির রূপ। সুতরাং

*আট গাছি শিকল = অষ্টপাশ বদ্ধ।

তোমার আশৈশব যে সব কল্পনা লইয়া তোমার বর্ত্তমান রূপ বা আকার হইয়াছে, তদনুরূপই তোমার আকার, আবশ্যক ও প্রয়োজন। কল্পনায়ও কখনও গুরু কল্পনা কর নাই, সুতরাং গুরু চিন্তা আসে না বলিয়া আক্ষেপ বা দুঃখ তোমার ভুল। বিশেষতঃ তোমার কল্পনানুরূপ কল্পিত পদার্থ তোমার ইন্দ্রিয়ের গোচর রাখিয়া, তুমি গুরু চিন্তা করিবে বলিয়া যে আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা ধৃষ্টতামাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে, তোমার প্রয়োজনানুরূপই তোমার বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তি কল্পনা। প্রয়োজনীয় পদার্থ ভিন্ন নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তুর চিন্তা অনুধ্যান আত্মা কখনও করেন না। আত্মা আত্ম-স্বরূপ ভুলিয়া, আত্ম-স্বরূপই যে তাহার অভাব ইহা আর বুঝিতে পারিতেছে না। বিশেষ আত্ম-স্বরূপ চ্যুতি বা ত্যাগের পর যে 'উ'-কারের অবস্থা সে সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর অভেদাবস্থা। বর্ত্তমানে সংজ্ঞা ও তৎ প্রতিপাদ্য বিষয় পৃথক ; ক্রিয়াও তাই পৃথক হইতেছে অর্থাৎ 'উ' উচ্চারণ আর 'উ'-অনুরূপ অবস্থা—এই দুইয়ের মধ্যে কোনও তফাৎ নাই। অথচ মিষ্ট শব্দ ও মিষ্ট জিনিস সংযোগে রসনার ক্রিয়া—এই দুই এর যে ভেদ তাহা পরিষ্কারই আমরা বুঝিতে পারি। এই অবস্থায় যে, শব্দের সহিত অবস্থার অভেদ জ্ঞান, এই গাঢ় ভ্রান্তিতেই "গুরুর 'উ'-কার আর গুরু অবস্থাতে ভেদ নাই" এই সত্য বুঝিতে দিতেছে না এবং কিসের অভাব ইহাও এই মূলেই দুর্বোধ্য হইয়াছে।

[(৮২)—আশ্রম]

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে গুরুর কিছুই করিবার নাই ও করাকরিও নাই; কেবল শিষ্যের জ্ঞানের পার্থক্য দ্বারাই গুরুর প্রকাশের পার্থক্য হয়; অর্থাৎ গুরু স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বব্যাপ্য পদার্থ। পার্থিব জীব যে পরিমাণে জাগতিক আসক্তির থেকে দূরে সরে, সেই পরিমাণে গুরুর নিকটবর্ত্তী হয়; বিষয় বাসনার যত হ্রাস হয়, গুরুর জন্য তত বাসনা প্রবল হয়। যত জাগতিক বস্তু জ্ঞান হইতে অদৃশ্য ও অভাব হয়, সেই পরিমাণে গুরু জ্ঞানে প্রকাশ পান। যখন জীবের কেবল বিষয় বাসনা প্রবল, জ্ঞানে আর গুরু জ্ঞান হয় না, তখন ঐ বাসনা অনুরূপই গুরু সংসারে প্রকাশ পান। সেই বাসনানুরূপ গুরু প্রকাশ পাইলেও, গুরুতে যার আকাঙ্ক্ষা-আসক্তি জন্মে না, তাহার জন্য গুরুর আর কিছু করিবার নাই। সংসারে সংসারোচিত ব্যবহারেও গুরুর ব্যবহার যাহাদের অপ্রীতিকর অর্থাৎ গুরু গুরু-রূপে প্রকাশ না পাইয়া সংসারী ভাই-বন্ধু, পিতামাতা, পুত্র-কন্যারূপে প্রকাশ পাইলেও গুরুতে গুরুর গন্ধ থাকায় যাহাদের অসহ্য হয়, তাহাদের জন্য কোন বিধি নাই। ইহার কারণ, আবৃত অগ্নি যেমন উত্তাপ দিতে কাহাকেও বঞ্চিত করে না, সেইরূপ বাহ্য অবয়বে সংসারী বোধ করিলেও গুরু সংসার জ্ঞান অভাব করিতে ত্রুটি করেন না। এই হেতু মোহাবৃত সংসারীরা, অর্থাৎ যাহাদের সর্ব্বাংশে সংসারানুরূপ না হইলে রুচি অনুরূপ হয় না, তাদৃশ ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ভ্রমই ঠিক, ভ্রমানুরূপ কর্ম্ম না হইলে তাহাদের জ্ঞানে রুচি অনুরূপ হয় না, কাজেই ঠিক হয় না। গুরুকে যেরূপেই দেখি না কেন, গুরু-অনুরূপ ক্রিয়া হইবেই হইবে। এ

অবস্থায় মোহ মুগ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষে গুরুর সংসারানুরূপ রূপও বিরূপ। তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সাধন কিছুতেই সম্ভবপর নয়; বরং নানা বিড়ম্বনা ও নরকের পথ প্রশস্ত হয়।

তোমরা লিখ যে, যেরূপে হয় আমাদিগকে তোমার করিয়া নেও। তোমাদিগকে আমার করিতে গেলেই তোমরা বিপদ মনে কর; কারণ আমার অনুরূপ তোমরা না হইলে, তোমরা আমার অনুরূপ হইতে পার না। আমি এত কাল যে চেষ্টা-যত্ন নিলাম, তাহাতে দেখিতেছি তোমরা বরাবরই আমাকে তোমাদের অনুরূপ হইতে বলিতেছ। প্রকৃত পক্ষে গুরুর অন্য রূপ নাই; তাহা হওয়া সম্ভব না; সুতরাং কিছুতেই তোমাদের সহিত আমার এক হওয়া সম্ভব দেখি না। যদি তোমরা আমার হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রকৃতিতে যে কর্ম্মই চাড় বাজে, যৎ কর্ম্ম তোমাদের রুচিকর না, তাহা অভ্যাস কর। দৃষ্টান্ত স্থলে আমি এই বলিতেছি আমার ভিন্ন অন্য যে তোমাদের অনুধ্যান তাহা ত্যাগ কর। আমার প্রিয় কার্য্য ভিন্ন তোমাদের প্রিয় কার্য্যকে তোমরা অপ্রিয় মনে কর। আমার আলাপ ভিন্ন অন্য আলাপ পরিহার কর। 'হুঁ' না করিয়া প্রতিনিয়ত 'সঃ' কর। ব্যক্তি বিশেষের রূপ অনুধ্যান না করিয়া আমার রূপ অনুধ্যান কর। আবরণ না রাখিয়া জগতে প্রকাশ থাকিতে চেষ্টা কর; নচেৎ স্বপ্রকাশ জিনিসে কিছুতেই মিশিতে পারিবে না। ভাল-মন্দ, ঘৃণা-লজ্জা, দ্বন্দ্ব ভাব পরিহার কর। আত্ম হিতের জন্য

অপরের অমঙ্গল পরিত্যাগ কর; সর্ব্ব জীবে দয়া কর, হিংসা বর্জ্জন কর। জগৎ নশ্বর ও ভুল চিন্তা কর। সর্ব্বদা গুরু বাক্য বিশ্বাস কর; গুরুতে দ্বৈধ বিকার আসিলে বিকার ঘুচিবার আর অন্য উপায় নাই। সুতরাং ভাল-মন্দ বিচার থাকিতে স্বীয় প্রকৃতির বিপরীত পদার্থে বিকার রহিত হওয়া কোন্ রকমেই সম্ভব না। এ কথাটি মূল মন্ত্রবৎ যে ধারণা করিয়া রাখিতে না পারিবে, তাহার পতন ধ্রুব। কারণ, ভাল-মন্দ আমার এ মোহান্ধ জ্ঞানে যাহা ঠিক করিয়াছি, গুরুর জ্ঞানে ভাল-মন্দ কিছুই নাই। তাহা হইলেই যে জ্ঞানে ভাল-মন্দ বর্ত্তমান, সেই জ্ঞানে ভাল-মন্দ রহিত অবস্থাই মন্দ দেখিবেই দেখিবে। এজন্য ভাল-মন্দ বলিয়া কিছুই নাই; দেখা যায়, প্রত্যেক অবস্থা অবস্থা-বিশেষে ভাল, আবার অবস্থার পরিবর্ত্তনে মন্দ। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় মাংসাহার অতি গর্হিত ব্যবহার; আবার জীবন রক্ষার জন্য মাংস আবশ্যক হইলে অতি উপাদেয় ও ভাল। নচেৎ ঐ মোহ নিয়াই জগৎ ত্যাগ করিতে হয়; আবার দেহের প্রতিকারণ হয়। সংসর্গ ও অবস্থায় পরবর্ত্তী দেহে কোথায় নিয়া যায়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। যেখানে বিষ প্রাণ নাশ করে, সেখানে বিষ বিষই; আবার যেখানে বিকার রোগীর প্রাণ দেয়, সেখানে বিষ অমৃত হয়, এখন দেখা গেল বিষ সর্ব্বদার জন্য বিষ নয়; অমৃতও হয়। বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এক সত্বাই বা গুরুই অনন্ত রূপে প্রকাশ। সুতরাং ভাল-মন্দ কেবল আমার জ্ঞানের পার্থক্যেই জ্ঞান হইতেছে। যখন জ্ঞানে এই ভাল-মন্দ বর্ত্তমান থাকিবে তখন

সেই এক বস্তুই যে অনন্ত, তাহা কস্মিন্ কালেও ধারণায় আসিবে না। গুরু জ্ঞান বা গুরুতে এক হইতে হইলে ভাল-মন্দ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

তবে এই ভাল-মন্দ পরিত্যাগে মন্দ কার্য্যে আসক্তি আসিতে পারে; এই আপত্তি করিতে পার। জাগতিক আসক্তি যার প্রবল তাহার পক্ষে ও কথা সম্ভবপর; কিন্তু গুরুই যার চিন্তানুধ্যানের বিষয় তাহার কোন কর্ম্মে আসক্তি আসা সম্ভবপর নয়, যেহেতু গুরু-জ্ঞানে কোন কর্ম্মই সম্ভবপর না। অপর পক্ষে গুরু জ্ঞানে যে কর্ম্ম আমার পক্ষে সম্ভবপর সেই কর্ম্ম আমার বন্ধন বা অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে না। কেবল দেহ জ্ঞান প্রবল থাকিয়া বৃত্তি-আদির বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল কর্ম্ম করি, তাহাই বন্ধনের হেতু। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, বৃত্তি আদি বর্ত্তমানেই সম্ভবপর। যেখানে বৃত্তি আদির ক্রিয়া নাই; যেখানে গুরু চিন্তায় দেহাদি বোধ রহিত হয়, সেখানে কোন ঘৃণা-লজ্জা-ভয় সম্ভব হয় না। যদিও দেহের স্বভাবে অলক্ষিত ভাবে তাহাদের কোন কর্ম্ম হয়, তবে স্বপ্নবৎ তৎ কর্ম্মে কোন ফল অর্শে না।

অপর পক্ষে ভাল-মন্দ জ্ঞান বর্ত্তমানে গুরুকেই কেবল পৃথক করিতেছি। যে কোন প্রকারেই হউক ভাল-মন্দ জ্ঞান রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিভিন্ন বোধ-রহিত হইবার নয়; কারণ বিভিন্ন বস্তু ধারণায় আসিয়াই ভাল-মন্দ এই দ্বন্দ্ব ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। গুরুতে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ না করা পর্য্যন্ত অহং অভিমান বর্ত্তমানে এই উপদেশ ধারণা করা অসম্ভব। এজন্য এরূপ ভাবে প্রস্তুত

হওয়া উচিত যে, আমার জ্ঞানে আমি কার্য্য করিতে গেলে ভাল-মন্দ জ্ঞান আসা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কেবল গুরু যখন যাহা বলিতেছেন তাহাই করিয়া যাইতেছি ; আমার ভাল-মন্দ বিচার ভুল, সুতরাং বিচার করিব না, এই অবস্থা শিষ্যের না আসিলে অর্থাৎ গুরুতে সম্পূর্ণ নির্ভর অভ্যাস মূলে না করিতে পারিলে কোন কথাই কার্য্যকরী হইবে না। আমার উপর নির্ভর করিয়া আমার সীমার অতীতে 'আমি' যাইতে চেষ্টা করা আর পাহাড়ের বড় পুষ্করিণীর জল বড় পুষ্করিণীতে তুলিয়া রাখিয়া দিয়া চির জীবন ভরিয়া পুষ্করিণীটাকে জল শূন্য করিবার চেষ্টার মতন হইবে। এই পর্য্যন্ত আশ্রমে স্ব স্ব অভিমতানুসারে কর্ম্ম করা কেহ ত্যাগ না করায়, যে যে ভাবের লোক সে সেই ভাবেই আছে ; কেহ কেহ ভাবের প্রবলতায় স্বীয় পুর্ব্ব ভাব অপেক্ষা অনেক দূরেও সরিয়া পড়িয়াছে।

[(৮৩)—আশ্রম]

যত কিছু গোলমাল আমার নিজের বুঝের মধ্যে। আমি আমার প্রাণ দিয়া তোমাদিগকে ভাল বুঝিলেও, তোমরা অন্য বিষয়, ব্যক্তি, বস্তুতে আসক্ত থাকিলে কিছুতেই আমাকে ভালবাসিবে না, আমার বুঝে আসিবে না, আমার কথা শুনিবে না। কারণ, আমি কিছুতেই অন্য বস্তু অনুরূপ না, অন্য বস্তু জ্ঞানে জ্ঞান হইলেই আমার জ্ঞান বিলোপ হইবে ; আমি গুরু, গুরুর রূপ, গুরুর ব্যবহার যাহা কিছু ধারণা করিতে পার, তাহাই জগতের অন্য বস্তুর জ্ঞানকে বিলোপ করে। আবার অন্য বস্তুর রূপ গুরুকে বিলোপ করে। এই জন্যই

সংসারে সংসারোচিত আত্মীয় কটুম্বিতা পাঁচটা মানুষে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু গুরুকে কুটুম্ব করিলেই অন্য কুটুম্বিতা রাখা হয় না। জগৎ জ্ঞান রহিত হয় যদ্‌বস্তুতে বা ব্যক্তিতে, তৎব্যক্তিতে আসক্ত হইলে জগৎজ্ঞান সম্ভবপর না; আবার জগৎজ্ঞান থাকিতেও তদ্‌ব্যক্তিতে আসক্তি সম্ভবপর না। এ জন্যই সংসারাসক্ত জীবের পক্ষে গুরুতে আসক্তি সম্ভবপর নয় বলিয়াই সংসার গুরু জ্ঞান বিহীন হইয়াছে। এই কথা তোমরা ভাষায় না বুঝিয়া নিজ নিজ প্রাণে তালাস করিলেও দেখিবে, যে স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা, সকলের আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া সংসার করিতেছে ও করিতে পারে, আমাকে নিয়া সংসার করিতে হইলে অপরকে বাদ দিতে হয়। তোমরা তোমাদের পাঁচ জনকে পাঁচ জনে আত্মীয়, বন্ধু রূপে ব্যবহার করিয়া আত্মীয়তা রক্ষা করিতে পার; কিন্তু যখন আমাকে চিন্তা কর বা আমার আত্মীয়তায় উন্মত্ত হও, তখন কোন আত্মীয় বন্ধুকেই মনে রাখিতে পার না। জগতের আত্মীয়তা বাদ না দিলে কিছুতেই আমাকে আত্মীয় মনে করিবে না ও করিতে পারিবে না। এজন্যই "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে" এই কথা উপনিষদ হইতে তুলিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গান বাঁধিয়াছেন। তবে যদি নিতান্তই কেহ আমাকে চাও, তাহা হইলে অপর চিন্তা বাদ দিয়া আমার চিন্তায় নিযুক্ত থাক। সকলেরই এই চিন্তা থাকা দরকার যে, কোন অবস্থায়ই অন্য চিন্তা প্রাণে যে

উপায়ে না আসে, সেই উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এজন্য শঙ্কর জীবের মঙ্গলের জন্য এই বিধি করিয়াছেন "ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।"

অবকাশ মতে বাজে কথা আলাপ না করিয়া গুরু গীতাখানা পাঠ করিয়া তাহার অর্থ বোধ ও মর্ম্ম গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। "গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং জিহ্বাগ্রেযস্যতিষ্ঠতি, তস্য কিং বিদ্যতে মোহঃ পাঠে বেদস্য বৃথা।" এই মহাবাক্য যাহার প্রাণে স্থান না পায়, তাহার প্রাণে গুরুও স্থান পান না; পরে সেই তাহার চিত্তক্ষেত্র মরুভূমি হইয়া পড়িবে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

[(৮৪)—আশ্রম]

এত দিন চিন্তা করিয়া দেখিলাম পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসশীল জিনিসকে আমার ভাবিয়া কেবল যাতনাই সার, সুখ-শান্তি সম্ভবপরই না। যাহাকে আমার মনে করি সে ধ্বংসশীল, সুতরাং তাহার সহিত সম্বন্ধের ধ্বংস নিশ্চয়ই হইবে। অনির্দ্দিষ্ট কতক কালের জন্য অনির্দ্দিষ্ট আত্মীয়তা—আত্মীয়তার সময় একথা মনে না রাখিলে, আত্মীয়তা গাঢ় হইয়া চির আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিয়া পরে তজ্জন্য অনুতাপ ও জ্বালা হইবেই হইবে। আবার আত্মীয়তা ক্ষণস্থায়ী ইহা মনে করিলেও প্রাণের সহিত আত্মীয়তা হয় না; সুতরাং সংসারে আত্মীয়তা করাটাই ভুল। এজন্য ভুলে ভুলানুরূপ ফল হইয়াই জ্বালা হয়—ঠিকের মত কিছুই হয় না। বর্ত্তমানে যে জ্বালা ভোগ করিতেছি ভুলই তাহার কারণ। যে সব প্রাণীকে হাঁটিতে, চলিতে, নাচিতে,

গাহিতে দেখিতেছি, তাহার কেহই থাকিবে না ; ক্রমে ক্রমে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে !! এই সব কলের পুতুল খেলা করিতেছে দেখিয়া, মোহে ঠিক ধারণা হইয়া, ভালবাসা আত্মীয়তা ইত্যাদি হয়। যে আত্মীয়ের সহিত কোন কালে, যুগে বা সময়ে বিচ্ছেদ হইবে না সে আত্মীয়কে আত্মীয় মনে করি না ; যাঁহার সহিত আত্মীয়তায় শান্তি বই বিন্দুমাত্র জ্বালা নাই, যাঁহার আত্মীয়তায় অবস্থান্তর বা পরিবর্ত্তন নাই, সেই পরমাত্মীয় গুরুকে একদিনও প্রাণের সহিত আত্মীয় বন্ধু বলিয়া মনে করি না। মোহে বা ভুলে ঠিক্‌কেই ভুল বুঝিতেছি ও ভুলকে ঠিক বুঝিতেছি। যত ইতি সুখ-দুঃখ আমার বুঝের মূলেই ঘটিতেছে এবং সুখ-দুঃখ আমার বুঝেরই ফল। আমার বুঝই ভ্রান্তিকে ঠিক বুঝাইয়া আমাকে বেঠিক ফল ভোগ করাইতেছে। সঙ্গ, অনুধ্যান, চিন্তা, এ ভ্রান্তির কারণ ; বিপথগামী পথিকের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে ভুল পথে বিচরণ করিতেই হইবে। ঠিক পথ অনুসরণ করে, কোথাও এমন একটি সঙ্গী মিলে না ; অতএব, বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক 'গুরু-চিন্তা' বা গুরু-সঙ্গ ভিন্ন জীবের আর উপায় নাই।

[(৮৫)—আশ্রম]

ভাই, দেশময় সকলেই ঋষিদের বাক্য বুঝে, অথচ কর্ম্ম তার অনুরূপ করিতে পারে না। ইহার অর্থ কি ? আমরা যা করি তাহা কি না বুঝিয়া করি ? সকলই করিতে পারি, অথচ এইটা করিতে পারি না। কৈ, আমরা কি বুঝের বাহিরে কর্ম্ম করি, না

বুঝে যাহা বুঝায় তাই করি? বুঝের বাহিরে আমাদের কর্ম্মই সম্ভব হয় না। বুঝের বাহিরে, জ্ঞানের বাহিরে ত কিছুই নাই। জ্ঞানে এই পরিবর্ত্তনশীল শরীরকেই আমি বুঝিয়া এই অপরিবর্ত্তনীয় স্থির গুরু জ্ঞান জ্ঞানেতে ধারণা করিতে পারে না। কারণ, শরীরটা পরিবর্ত্তনশীল, শরীর আমির পরিবর্ত্তনই আমার পক্ষে ঠিক। এই শরীর-জ্ঞানে গুরু-জ্ঞান অসম্ভবই বুঝাইবে, অতএব দেহ ভুলিয়া গুরু বুঝিতে চেষ্টা কর; নতুবা গুরু-জ্ঞান সম্ভব হইবে না। দেহ-জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া গুরু বুঝাই দরকার, তাহারই চেষ্টা কর।

[(৮৬)—আশ্রম]

এখানে মাঝে মাঝে চিঠি-পত্র না পাইলেও তোমাদের বিরক্তির কারণ নাই; যেহেতু যে চিঠি-পত্র না পাইলে অস্থির হইবে, চিন্তায় চিঠি-পত্র লিখিবে, সে আজও পোলাদের জন্যই ব্যস্ত; বুড়ার জন্য পোলাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্যস্ত, ইহা আমার ধারণা নয়। যে পর্য্যন্ত 'তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই' সে পর্য্যন্তই গোল ও আশঙ্কা। গুরু জ্ঞানের বিষয় হইলে, জ্ঞানে অপর কিছুই থাকে না। অপর থাকিলেই আবার গুরু জ্ঞানের বিষয় হয় না। জ্ঞান হইতে অপর বাদ পড়িলে গুরু ভিন্ন অন্য চিন্তা বা ধারণা সম্ভবপর নয়। এইজন্যই বৈরাগ্য-সম্পন্ন শিষ্যদের গুরুটা যেরূপ মধুর, বিষয়ীর পক্ষে গুরুটা আবার সেইরূপ বিষ। বিষয় বাসনা থাকিলে গুরু চিন্তা ভীষণ অন্তরায় বলিয়াই আর প্রাণ গুরু চিন্তা করিতে চায় না। যে

বিষয় প্রাণ চায় না, তাহা করিতে গিয়া যাতনা লাঞ্ছনা ভিন্ন শান্তি বা স্নুখের প্রত্যাশা কোথায়? প্রবল জ্বরের সময় ডালিমের রস ও মিশ্রি-পানা কিরূপ বিরক্তিজনক ছিল মনে পড়ে কি? তাহা হইলেই যে পর্য্যন্ত (পুত্রেরাও গুরুগত প্রাণ না হইলে) বিষয়ী পুত্রেতে আসক্তি থাকিবে সে পর্য্যন্ত গুরুর থেকে অনেক দূরে। অথবা বিষয়ী পুত্রের আসক্তি ত্যাগ হইয়া কেবল গুরুই অনুধ্যানের বিষয় না হইবে, সে পর্য্যন্ত গুরুর গুরুত্ব ও মধুরত্ব অনুভবে অনুভব হওয়া সম্ভব না।

বিষয় বা বিষয়ীতে আসক্তি থাকিতে আমি (গুরু) তার না; তবে সপ্তর্ষিরা ও শঙ্কর সকলেই এই একটি বিধি করিয়াছেন যে, বিষয় থাকিতে বা বিষয়ীর সঙ্গে থাকিতে যে ব্যক্তি গুরুকে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও বাদ দেয় না আমি (গুরু) তাহারও হইতে পারি। ইহা ভিন্ন যাহার বিষয়ও বিষয়ীর সঙ্গে না থাকিয়া গুরুর সঙ্গেই থাকে, সেও গুরুতেই আছে। ইহা ভিন্ন অন্য বিধি বিধির বিধানে নাই। এই ত্রিবিধ বিধির অতীত জিনিসকে আমি চাই না; সে আমার থাকিতেও পারে না। তোমাদের মধ্যে কে কোন্ বিধির উপযোগী মনে কর, এটা জানিতে পারিলে বড় সুখী হইব।

[(৮৭)—জ]

জ্ঞেয়-পরিশূন্য জ্ঞান জ্ঞানে জ্ঞান হওয়া সম্ভব না; জ্ঞানে জ্ঞান হইলেই জ্ঞানটা জ্ঞেয় রূপে পরিণত হয়; সুতরাং জ্ঞেয় যেরূপ জ্ঞানে অনুমান হয়, সেই জ্ঞেয়ানুরূপই আমাদের ভাল-মন্দ বিচার আসে।

জ্ঞেয় বাদ দিয়া যখন আমার নিজের জ্ঞানেই অনুমান হয় না এবং আবার যখন জ্ঞেয়ের পার্থক্যে জ্ঞানের ভেদ হয়, তখন গুরুকেই জ্ঞেয় রূপে ধারণা করিয়া জ্ঞানের ভাল-মন্দ বিচার করিবে ; নচেৎ কিছুতেই স্বরূপ জ্ঞান লাভের উপায় নাই।

[(৮৮)—জ]

বাবা, জ্ঞেয়-পরিশূন্য জ্ঞান জ্ঞানের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। যে পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে আমাদের জ্ঞান হইতেছে, জ্ঞেয় বাদ দিয়া সেই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব হয় না ; আবার জ্ঞেয়ের পরিবর্ত্তনে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সদসতের পরিবর্ত্তন হয় ও তৎ সঙ্গে আসক্তি অনাসক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে। এ অবস্থায় জ্ঞেয় পরিবর্ত্তন করিয়াই জ্ঞানের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে সন্দেহ নাই। যতক্ষণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু জ্ঞেয় থাকিবে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলিকে ঠিক ধারণা করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয় জ্ঞান অভাব করে যে গুরু, সেই গুরুকেই জ্ঞেয় করা—জ্ঞানের স্বরূপে যাওয়ার একমাত্র উপায়। যে পর্য্যন্ত গুরুই জ্ঞানে জ্ঞেয় না হইবে, সে পর্য্যন্ত জ্ঞেয়ের পার্থক্যে জ্ঞানের ভেদ হইয়া ভাল-মন্দের ভেদ হইবেই। তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় গুরুই কেবল জ্ঞেয়, ইহা কখনও সম্ভব নয় ; তাহা হইলে চাকুরী কিছুতেই করা যাইতে পারে না। আমি তোমার একমাত্র প্রিয় পদার্থ বর্ত্তমানে হইলে, অপর কতকগুলি

নিরুপায় প্রাণী নিরুপায় হইয়া পড়ে, এই চিন্তায় প্রাণের ভিতরে জগৎ চিন্তা অভাব হইয়াও 'জগতের' চিন্তা আছে, ইহা প্রকাশ করিতে রাজী নই। বাবা, এবম্বিধ চিন্তার পার্থক্যে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবেই; চিন্তার অর্থই জ্ঞানের পার্থক্য। জ্ঞানের পার্থক্যই জ্ঞেয়ের প্রকার ভেদ। ঐ প্রকার ভেদের সঙ্গে সঙ্গে গুরুতে আসক্তি অনাসক্তির ভেদ হইবে। কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বনে স্থির থাকিয়া তালাস কর; জ্ঞেয়ের ভেদ হইয়া যে জ্ঞানের ভেদ হয় এবং কোন্ জ্ঞেয় জ্ঞানে থাকিয়া জ্ঞানের স্বরূপের অভাব করে এবং জ্ঞেয় কি হইলেই বা জ্ঞান স্বরূপে থাকে—এই সংস্কার যখন দৃঢ় হইবে, তখন গুরুতে স্বতঃই আকৃষ্টতা আসিবে।

[(৮৯)—প]

এ কলিতে যে গুরুর জন্য ব্যাকুলতা, এ যুগ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ; সুতরাং যুগ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বিষয়ে যাতনা পাইতেই হইবে। বাবা, কেউ এ কলিতে কলিকে ভুলিয়া, আবার সত্যানুরূপ ব্যবহার জীবকে দেখাইল না। মাকে বলিবে এই মাতৃহীন ভারতে গুরু ছাড়িয়া আসিয়া আমার প্রাণ রাত দিনই হা-হা করে। এই নশ্বর সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া সেই গৌরবান্বিত ব্রাহ্মণ বংশের গৌরব রক্ষার জন্য আমার—কি চেষ্টা করিবে না? এখানে আসিয়া মনে হইতেছে, মার গলা ধরিয়া মা মা করিয়া কাঁদিয়া কেন প্রাণের জ্বালা কতক শান্তি করিয়া আসিলাম না।

[(৯০)—জ]

যতই কেন চেষ্টা যত্ন কর, নিজের চিন্তানুধ্যানানুরূপ জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই জ্ঞানানুরূপই ঠিক বুঝ। জ্ঞানটা চিন্তানুধ্যানে যে পরিমাণে ঠিক হয়, ঠিকও তদনুরূপই বুঝ; সুতরাং স্বরূপ ঠিকের ঠিক হয় কিনা তাহা ঠিক করিয়া দেখিবে। তবে সর্ব্বদা যদি এক গুরু চিন্তা থাকে এবং গুরুচিন্তানুরূপ জ্ঞানে এই দৃশ্যমান জগৎ যাহা জ্ঞান হয়, তাহা ঠিক না বলিয়া আর বলিবার কিছু নাই। তখন অন্য কিছু বলিতে হইলেই অন্যানুরূপ ঠিক আসিয়া ঠিক বুঝায়। যদি অপর জ্ঞানের বিষয় থাকিয়া জ্ঞান ঠিক থাকে, তাহা হইলে নিজের মত অপরকেও বুঝিতাম। অপর বুঝ্ আসিয়াই যখন নিজের মত বুঝি না, তখন অপর বুঝ্ বর্ত্তমানে কিছুতেই ঠিক বুঝিতে পারি না। তুমি গুরু চিন্তা কর, এই আমার বলিবার বিষয়।

গুরুমূর্ত্তিং স্মরেন্নিত্যং গুরুনাম সদা জপেৎ॥
গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥

এই শ্লোকটা ঠিক বুঝি ও তোমাকে ঠিক বুঝিতে কই।

[(৯১)—জ]

বাবা, সাংসারিক বাধা-বিঘ্নে গুরু চিন্তার বাধা জন্মিলে, গুরু গুরুই নয়; নিজের সংস্কারানুরূপ জ্ঞানই গুরু। জ্ঞান দিয়াই গুরু বুঝি; যে পর্য্যন্ত সংস্কারানুরূপ জ্ঞানের গুরুত্ব থাকে, সে পর্য্যন্ত গুরু জ্ঞানের বিষয় হয় না। যেহেতু গুরু সংস্কার বর্জ্জিত; সংস্কার থাকিলে গুরু বুঝা যায় না অথবা গুরু বুঝিলে সংস্কার থাকে না। আত্মা ইন্দ্রিয়-

জ্ঞানের সংস্কার বিশিষ্ট হইয়াই 'মন'—উপাধি-বিশিষ্ট হয়। সুতরাং মন কিছুতেই গুরু বুঝে না; গুরু বুঝিয়াই মনের বিলয় করিতে হইবে। গুরু চিন্তানুধ্যান ব্যতীত মনের কোন সংস্কার বিলয় হয় না। মনে হয় আজ দুই মাস যাবৎই আমি তোমার কাছে আছি; তথাপি কেন এত উদ্বিগ্ন বুঝিতে পারিতেছি না। একটু মনোযোগ করিলেই আর আমাকে দূরে দেখিবে না।

[(৯২)—আশ্রম]

কেহই অপর কাহারও কথাতে গেলেই গুরুতে থাকে না এবং নিজের প্রকৃতি অনুরূপ কথাবার্ত্তায় থাকিতে হয় এবং গুরুকে ভুলিয়া থাকিতে হয়। স্বীয় প্রকৃতিতে গেলেই আর গুরু থাকে না; গুরুকে রাখিতে হইলেই আমি আর গুরু, ইহা ভিন্ন অন্য চিন্তা হৃদয়ে স্থান না দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি কলিকাতাতে আসিয়া বিন্দুমাত্রও শান্তি পাইতেছি না; আশ্রমে থাকিতেও এক সেকেণ্ড সময় শান্তি ছিল না। এখন দেখি শান্তির স্থান গুরু ভিন্ন অন্য কিছু নাই। তাই আজ বারবার মনে হইতেছে যে, কি আশ্চর্য্য মোহ ও ভ্রম। যাহা অশান্তির কারণ তাহাই আকড়িয়া ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছি। বুঝিলাম প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়াই আরাধনার ধন ভুলিয়া রহিয়াছি। যাহা অনন্ত কালের দুঃখদায়ক অর্থাৎ প্রকৃতি, তাহাই আমার বাঞ্ছনীয় এবং যাহা অনাদি কাল পর্য্যন্ত সুখের নিদান (গুরু) তাহা ভুলিয়া, এই দুঃখকেই নিজে আহ্বান করিয়া আনিয়া নিজে হায় হতাশ করিতেছি। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি দুঃখের হেতু আমার আমি।

গুরু ভিন্ন অন্য চিন্তা যাদের নাই, তেমন সঙ্গীর সঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গ করিব না ; সুতরাং তোমাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আশ্রমে এমন কে আছ ? যদি কেহ না থাক, সে আমার নয়। ইহা আমি যতদিনে ঠিক রাখিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আর গুরু চিন্তা ভিন্ন অন্যের চিন্তা করিব না। বিষয় চিন্তা আর বিষয়ীর চিন্তা একই কথা। আর বিষয়ী বা বিষয়ের চিন্তা করিয়া এ বিষের জ্বালা আমার আর সহে না। আমাকে ছাপ উত্তর দিবে কে কেবল গুরু চিন্তা অর্থাৎ আমার চিন্তা করিতে রাজী ও করিতেছ ? আশ্রমের সকলেই এখন গুরুর নিকট অকপট ও সরল। এবার আমার এই জিজ্ঞাস্যেই অকপট সরল ভাল করিয়া বুঝিব ! সর্ব্বদাই সতর্ক না থাকিলে অলক্ষিত ভাবে আমার আমি অনুরূপ চিন্তা ও জ্ঞান আসিয়া আমাকে ভ্রান্তিই ঠিক বুঝাইবে। ভ্রান্তি ঠিক বুঝিলে আর আমাকে বিন্দুমাত্রও বুঝিবে না ; বরং বিরূপই বুঝিবে ; সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন গুরুর ইষ্ট-কার্য্য, গুরু চিন্তা, গুরুর আদেশানুরূপ কর্ম্ম করা ও গুরুর প্রিয় বস্তু প্রিয় মনে করা এবং গুরু গুরু ধ্বনি ও গুরুর উপদেশানুরূপ সন্ধ্যা বন্দনা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম যে-ই করে সেও চিন্তার বিষয় হইলে, তাহার সহিত আর আমার সম্বন্ধ থাকিবে না।

[(৯৩)—যো]

তুমি মনে কর—আমি প্রাণের সঙ্গে তোমাকে ভালবাসি না ; কিন্তু আমার প্রাণ তোমার আড়ালে থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ভালবাসে। বাক্য-ভাষায় তোমাকে বুঝাইতে গিয়া আমি তোমাতে

আছি, তুমি ইহা বুঝিলে তুমি আর আমাতে আসিতে চাহিবে না। আমি দেখি, আমি তোমাকে চাই না বা চাই ইহা কিছু না জানিয়া তুমি আমাকে চাইতে চাইতে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া, আমার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পার কিনা তাহার চেষ্টায় আছি।

সর্ব্বদা মনে রাখিবে এ জগতের সুখ ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর। তজ্জন্য সেই অমূল্য ধন গুরুকে হারা না হও। এই দেহের পরিবর্ত্তনে সকলেরই পরিবর্ত্তন হইবে; এই দেহের ধ্বংসে সকলই ধ্বংস হইবে, কিছুই থাকিবে না; এমন কি, শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন যাহা মধুর মনে করিতেছ, তাহা আর মধুর মনে করিবে না। আজ কপি ও বেগুণ পাঠানের জন্য ব্যস্ত; প্রাণ ভরিয়া চিঠি লিখিতে পারিলাম না।

গুরুর যাই মিষ্টি লাগে তাহা গুরুগত প্রাণ জীবের মিষ্টি লাগাই স্বাভাবিক। আমি বড় আগ্রহের সহিত কপি ও বেগুণ পাঠাইতেছি। ভোদি'কে জিজ্ঞাসা করিবা এই আগ্রহটা কি জন্য? যেদিন কেবল সর্ব্বাবস্থায়ই গুরুকে মধুর মনে হয়, সেই দিন আর জগতে দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান থাকে না।

[(৯৪)—আশ্রম]

তোমরা সর্ব্বদা পড়া-শুনা ও সন্ধ্যা আহ্নিক নিয়া থাকিবা; বাজে বিষয়ে যত আলোচনা করা হয়, ততই গুরুকে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। কেননা আমরা যখনই যে বিষয় নিয়া কোন আলোচনা বা আলাপ করি, তখন উহাকে সত্য বলিয়া ধারণা দৃঢ়বদ্ধ করিতে থাকি। যেস্থলে

বিষয়কে সত্য বলিয়া ধারণা, সেস্থলে গুরুর স্থান কোথায়? অতএব গুরুপদ প্রার্থনীয় হইলে বাজে বিষয়ের আলোচনা ও বাজে আলাপ বাদ দিয়া, সর্ব্বদা গুরু গুরু করা ও গুরুর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলা ব্যতীত উপায় নাই।

[(৯৫)—আশ্রম]

তোমাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা কোনও প্রয়োজন ভিন্ন কোন কর্ম্ম করি কিনা এবং আবশ্যক বোধ না করিলে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করি কিনা? যদি প্রয়োজন অভাবে কোথাও যাতায়াত না করি, তাহা হইলে এই সংসারে অবশ্য কোন প্রয়োজন বশে আসিয়াছি। সেই প্রয়োজন কি, চিন্তা অনুষ্ঠান করিলে কি বুঝায়? আমরা যা করি সমস্তের মূলে বাসনা; বাসনারও বাসনা নিবৃত্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখিতে পাই, আমরা যাহা করিতেছি তাহাতে উত্তরোত্তর বাসনার বৃদ্ধিই পাইতেছে; কোন কাজেই বাসনা নিবৃত্তি হয় না। কেবল 'গুরু-চিন্তা' ও 'মূলমন্ত্র' ভিন্ন বাসনা রহিত অবস্থা এক মুহূর্ত্তও সম্ভবপর নয়। যাহাতে বাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, নিবৃত্তি হয় না, এমন ব্যাপারে এবং এমন বিষয় চিন্তা অনুধ্যানে থাকিয়া যে বাসনার বশে এ সংসারে যাওয়া আসা করিতেছি, তাহা নিবৃত্তি হওয়া কি সম্ভবপর?

আবার বাসনার বিষয়-ভেদে চিন্তা অনুধ্যানের পার্থক্যে আমার ভেদ হইতেছে; এ অবস্থায় আমি এক রূপ ভাবে এক অবস্থা নিয়া

সংসারে যে যাওয়া আসা করিব তাহা কি সম্ভবপর ? দেখিতে পাই, জগতে অনন্ত প্রকার প্রাণী বর্ত্তমান এবং অনন্ত প্রকার প্রকৃতি, অনন্ত প্রকার আকার এবং অনন্ত প্রকার ব্যবহার। যে বাসনা মূলেই জগতে আসা যাওয়া, সেই বাসনার পার্থক্যই কি এই পৃথকত্বের কারণ নয় ? প্রাণে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ আদর্শ অনুধ্যান না থাকিলে, শ্রেষ্ঠ জন্ম ধারণ করাও সম্ভবপর নয়। বাসনার বিরতি না হইলে জন্ম মৃত্যুর কারণ বিরতি হইবে না। সে কথা দূরে থাকুক, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা না থাকিলে নীচ জন্ম অর্থাৎ পশ্বাদি দেহ ধারণের বাধা কে জন্মাইবে ? প্রাণে কতই কি বাসনা আসিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলিয়াছিলাম—তোমাদের উচ্চ আদর্শ, উচ্চ চিন্তা, এই পার্থিব নরক-বাসনা-রহিত হইয়া লোকে তোমাদের দেবীমূর্ত্তি দেখিবে। হায়, কতকাল চলিয়া গেল, আজও তোমরা পশ্বাদির উপভোগ্য আহার ব্যবহারাদি করিতে উন্মত্ত। কি করিলাম, কেন করিলাম, ভাবিয়া আমি ব্যাকুল হইতেছি।

[(৯৬)—জ]

তুমি যে বিজ্ঞাপন দিয়া গুরু মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছ, ইহা আমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝি এবং তাহাতে আমার অমত। গুরু জিনিসটা সত্য যুগেই উপাস্য ছিল ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরই উপাস্য। এই মিথ্যা প্রতারণার দিনে গুরু জ্ঞানের বিষয় না। সিদ্ধাশ্রম-ভ্রমণ বৃত্তান্ত কোন কাগজ-পত্রে প্রকাশ হউক, আমি এরূপ ইচ্ছা করি না। কখনও আমি উহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি নাই; পশুপতিনাথই

একবার কাগজ-পত্রে লিখিয়াছিল, তাহার যে কি বিষময় ফল ফলিয়াছিল তাহা বোধ হয় তুমি অবগত নহ। বর্ত্তমান হুজুগের সময় সিদ্ধাশ্রমটা কাগজ-পত্রে উঠে, ইহা আমার মত নয়। বিশেষতঃ এ সময়ে আমাকে একটা কেষ্টবিষ্টু করিয়া তোলা আমার যাতনারই কারণ হইবে। প্রকৃত সাধনার পিপাসা জন্মিলে ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ও হইবেন। তাই বলিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষকে অবতার মনে করা, আমি অতি ঘৃণা করি। গুরু জ্ঞানে জ্ঞান হইলে গুরুকে অবতার বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রকৃত শিষ্য লজ্জা বোধ করিবে; যেহেতু তিনি নাম রূপের অতীত।

—০—

[(৯৭)—আশ্রম]

বর্ত্তমান যুগে শিষ্যের মাথা বেদনা, পেটের বেদনা, উদরান্নের সংস্থান ও সুখ-দুঃখ বিধানের জন্যই গুরুর আবশ্যক হয়। শারীরিক সুখই যাহাদের বাঞ্ছনীয় তাহাদের গুরু নেওয়ার আবশ্যকতা কি? তাহারা গুরু নিলেই উপরি উক্ত কারণে নিবে; নচেৎ গুরুর আবশ্যকতা নাই। সংসারে পরস্পরের সুখ-দুঃখের জন্য পরস্পর সম্বন্ধ। আমি কলিকাতা থাকিয়া মসুরীর ডাইল আর ভাত খাই; কিন্তু ফজ্‌লী-আম, রসগোল্লা ও ডাব-নারিকেল সর্ব্বদা তালাস করি; তবুও যদি তোমাদের আত্মীয়তা লাভ না করিতে পারি, প্রিয়পাত্র না হই, তবে আর কি করিব? 'কচু ক্ষেতের কচু উঠাইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছ'—এখানে এ সংবাদ লিখিবার কারণ কি? আমরা

রসগোল্লা, ডাবের জল, ফজ্‌লী আম খাইয়া, কচুর নাম শুনিলে লাফ দিয়া উঠি। দুর্ল্ভ মানব দেহটা পাইয়া রসনার তৃপ্তি না করিলে জন্মটা বৃথা যাইবে—ইহা কি তোমাদের চিন্তায় আসে না? আর কেন আমাকে ভোলাও, ভোগ স্পৃহা প্রবল থাকিতে গুরু-জ্ঞান চট্টগ্রামের 'মামা-শ্বশুর—ভাগিনা-বৌএর মতই'। প্রাণ চারিদিকের রোগী আর ভোগীর সংবাদে তৃপ্তি বোধ করে না।

কলিকাতার পলিছি (policy) আর পৃথিবীর ধর্ম্ম-জ্ঞান, এই উভয়টা এক রকমই। ধর্ম্ম বলিলে জ্ঞানের একটা বিষয় ভিন্ন অন্য কিছুই নয়; জ্ঞানের যাহা বিষয় নয়, তাহা কিছুই নয়; সুতরাং আমার এই ধর্ম্ম যে কিছুই না, তাহা জগৎপুর আশ্রমের দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। তোমরা যাহা কিছু দেখ, শুন, স্পর্শাদি কর তোমাদের 'তুমি'ও সেইরূপ; সুতরাং তাহার বাহিরে ধর্ম্ম একটা অধর্ম্ম বলিয়া উহা আর কিছুই না। যে বস্তুটা জ্ঞানে যদ্রূপ জ্ঞান হয়, জ্ঞানও তদনুরূপই হয়, নচেৎ জ্ঞানে জ্ঞান হওয়ার সম্ভব হয় না। এই কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে এক পদ আসিল।

তোমায় ভুলে গেলে অমনি পড়ি ভুলে।
অম্‌নি ভুলই ঠিক্, ঠিকই ভুল হ'য়ে যায়, গুরু,
সেইকালে॥
বুঝ্‌ দিয়া বুঝ্‌তে গেলে, বুঝ্‌ মত ঠিক সকলে বলে;
বুঝের বাইরে হৃদ্‌কমলে তুমি থাক দ্বিদলে॥
বুঝিবার ইচ্ছা বুঝে অভাব, তবু আমার এম্‌নি স্বভাব,
বুঝ্‌ ভুল বুঝি না কোন কালে॥

'বসন' কয় বুঝে বুইঝে, তাঁকে কভু পাবি না খুঁজে ;
বুঝ. ভু'লে রও গুরুর কোলে ॥

যে ভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে যেরূপ আচার ব্যবহার থাকা আবশ্যক, তদ্বিপরীত কথাবার্ত্তা সংসর্গ ও আচার-ব্যবহার করিয়া ঐ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার যে ইচ্ছা, তাহা একটা কল্পনামাত্র। কেননা, সঙ্গ ও আচার-ব্যবহার-মূলে সর্ব্বদাই জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। তাই বর্ত্তমানে যাহা উচিত ও প্রার্থনীয় বলিয়া জ্ঞানে জ্ঞান হইতেছে, সঙ্গ ও আচার-ব্যবহার মূলে জ্ঞানের বদল হইয়া গেলে আর উহা উচিত বা প্রার্থনীয় বিষয় বলিয়াই জ্ঞানে জ্ঞান হইবে না। এই হেতুই ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরু-গৃহে, গুরু-সঙ্গে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যানুরূপ আচার-ব্যবহার বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। অনুধ্যানের-ও পার্থক্যে যে জ্ঞানের পার্থক্য ঘটিয়া যায়, তাহা প্রতিনিয়তই দেখিতেছ। জ্ঞান সর্ব্বদাই অনুধ্যেয় বিষয়ানুরূপ হইয়া যায়। তাই যার অনুধ্যানে জগৎ জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাকে সতত অনুধ্যান না করিয়া বিষয় ব্যাপারের অনুধ্যানে, বিষয় ব্যাপার ভুল বলিয়া কস্মিন্ কালেও জ্ঞানে জ্ঞান হইবে না।

[(৯৮)—ন, স্থ]

অদ্য তোমাদের উভয়ের চিঠি পাইলাম। আমি বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই প্রতারিত হইয়াছি। আমি এ যুগে সকলের চক্ষের শূল। চৈতন্যদেব চৈতন্য-হইয়া দেখিলেন গুরুকে কেহ ভাল বাসে না, গুরু বলিয়া কেহ সুখ পায় না। গুরু বলিবার অধিকারী

কেহ নাই, গুরু বলা কষ্টকর ; অতএব জীবকে হরি হরি বলার জন্য বলিলেন। আবার পরে ক্রমে বর্ত্তমানে যে সম্প্রদায় একটা গঠিত হইয়াছে, তাহারা বিদ্বেষ ভাবে গুরু শব্দ বদলাইয়া উপাচার্য্য বলিয়া বসিল এবং গুরু শব্দ ভ্রমাত্মক, গুরু আবার একটা মানুষ কিসে সম্ভবে ? মানুষকে কেন গুরু বলিব—বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রকৃতিতে গুরু বলা বিরুদ্ধ না হইলে, এই সম্প্রদায়ের এই বিদ্বেষ কেন ? পরিষ্কার দেখা যায়, গুরু বলা তাহাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

আমরাও যত গান সঙ্গীত কথাবার্ত্তাদি বর্ত্তমানে বলি, সেই সব কথার অধিকাংশই গুরুর বিপরীত লঘু নিয়া। এজন্য আরও বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে সম্প্রদায় বিশেষে গড্, আল্লা, ইত্যাদি বলে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও গণেশ, সূর্য্য, শক্তি, শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি শব্দ দিয়া উপাসনা করে ; কিন্তু 'গুরু' বলিয়া কোন সম্প্রদায় বলিতে চাহে না। ঐ শব্দগুলি অনুধ্যান চিন্তা করিলে দেখা যায় যে ঐগুলি ঈ-কারের ঘাটের উপরে আর উঠে না। ঈ-কারের ঘাটের উপরে আমাদের কথাবার্ত্তা, সঙ্গীতাদি কোন ব্যবহার দেখা যায় না। ইহা দ্বারা পরিষ্কারই প্রমাণিত হয় যে গুরু শব্দ আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধ ; সুতরাং আমাকে সর্ব্বদাই এই উপদেশের জন্য লোকের নিকট অশ্রদ্ধেয় ও অপ্রতিভ হইতে হইবেই হইবে।

আমি আগে মনে করিয়াছিলাম মা, বাবা, আমাকে গুরু গুরু

শুনাইবে; মা শ্রদ্ধার সহিতই গুরু গুরু করিত, তার গুরু গুরু কেহ শ্রদ্ধা করিয়া গ্রহণ করিত না বলিয়া, মা পলাইয়া গেল। বাবা সেয়ানা লোক, মার পলায়ন দেখিয়া বুঝিল, কেবল গুরু গুরু করিলে পলাইতে হইবে; তাই গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভো, ভো, এ, ও সাত পাঁচ জোড়া দিয়া গুরু গুরু আরম্ভ করিল। গুরু বুঝিলেন নাই মামা হইতে কাণা মামা ভাল, যেটুকু পাই তাই ভাল।

পরে এই অবস্থায় ধীরেন্দ্র আর নগেন্দ্রমোহন আসিয়া জুটিল, মনে করিলাম এরা বুঝি পূর্ণমাত্রায় গুরু গুরু করিবে। যে সময়ে ইহা ভাবিলাম, সে সময়ে গুরু গুরু যে প্রকৃতির বিরুদ্ধ, তাহা প্রকৃতিতে বুঝিতে দিল না। কারণ, যখন গুরু গুরু করিবে ইহা প্রকৃতির উদ্রেক হইল, তখন প্রকৃতির বিরুদ্ধ গুরু গুরু করা— এ জ্ঞানটা ভুল হইল, তখন নাচানাচি লাফালাফি কতই করিলাম। পরে দেখি প্রকৃতিতে গুরু গুরুটা বিরুদ্ধ বলিয়া বিরুদ্ধভাবে কেবল বলে জোরে গুরু গুরু করা; গুরুটা স্বাভাবিক হইয়া স্বভাবতই অভ্যস্ত ব্যাপারানুরূপ হইতে পারিল না। তখন হা হাতোস্মি উঠিল; বিশু আসিয়া জুটিল। আমার সহস্রারের সহস্রদল পদ্ম একেবারে ফুটিয়া গেল। আর অভাব নাই, আর দুঃখ নাই, বিশুর মত আমার কেহ নাই। আমি ক্রমে বিশুরে গুরু গুরু করাইতে গিয়া আমারই গুরু গুরু বন্ধ হইয়া গেল—হইতে লাগিল কেবল বিশু, বিশু। তিন চারি বৎসর এই বিশু বিশু জপে দেখি, আমি এক অসুরবৎ গুরু বিরোধী; গুরু শব্দ কেহ করিলেও ভাল লাগে না।

শেষে মনে হইল আমি কোথায়? তালাস করিয়া দেখি আমি নিদ্রাকাল বাদ দিয়া সব সময় বিশুতে। যার ধ্যেয় বিষয় বিশু, বিশু তারে ভুলিয়া যায়, এ কেমন গুরু ভক্তি! আর আজকাল বিশু বিশু মনে আসিলেও আমি বিশু বাদ দিয়া পিশু পিশু করি; কিন্তু বিশু এমন অভ্যস্ত যে পিশু আসে, তবু গুরু আসে না। অর্থাৎ বিশু অনুরূপ শব্দই আসে, বিশুর বিপরীত গুরু শব্দ আসে না।

আমিত ভুলিয়াও বিশু নগেন ভুলিতে পারি না। তোমরা কেমনে ভুল? আমার মনে হয় তোমরা বড় সেয়ানা। তোমরা খুব বেশী গুরু গুরু কর, তাই বুঝিয়াছ কি করিলে যে করা হয় তাহা বুঝ না। নইলে, ইহা কিরূপে সম্ভবে? ২৪ ঘণ্টা শয়নে, স্বপনে, আমার ডাহিনে, বামে তুই এম্-এ উপাধিধারী—আমি কৌপীন আটা শীর্ণ কলেবর, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, জগতের মঙ্গলই জীবনের মহাব্রত; এবং সঙ্গে স্থির ধীর মূর্ত্তি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় আমার চন্দ্রনাথ। অন্য মূর্ত্তিগুলি পত্রে পত্রে আবডাল রহিল এই ছবি দেখিতেছি, এ অবস্থায়ও গুরু পারিলেন না, হইল না, গেল না, গেল না, গেলাম রে, মৈলাম রে, এসব উক্তিতে গুরুতে বিশ্বাস নাই ও নির্ভর নাই, ইহা ভিন্ন আর কি প্রমাণ হয়? যাহাদের নিকট বিশ্বাসের পাত্র হইলাম না তাদের কাছে বিন্দুমাত্রও গৌরব নাই। বাকী জীবনে আর নাচানাচি করিব না, ইহা তোমাদের দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল। যাহা হউক, বাছারা যেভাবে ভাল বুঝ এখন তা-ই ভাল বুঝি।

[(৯৯)—ন, স্থ]

বৎস, প্রাণের অবস্থা কিছুতেই যেন শান্তিপ্রদ নয়। বাবা, আমার ত সংসারে কেহ বন্ধু নাই; তুমি তোমার জ্ঞানে জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত যত স্থানে বেড়াইয়াছ, যত লোকের সঙ্গে রহিয়াছ, কা'র মুখে শুনিয়াছ "দীনবন্ধু গুরু, তুমি একমাত্র বন্ধু"? কোথাও কি দেখিয়াছ গুরুকে বন্ধু মনে করে? যদি না দেখিয়া থাক, তবে আমার বন্ধু কোথায়? আমাকে বন্ধু বলা দূরে থাকুক, তাহা হইলেও যাতনা মনে করে। এখন দেখি অন্যের কথা দূরে থাকুক আপনাকে বন্ধু ভাবিতে গিয়া আমিও আমার বন্ধু নাই। কেবল প্রাণ ২৪ ঘণ্টাই অস্থির; সংসারীর বিরাম নাই; কিন্তু প্রাণের বিরামের যেন আর বেশী দিন বাকী নাই।

[(১০০)—ন, স্থ]

তোমার চিঠিতে জানিলাম এবারকার চিঠিগুলি বড়ই মধুর বোধ হইতেছে। তাহার তিনটা কারণ হইতে পারে। এক, গুরুতে বেশী আকৃষ্টতা আসিলে গুরু যা বলেন সবই মধুর মনে হয়, ইহার দৃষ্টান্ত মুখ-চোক-নাক বোচা, গাল ফুলা ছেলেকেও মা বাপ ভাল দেখে। দ্বিতীয় কারণ, ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে অবস্থানুরূপ কথা পড়িলেই প্রাণে বড় ভাল লাগে—যথা পুত্র শোকাতুর ব্যক্তি পুত্র শোকোক্তি শুনিলেই তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তৃতীয় কারণ, উপাদেয় কথা উপাদেয় লাগে। তোমার, ইহার কোন কারণে ভাল লাগে, ইহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইতেছে।

বস্তুর জ্ঞান ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন যেরূপ বুঝি, তৎ সংস্কার দ্বারা সংস্কারের স্মৃতিতে সেরূপ বুঝি না। সুতরাং বর্ত্তমান জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপারকে অতিক্রম করিয়া সংস্কারের স্মৃতি প্রবল হইতে পারে না, বা জাগে না। কারণ মন বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় জ্ঞানেই বদ্ধ থাকে, পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিবার অবকাশ পায় না! এইজন্যই পূর্ব্ব উপদেশাদি ভুল হইয়া বর্ত্তমান জ্ঞানে মন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞান কেন, সংসার জ্ঞানও আমরা রাতদিন ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে নানা কর্ম্মাদি করিয়া, তজ্জন্য প্রাণে যে গুরুতর আঘাত পাই এবং সেই আঘাতের দরূণ তৎ কর্ম্মে যে নিবৃত্তি আসে, তাহাও বর্ত্তমান জ্ঞান ভুল করিয়া দিয়া আবার সেই কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মায়। ইহা দ্বারা পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে সংস্কার বর্ত্তমান জ্ঞানানুরূপ জ্ঞানে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। এ অবস্থায় সংসার সমুদ্রের ধ্রুব নক্ষত্র স্বরূপ গুরু প্রতিনিয়ত স্মৃতিতে থাকিলে বর্ত্তমান জ্ঞান প্রতিনিয়তই ভুল প্রমাণ হইবে। যেহেতু আমাদের অহং জ্ঞানানুরূপ ক্রিয়া গুরু হইতে বা হুঁ-র উ-র ঘাট হইতে দূরে নেয়, গুরু সর্ব্বদা প্রাণে জাগ্রৎ অবস্থায় থাকিলে ইহা অনুভব হইবেই হইবে।

এবার চিঠিতে—বাবুর কোন কথাই উল্লেখ করিলাম না; কারণ তাহার ধারণা যে বিশুই আমার জীবনের লক্ষ্য। ইহা সে বুঝিলে ভুল বুঝিয়াছে। তার নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ছিল যে, যখন আমি গুরু ভিন্ন বুঝি না, তখন গুরু আমাকে ভিন্ন কেমন করিয়া বুঝেন? যদি কোন গোল না থাকে, তবে গুরুতে

কোন গোল থাকা সম্ভব নয়। বাবা, আমি সত্য কথা—বলিতে কি, আমি যখনই চিন্তা করি কি খাদ্য আমার পক্ষে সুখজনক, খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি কিছুই না। আবার যখন ছেলেদের বিষয় চিন্তা করি, কাহাকে আমি অধিক ভালবাসি, তখন দেখি যে কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এ কথাটি আমার প্রাণের স্বরূপ কথা লিখিলাম। সংসারে দেখি বাপ মায় ছোট ভাইকে ভালবাসিলে বড় ভাই সুখী হয়, এখানে তার বিপরীত।

[(১০১)—ন, সু]

ব্যস্ত অস্থিরতার কোন কারণ দেখি না। যাহা তাঁহার ইচ্ছা সেইটুকু পূর্ণ কর এবং যাহা মানুষ পূর্ণ করিতে পারে, তাহাই তোমাদের উপর পূর্ণ করিবার ভার। তাঁর পূর্ণ করিবার বিষয় তিনি পূর্ণ করিবেন, ইহা স্থির বিশ্বাস কর। একটা ভুলকে ভুল প্রমাণ করিতে গুরুর শক্তির অভাব হইলে, ঠিক যে ঠিক নয় ইহাই প্রমাণ হইবে। তোমরা তোমাদের পরীক্ষা পাশ করিয়া আমাকে পরীক্ষা কর, আমি পাশ হই না 'ফেইল হই—ইহা বুঝিয়া আমাকে ছাড়া উচিত। তোমরা পাশ না করিলে, আমি ফেল করার নিকট পরীক্ষা দিতে বাধ্য না। তোমাদের যদি আমাতে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তোমাদের উদ্দেশ্য যাহা তদ্‌ভিন্ন আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে, অথবা তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণে আমি অক্ষম।

আমি, গুরু কি-তাহা তোমাদিগকে ধ্রুবই বুঝাইয়া দিব ; কিন্তু বাবা, গুরু-ভক্তি কি তাহা বুঝাইতে পারিব না, বরং তাহা তোমাদের

নিকট শিক্ষার জন্যই এত উপাসনা করিতেছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, বিশুর কাছে আমি যাহা চাই তাহা পাইব। গত কল্যের চিঠিতে লিখা সংসারী ছেলেপিলেদের হইতে তোমরা ভাল আছ; তাহাতে বুঝা যায় সংসারের অপর জিনিস হইতে তুমি গুরুকে ভালবাস; আমি ত সংসারের ছেলেমেয়েদের চেয়ে গুরুকে ভালবাসিতে শিখি নাই, তাহাতেই অনেকটা আশা পাইলাম। কেবল একটা প্রমাণ বাকী রহিল।

যদি মা থাকিত তবে মাকে অতিক্রম করিয়া এই কথাটা বলিলে আর কোন সন্দেহই থাকিত না। কিন্তু বিশু, মা ও বাবা সম্পূর্ণরূপে ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে; কারণ, সকলকে অতিক্রম করিয়া যে রাজকুমারী গুরুকে প্রিয় মনে করিয়া গিয়াছে, তার কাছে অনেকটা শিখিয়াছি। কেবল গুরু ছাড়া জ্ঞানে দৃশ্যমান জগতের কিছুই অধিকার করে না—এই শিক্ষা বাকী আছে। আমার প্রাণ কই রাজকুমারীকে অতিক্রম করিয়া গুরু চায়? এখনও মাতৃ ঋণের জন্য প্রাণ পাগল। এজন্য তাহার স্তনে পালিত ব্যক্তির উপরই আমার দাবী দাওয়া বেশী।

ভুল যা তা ভুলই; কোন সময়ে ঠিক হইবে না ও হইবার না। তাহা নিয়া বুদ্ধিমান্ ছেলেদের ব্যস্ত ও অস্থির হওয়া ভুল। নগেন্, বড় কষ্টে তোমার বঙ্গ দাদা তোমাদের পড়াশুনার ব্যয় চালায়। যদি তোমাদের ফল দেখিয়া চক্ষের জল আসে, সে জলে বজ্র হইয়া বজ্রের মত জ্বালা দিবে। শেষ রাত্রে কাহাকে যেন মনে হইয়া প্রাণ ধড়ফড় করে, আমার এ অস্থিরতার কারণ কি?

[(১০২)—ন, স্থ]

মানুষ অপরের নিকট উপদেশ শুনিতে ভালবাসে, কিন্তু মন যে মনকে রাতদিন উপদেশ দিতেছে তাহা শোনে কই? জীব সর্ব্বদা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ইতঃস্তত ধাবিত হইতেছে; কত কি ভাবিতেছে, কত কি করিতেছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সুখ-দুঃখ অনুভব করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই বাসনার অভাব না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। যত প্রকার বিষয় সহ সংযোগ হইতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিষয় বাসনার ক্ষয় হইতেছে না, মৃত্যুকালেও সেই বিষয়-বাসনা নিয়াই যাইতেছে। অথচ মন মনকে সর্ব্বদাই বলিতেছে, এই বিষয় সম্ভোগ দ্বারা বিন্দুমাত্র তৃপ্তি বোধ হইতেছে না। তথাপি অনুসন্ধান আসে না যে বাসনার বিষয় কি? বাসনার প্রকৃত বিষয়, বিষয় হইলে, ধ্রুবই বাসনার বিরতি হইত, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। অথচ অতৃপ্ত বাসনা পুনঃ পুনঃ বিষয় নিয়া থাকিয়াই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। আত্মা অতৃপ্ত বাসনা নিয়া যে পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা ও ভ্রমণ করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? ইহা অপরের উপদেশকে অপেক্ষা করে না, মনই মনকে রাতদিন উপদেশ করিতেছে।

যে বিষয়ে বা যাঁহার বাসনায় বাসনার অভাব হয়, তাহা অনুভব করিয়াও জীবের আবার বিষয়-বাসনা আসিতে দেখা যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় বাসনার বিষয় যাহা তদ্বিষয় মনের ধারণা করিবার শক্তির অভাব। অভাবেই বাসনার উৎপত্তি; আমার বিষয় জ্ঞানের পূর্ব্বেই আমাতে অভাব অর্থাৎ

হ্রাস বৃদ্ধি ক্ষয় ইত্যাদি দেখা যায়। ইহা দ্বারা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, "বিষয়" আমার বাসনার বিষয় নয়, কারণ বিষয়-জ্ঞানের পূর্ব্বেই আমাতে অভাব বর্ত্তমান। সুতরাং বিষয়াতীত একটা বস্তুর অভাবই আমাতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। এমত স্থলে বিষয়ই আমার অভাবের বিষয়, এই ধারণাই ভুল। সুতরাং বিষয়াতীত পদার্থের আকাঙ্ক্ষা ও তালাস না আসা পর্য্যন্ত আমার বাসনা নিবৃত্ত হইবে না এবং তৃপ্তিও বোধ করিবে না।

মনে ইহা পরিষ্কার বুঝিয়া ঐ বিষয় অভাব-বস্তুর জ্ঞান, অথবা তদ্‌বস্তুর অস্তিত্বের সত্যতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস না আসা পর্য্যন্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ অসম্ভব। এ অবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষকে দৃঢ় বিশ্বাস না করিলে তদনুসন্ধান অসম্ভব অর্থাৎ বাসনার বিষয় তালাস অসম্ভব। আবার যে ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিয়া বিষয়াতীত পদার্থের তালাসের দ্বারা বিষয়াতীত পদার্থ লাভ করিয়া তৃপ্তি বোধ করিব, সেই ব্যক্তি বিষয়াতীত পদার্থ লাভ দ্বারা তৃপ্তি বোধ করিয়া বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা জীবের পক্ষে শক্ত। সুতরাং গুরু নিতে হইলে, জীবের অবিষয়ী গুরু ভিন্ন বিষয়াসক্ত গুরু দ্বারা বিষয় পরিত্যাগেচ্ছা জন্মান অসম্ভব। কারণ, মন বিষয়ে শান্তি-সুখ নাই সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছে, তথাপি বিষয়াতীত বস্তু (ব্রহ্ম) অনুসন্ধানে সম্মত নয়! কেননা, তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞানাভাব। তজ্জন্য তদ্দ্বারা বাসনার তৃপ্তি সম্ভব এ ধারণাও অসম্ভব।

অতএব এমন গুরুর দরকার যার কোনও বিষয় বাসনা নাই, বিষয়কে বিষ মনে করে, বিষয়াতীত পদার্থেই তৃপ্তি বোধ করে। তাহার সাক্ষ্য দ্বারা তদনুসন্ধান সম্ভব হইলেও হইতে পারে। তদ্‌ভিন্ন বিষয়াসক্ত ব্যক্তি, বিষয়ের দ্বারা মনের তৃপ্তি বোধ হয় না, মনের তৃপ্তির জিনিস অপর কিছু একথা বলিলেও শিক্ষিত সম্প্রদায় এটা গ্রহণ করিবে না।

বিষয় পরিত্যাগীর হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, শোকমোহ ইত্যাদি কিছুই নাই। বাবা, একটা মায়া-মোহের পুতুলকে গুরু ভ্রমে বিষম বিপত্তি ভোগ করিতেছ! এক পদার্থে অন্য পদার্থ বলিয়া ভ্রান্তি হইলে, সেই ভ্রমে সর্ব্বদাই বিষময় ফল উৎপন্ন করে। তোমরা ভ্রমে পতিত হইয়া ফল ভোগ করিতেছ, করিবে, অপরকে ভ্রান্ত করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। রাত দিনই মনে হইতেছে এবং সত্য-সাক্ষী দিলে পরিষ্কারই বলিতে হয়, আমি দুইটি প্রতিমূর্ত্তির জন্য অর্থাৎ যে অবয়ব ক্ষণবিধ্বংসী তার জন্য উন্মত্ত, সর্ব্বদা ব্যস্ত। মনে হয় কোথায় গাড়ীর তলে পড়িল, কোথায় কি করিল; কখনও কখনও ভয় হয় কোন্ মায়াবিনী পিশাচী আমার হৃদয়ের ধন কাড়িয়া নিয়া আমাকে দীন হীন কাঙ্গাল করে—আমার গুরু চিন্তার সময় কই? সে গুরুর ঘাটে অবস্থান করিলে এ অবয়ব কোথা হইতে দৃষ্টিগোচর হয়? বাবা আমি আর পারি না। মৃত্যু সময় নিকট। ক্রমে যেন স্পর্শ-শক্তির অভাব হইয়া যাইতেছে, এখন আর বাসনার কোন জিনিসেই স্বাদ বোধ হয় না; কোন জিনিসে হাত বা শরীরের ত্বক দ্বারা স্পর্শ হইলে অমনই মনে আসে পূর্ব্বে যেন এরূপ স্পর্শ ছিল না। আর হাহা

করিয়া অনল জ্বলিয়া উঠে। যে অতৃপ্ত বাসনায় আমাকে ইতস্ততঃ এত ছুটাছুটি করাইতেছে, সে অতৃপ্ত বাসনা নিয়া গেলে ছুটাছুটি ও ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের বিরাম হইবে না। আবার কোথায় আসিব, কত স্থান বা কি ভাবে ভ্রমণ করিব? বাবা, হয় আমার বন্ধন মোচন করিয়া দেও, নয় বন্ধনের কারণ অভাব কর। আমার প্রাণ হু হু করিয়া অনেক সময় কাঁদিয়া উঠে, আবার মনে হয় তোমরা, এম্, এ পাশ করিলে, ইতস্ততঃ সঙ্গে করিয়া বেড়াইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণের নিবৃত্তি করিব। ইতি

[(১০৩)—ন, স্থু]

প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, স্ত্রী পুরুষ হইতে এ জগতের উৎপত্তি এবং এই দুইটাতেই আবার শেষ লয় বা পরিণাম; সুতরাং মাঝের অবস্থাগুলি এই দুইয়েরই সংযোগ বিয়োগের ফল। প্রকৃতির শক্তিতে জগতে সব সম্ভবপর; বিশেষ বৃদ্ধাবস্থায় সমস্ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়ের ক্রিয়াগুলি দুর্ব্বল হয়; দুর্ব্বলাবস্থায় মানুষে সব সম্ভবে। সংসারের যত ইতি অনর্থ শুধু স্ত্রীরূপা শক্তির মূলে; জীব শক্তির মূলেই বদ্ধ; ব্রহ্ম জ্ঞান পরিশূন্য।

যে যতই করুক না কেন, নিজ দেহাভিমান পরিশূন্য না হইলে গুরু জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় লাভ হওয়া অসম্ভব। তবে গুরুর দেহে প্রাণ বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইলে প্রত্যাশা করা যায়। মরীচিকায় জল ভ্রম হইলে বস্তু শক্তিতে যে উত্তাপ দেওয়ার বাধা করিবে ইহা ভ্রম। প্রিয় মনে করিয়া পঙ্গপাল অগ্নিতে পতিত হইলে দগ্ধ হওয়ার বাধা হয় না। বস্তু

শক্তি বুদ্ধি শক্তিকে অপেক্ষা করে না, এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, কিন্তু যদি তাহাতে বিপরীত বস্তুর সংযোগ না থাকে।

[(১০৪)—ন, স্নু]

বাবা, কোন রকমেই ত আমি আমার আমিত্ব হারাইয়া না গেলে আর উপায় নাই। আমি আমার সুখ-দুঃখ, বদ্ধ ভাব ও যাতনার কারণ। আমি আমিটা আমি অনুরূপ বস্তু হইতেই উদ্ভূত। আমি অনুরূপ ব্যবহারে আমি অনুরূপ কার্য্যে আমার আমি সমস্ত আমিত্বতে পরিপূর্ণ। আবার তুমি না বুঝিলেও 'আমি' কিছুতেই ঘুচিবে না। আমি অনুরূপ ক্রিয়া খর্ব্ব না হইলেও হইবে না। আবার আমার মত 'আমি' না বুঝিয়া তোমার মত 'আমি' কিছুতেই বুঝিতে পারি না। আমার মত 'আমি' না থাকিয়াও তোমার মত 'আমি' হইতে ইচ্ছা করি না। এ ভীষণ সমস্যা নিয়াই আমিও ব্যাকুল।

আমির কার্য্যানুরূপ কার্য্যে যোগ দিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া তিনি যদি কৌশলে আমাকে তাঁহার মত করেন, তাহা হইলে তাঁহার মত হইতে পারি ; নচেৎ অন্য উপায় নাই। এজন্য তিনি আমার কার্য্যে আমার অভিনিবেশ জন্মাইয়া প্রথমতঃ এক তত্ত্ব অভ্যাস করান। সেই এক তত্ত্ব অভ্যাসের দ্বারা আমার অপরাপর জ্ঞান রহিত করিতে না পারিলে, তিনি তাঁর মত আমাকে কিছুতেই করিতে পারেন না, অথবা তাঁহার আকর্ষণে টানিয়া নিয়া তাঁহার মত করা ভিন্ন অন্য উপায়ই কিছু নাই। সে অবস্থায়ও যদি আমার প্রকৃতি অনুরূপ বিভিন্ন পদার্থে আমার লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তদাকর্ষণও কোন কার্য্য করে না ;

যেহেতু অন্য বস্তুতে আকৃষ্ট থাকায় তদাকর্ষণ আত্মায় অনুভবই হয় না। এজন্য মাঝে মাঝে হতাশা আসিয়া আমাকে অস্থির করে।

ইচ্ছা হয়, 'বিশু নগেন' জপ ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসি। আবার পরক্ষণেই মনে আসে ছাড়িয়া দিলেই বিষয়ের প্রবল গতিতে প্রবল বেগে এত দূরে নিয়া ফেলিবে যে আর খুঁজিয়াও পাওয়া যাইবে না। আবার 'বিশু নগেন' 'বিশু নগেন' জপ আরম্ভ হয়। তথাপিও বিশু ও নগেনের বিশ্বাস নাই যে পার পাইবে। আমি এতটা টানাটানি অনুভব করিলে, বগল বাজাইয়া নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে জগতের কোন ব্যাপারই আমাকে বাধা দিতে পারিবে না, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম "আমি পার পাব।" হায়, জীব অবস্থাবিশেষে গুরুর দয়াকেও নির্দ্দয়তা বলিয়া অনুভব করে। এমন পাপিষ্ঠের নাম কে নেয়, যার নাম নিলে বিষয়-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়? বঞ্চিত না হইলেও প্রকৃতি অনুরূপ সুখ হয় না. ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আজ আবার প্রাণে প্রশ্নের উদয় হইল—কি করিলে তোমরা প্রকৃত শান্তি পাও, তাই করিয়া এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি করি। তোমরা বলিবা আমাদের আমিত্ব জোর করিয়া কাড়িয়া নেও। জীবের মনঃ পীড়া দেওয়া আমার ধর্ম্ম নয়, জোর করিয়া কাড়িয়া নিতে গেলে কলিজা চিড়িয়া যাইবে এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ হইবে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলিতেছি, বার্দ্ধক্য বা রোগবশতঃ যদি কোন যন্ত্রের ক্রিয়ার অভাব হয় ও জীব বাসনানুসারে সেই কর্ম্মেন্দ্রিয়কে কর্ম্মে নিয়োগ করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই অভাব সহস্র বৃশ্চিক দংশনের মত দংশন করে; এমত স্থলে সংস্কার থাকিতে

কাড়িয়া নিলেই জ্বালা হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে বলিবা সংস্কারও কাড়িয়া নেও। সংস্কার জোর করিয়া কাড়িয়া নিতে হইলে বিশ্ব সংসারের সংস্কার রহিত করিয়া নিতে হয়। বিশ্ব সংসার পরস্পর পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট। নিজে সংস্কার ভুল করিলে দোষ ঘটে না, কারণ বিশ্ব সংসার আমার জ্ঞানে আমার ধরা আছে; আমি নিজে বিশ্ব সংসারের জ্ঞান ছাড়িয়া দিলে বিশ্ব সংসারের টান পড়ে না; কিন্তু কেহ জোর করিয়া আমাকে বিশ্ব সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে সমস্ত বিশ্ব সংসারে টান পড়ে। অনেক সময়ে তোমাদিগকে টান দিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে হয়, বিশ্ব সংসার শুদ্ধ টান পড়ে; না হয় তোমরা এ বিশ্বকে কোন কোন অংশে এরূপ ভাবে ধরিয়া আছ যে, বেশী টান দিলে তোমাদের কতকাংশ ছিঁড়িয়া থাকিয়া বাকী অংশ আমার কাছে আসে। আমিত্বের পূর্ণ অংশ আমি কোন সময়ে টান দিয়া আনিতে পারি না।

তাই, আর উপায় না দেখিয়া তোমাদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের আমিত্বের বিশ্বব্যাপ্ত শিকড় সকল ছিঁড়িতে চেষ্টা করিতেছি। ক্রমে আস্তে আস্তে কৌশলে সবগুলি গুটাইয়া নিয়া টান দিব। তা-ও দেখি অনেক সময়ে তোমরা আমাকে ভিতর হইতে উপ্‌ড়াইয়া (উৎপাটন করিয়া) ফেলিয়া দেও। তবে উপায় করি কি? আমিত্ব জাগিয়া উঠিলেই আমাকে বাহির করিয়া ফেলিয়া দেও। তখন ভিতরে স্থান না পাইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরি ও অবকাশ খুঁজি যে, আমিত্বের মৃদু অবস্থা কোন্ সময়ে আসিবে। তখনই আবার ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করি। মোটের উপর, হয় আমাকে ভিতরে জায়গা দেও, না হয়, আমিত্বের পশার আস্তে আস্তে নিজেই

গুটাইয়া লও। নচেৎ 'উদ্ধার কর,' 'উদ্ধার কর' অথবা 'আমাকে তোমার কর' এই প্রতারণা বাক্য আর না বলিয়া যার যার পথ সে সে দেখ, ইহাই আমি উচিত মনে করি।

[(১০৫)—স্থ]

তোমার চিঠি পাইলাম। এখন সতত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন করাই তোমাদের গুরুর প্রীতিকর কার্য্য করা হইবে; তজ্জন্য অনুতপ্ত হওয়া ভ্রান্তি। আমি ছেলেদিগকে চুরি ও বদমায়েসী ভিন্ন কিছুতে পরিত্যাগ করি না; অন্য সব অবস্থা মার্জ্জনীয়; সুতরাং তোমাদের চিন্তার বিষয় দেখি না। তবে কথাবার্ত্তা জগদতীত চলিবে, কার্য্য বিষয়ীর মত করিবে, সেই ভণ্ডামীতে রাজী না। বিষয় বাসনা আসে, ন্যায়ানুগত বিষয় করিবে, আপত্তি কি? ব্যস্ত অস্থিরতার কারণ ত কিছু দেখি না। তিন কথা যাহা সংসারও ঘৃণা করে, সেই তিন কথা বাদে আর সকল বিষয়ে আমি রাজী। তবু চিন্তার বিষয় থাকিলে কি করিব? এখন অধ্যয়নই গুরুর প্রীতিকর কার্য্য, তাহা না করিলে গুরুর অপ্রিয় হইতে হইবে; ইহা মনে রাখা উচিত। ধর্ম্মোপদেশ পরীক্ষা পর্য্যন্ত ক্ষান্ত থাকাই উচিৎ মনে করি। পড়াই ধর্ম্মোপদেশ, কারণ "মোক্ষমূলং গুরু কৃপা", তৎ প্রীতিকর কার্য্য ভিন্ন কৃপাও অসম্ভব।

[(১০৬)—স্থ]

আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমার গুরুই একমাত্র সম্বল এবং গুরুই আমার গুরুতর চিন্তার জিনিস ও গুরুভাবে ভাবনার পদার্থ;

গুরুর উদ্দেশ্যেই সকল। এখন দেখি গুরুর উদ্দেশ্যে গুরু ভিন্ন আর অন্য যা কিছু চিন্তা করি, সেই পদার্থ গুরু না হইলে আর গুরুতে থাকা যায় না, অর্থাৎ গুরুর উদ্দেশ্যে 'বিশা', এস্থলে 'বিশা' গুরুর আর একটা রূপ বা গুরুর রূপেই 'বিশা' ইহা না ভাবিলে, 'বিশা' বুঝিলেই দিশাহারা হই। মানে, 'বিশা' এই শব্দটা ত গুরু নয়; যেই শব্দান্তর হইল, তাই ক্রিয়ান্তরও হইল—যেই ভিন্ন রূপ বুঝিলাম, তাই ভিন্ন জ্ঞান আসিল—যেই তাহাতে ভিন্ন জ্ঞান আসিল, তাই তাহার ভিন্ন ভাবেরও বিকাশ পাইতে লাগিল, অমনি তাহার সঙ্গে ভিন্ন ব্যবহারও আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখি গুরু হইতে সকলই ভিন্ন। অমনি সেই ভিন্নানুরূপ সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, সমস্ত আসিয়া আমি যাহা ছিলাম তাহাই হইলাম এবং আমার জ্ঞানানুরূপ আমাতে সমস্ত,—পেটের অসুখ, ফোড়া, পাঁচড়া, হাসা, কাঁদা, নাচা, গাওয়া—সকলই বর্ত্তমান। অথচ এক অভাবনীয় মোহ অন্তরালে থাকিয়া আমাকে বুঝাইতে লাগিল গুরুর জন্য করি, গুরুর জন্য মরি, গুরুর জন্য সকল। আমি যে অন্য ভাবে বিকল তাহা বুঝিবারও এক গুরুতর অন্তরায়।

বাপ্‌রে বাপ্, একি বিপত্তি! ভুলকেও ভুল না বুঝাইয়া ঠিক বুঝাইতেছে। জানি, গুরুর জন্য সকল হইলে আমার ভাল-মন্দ কেন আসে, আমার সুখ-দুঃখ কেন হয়? তথাপি নিশ্চয় বুঝি যে, গুরুর জন্য সব করি। এ ফাঁকটি ভীষণ। ইহার হাত এড়ান শক্ত; ত্যাগ করিতে গেলে আশঙ্কা রূপে আসিয়া মোহ উপস্থিত হয় যে, গুরুর কার্য্য ত্যাগ করা হইল। কি করি, এ ফাঁকটি কিসে কাটি? একবার মনে করি এবার ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া তুমি যাহা

বুঝাও, যাহা করাও, তাহাই করি; আবার দেখি 'আমি' করি, 'তুমি' আমার বাড়ীর ধারেও নাই। কথায় বলি 'তুমি করাও, 'তুমি' বুঝাও, কাজে 'আমি' করি, 'আমি'-বুঝি, না হইলে আমার সুখ-দুঃখ কেন? কোন রকমেই যেন কোথায় ভুল তাহা ঠিক ধরিতে পারি না।

একবার মনে করি গুরু চিন্তায় দেহ-বোধ রহিত না হইলে গুরু করান, গুরুর জন্য করি, এ চিন্তা সম্ভবপর নহে। আবার ভাবি দেহ-বোধ-রহিত হইয়া গুরুর জন্য করায় আর করি থাকে কোথায়? আবার ভাবি যাহা কিছু জগতের কার্য্য-কারণ তাহার মূলে গুরু, সুতরাং গুরু-ভিন্ন আমি করি ইত্যাকার অভিমান ভুল, তা'তেই বা আমার সুখ-দুঃখ সম্ভব কিসে? তবে কিসে যে গুরুর জন্য সব করি, অথচ আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান আসে না সেই বোধ হয়? প্রতি সেকেণ্ডে প্রতিনিয়ত প্রত্যেক ব্যাপারে, প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ রাখিয়া করিলে, আর কোন প্রকার অভিমান বা সুখ-দুঃখ সম্ভব না, অর্থাৎ যে অবস্থায় প্রতিনিয়তই reactionএ স্বতঃই গুরুর স্মৃতি জাগে, সেই অবস্থার লোকের জন্য একথা সম্ভবপর। যেমন পার্থিব সুখ বা যশ প্রত্যাশায় আমরা যে কোন কার্য্য করিয়া থাকি, সেই কার্য্যের প্রত্যেক অবস্থায় ঐ সুখ বা যশ আমাদের অন্তরে লুক্কায়িত ভাবে লুকাইয়া থাকে, সেই সুখ বা যশ-মন্ত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের প্রাণ হইতে অন্তর্হিত হয় না; সেইরূপ গুরু যদি আমাদের অভীষ্ট দেবতা হয় তবে আর বিপত্তির আশঙ্কা থাকে না। যে পর্য্যন্ত গুরু হৃদয়ের মূল-মন্ত্র না হয়, সেই পর্য্যন্ত

গুরুর জন্য করি, ইহা একটা কথার কথা এবং প্রতি পদে তাহাতে বিপদ।

মোট কথা কপটতাই জগতের যত দুঃখের কারণ। কোন সময়েই স্বরূপ অবস্থায় বিরূপ থাকে না। আমাদের নিজের একটা জ্ঞানানুরূপ স্বরূপ-অবস্থা আছে; সেই অবস্থা অনুরূপই গুরু বুঝি। আবার গুরু বুঝেরও একটা স্বরূপ আছে; সেই গুরু বুঝানুরূপ বুঝ্ না আসা পর্য্যন্ত নিজের স্বরূপ অবস্থানুরূপ গুরুর অবস্থা বুঝিয়া সব গুরু করান বলিতে গেলেই বিরূপ হইবে এবং প্রতি পদে লাঞ্ছনা। এতদিনে বুঝিলাম আজও গুরু বুঝি নাই; বুঝিব যে, তাহাও যেন আর প্রাণে আশা আসে না। কারণ, নিজের বিরূপ অবস্থা দ্বারাই যখন গুরুর স্বরূপ বুঝিয়া, সেই স্বরূপই প্রকৃত বুঝিয়াছি বলিয়া মনে করি তখন আর স্বরূপ বুঝিবার প্রত্যাশা কই? যতদূর বুঝিলে নিজের বুঝ্ একেবারে থাকে না, গুরু ততদূর না বুঝা পর্য্যন্ত গুরু বুঝা যায় না। সুতরাং নিজের বুঝ্ বর্ত্তমানে গুরু বুঝিয়াছি, এ কথা কেহ যেন ভ্রমেও মনে না করে।

[(১০৭)—ন, সু]

এই সৃষ্টি বা সৃষ্টি জ্ঞান আমার বা ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা নয়; স্বরূপাবস্থা উৎপত্তি-বিলয় রহিত। যেখানে উৎপত্তি-বিলয় সেখানেই স্বরূপাবস্থার অভাব। যে অবস্থা যখন প্রকাশ, তদবস্থানুরূপই জ্ঞান ও সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি। যদবস্থার অভাব,

তদ্‌বস্থানুরূপ জ্ঞান ও অনুভূতির অভাব। সুতরাং ব্রহ্ম বা গুরু অবস্থা আমাদের জ্ঞান ও অনুভবের বিষয় নয়, এবং তদবস্থার জন্য আমার আসক্তি ও তদবস্থা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে, ইহাও দেখা যায় যে, যে বস্তু বা যে প্রাণী যদ্‌ভাবে প্রকাশমান বা উৎপন্ন হইতেছে, তদবস্থাই তাহার নিকট স্বরূপাবস্থা এবং তদবস্থাই সে ঠিক বলিয়া বুঝিয়া, সেই অবস্থায়ই থাকিতে ইচ্ছা করে; কারণ কোন প্রাণীই মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করে না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যে প্রাণী যদবস্থায় উৎপন্ন হইতেছে তত্তৎ অবস্থানুরূপ তাহার সকল অর্থাৎ তত্তৎ অবস্থানুরূপই শব্দ-স্পর্শ-রূপ–রস-গন্ধাদির জ্ঞান ও আহার-ব্যবহারের পার্থক্য, কিন্তু তুইটা কার্য্য বা ক্রিয়া সর্ব্ব প্রাণীতেই বর্ত্তমান—উদর ও উপস্থের কার্য্য সর্ব্ব প্রাণীতেই দেখা যায়।

ইহা দ্বারা মোটের উপর এই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থার বিয়োগ বা অভাব হইলে প্রাণীবর্গ সংযোগ ইচ্ছা করে ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে যে ক্ষয় বৃদ্ধি হয়, তাহার পূরণ ইচ্ছাও করে। সুতরাং যত কাল পর্য্যন্ত জীব বা সৃষ্ট পদার্থ ব্রহ্ম-অবস্থায় উপনীত না হইবে, ততকালই জীবের সংযোগ-স্পৃহা ও ক্ষয় পূরণেচ্ছা থাকিবে। এই হেতুতেই জীব সতত সংযোগ ও ক্ষয় পূরণের জন্য চেষ্টা তৎপর। সংযোগ ইচ্ছারই বিশেষ বিশেষ প্রকার ভেদ দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ ইত্যাদি; স্পর্শের প্রকার ভেদেই স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ। এজন্য জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব গুরুতে সংযুক্ত হইলে, অপর সংযোগ আকাঙ্ক্ষা

করে না। তাহার কারণ এই—সংযোগ ইচ্ছা ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থার অভাবেই জন্মে। কাহার সহিত সংযোগ, তদ্‌জ্ঞান অভাবে বাহ্য বস্তুতে সংযোগ ইচ্ছা প্রবল হয় এবং অহংএর শেষ প্রান্তের যে স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ, তজ্জন্যই প্রবল ইচ্ছা হয়; এবং তাহার পরই বিরতি আসে।

বাস্তবিক পক্ষে উহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান একেবারে অভাব হয়; যেহেতু আমার গতির শেষ প্রান্তে ঐ ক্রিয়া আমাকে বিক্ষিপ্ত করে; এবং গতির শেষ প্রান্তে ব্রহ্ম-জ্ঞানের একেবারে অসম্ভাব, যেহেতু গতিই ব্রহ্ম হইতে বিযুক্ত করে। গতির অতি প্রবলতম অবস্থায় ব্রহ্ম জ্ঞানের একান্ত অসম্ভাব হয়; স্নুতরাং জাগতিক জ্ঞান প্রবল হইয়া জাগতিক জ্ঞানেই জীব লিপ্ত থাকে এবং স্বকীয় জ্ঞানের অতীত অবস্থার চিন্তা আর একেবারেই জাগে না। জীব তখনই মোহকূপে ডুবিয়া অনন্ত কাল, অনন্ত অবস্থায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে। আবার গুরু-জ্ঞান প্রবল হইলে ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হয়, ক্রমে অভাবেরও খর্ব্বাবস্থা আসে এবং অপর সংযোগ জ্ঞান অভাব হইয়া অভাব বোধের অভাব হইতে থাকে। অন্য অভাব ক্রমশঃ ভুল বলিয়া ধারণা জন্মিয়া ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হয়।

গত্যাত্মক অবস্থায় গেলেই ভ্রান্তিতে পড়িতে হইবে। গতিই ভ্রান্তির কারণ, তদ্ধেতু গতির প্রবল অবস্থায় ভ্রান্তিরও প্রবলতা। এজন্যই দৃশ্যমান জগতে ঋষি যুগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যা'র যত গুরু-জ্ঞান তা'র তত জাগতিক পদার্থের অভাব-

জ্ঞানাভাব ; মোটের উপর যে অবস্থায়ই জীবের গতির খর্ব্বাবস্থা জন্মায়, সেই অবস্থাই নিজের স্বরূপ-জ্ঞান বিকাশের কারণ। আর যে অবস্থায় গতির প্রবল অবস্থা জন্মায়, সেই অবস্থাই স্বরূপ-জ্ঞান অভাবের হেতু।

সৌর জগৎ সমস্ত গত্যাত্মক অবস্থায় জন্মে এবং গত্যাত্মক বুদ্ধিতেই সৌর জগতের জ্ঞান। গতির অভাবে সৌর জগতের জ্ঞানাভাব ও সৌর জগদনুরূপ ক্রিয়ারও অভাব। বুঝাবুঝি সমস্তই ক্রিয়ার ফল ; সুতরাং ক্রিয়ার তারতম্যে বুঝাবুঝিরও প্রকার ভেদ হয়। সুতরাং যত না বুঝা যায় ততই ভাল। যে বস্তু যৎ ক্রিয়া-বিশিষ্ট বা যে ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন তৎ ক্রিয়াই আমাদের জ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ তদ্‌বস্তু দ্বারা তদ্‌বস্তু অনুরূপ ক্রিয়া জন্মাইয়াই আমাদের তদনুরূপ বোধ জন্মায়। এই হেতুই ইংরাজী দর্শনানুসারে "স্পন্দনের (Vibration) প্রকার ভেদে জ্ঞানের প্রকার ভেদ ; কেবল জ্ঞানের প্রকার ভেদ নয়, আসক্তি অনাসক্তি, ভাল-মন্দ প্রভৃতি সকল প্রকার ভাবের প্রকার ভেদ। প্রকার ভেদ ভিন্ন প্রকার-ভেদের জ্ঞান কোথায় ?

ভিন্ন জ্ঞানই বিভিন্ন প্রকার ভাবের ও জ্ঞানের কারণ এবং তন্মূলেই দ্বন্দ্ব-ভাব ও সুখ-দুঃখের প্রকার-ভেদ। যে জ্ঞানে প্রকার ভেদ রহিত হয়, তাহাই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থার কারণ ও প্রকার-ভেদ রহিত হইয়া এক জ্ঞানের হেতু। এই জন্যই বলি বাবা, এক গুরু বুঝ ; গুরু বুঝিলেই আপনাকে লঘু বুঝিবে ও আপনার ভিতরের স্বরূপাবস্থা অনুভব হইবে।

ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার অভাব না করিলে, ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়া বৃদ্ধিই পাইবে; তাহার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত, ভোগের দ্বারা ভোগের স্পৃহা বৃদ্ধিই পায়। কোন সময়েই যে বস্তু যে ক্রিয়া-বিশিষ্ট, তদ্‌বস্তুর জ্ঞান অভাব না হইলে, তৎ ক্রিয়ার অভাব হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী গুরুর অনুরূপ ক্রিয়া দেহে না জন্মান পর্য্যন্ত ব্রহ্মের দূরবর্ত্তী ক্রিয়া-বিশিষ্ট জিনিসে সংযোগ থাকিলে, ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকিতেই হইবে।

যাহা বলিবার আছে এম্-এ উপাধি পাইলে, প্রাণ খুলিয়া বলিব। সেই বলাবলির সময়ে অপর ক্রিয়া-বিশিষ্ট জিনিসের অভাব করিয়া কেবল যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে আমাদের ভিতরে অপর ক্রিয়ার সঞ্চার হইতেছে, সেই ইন্দ্রিয়ের অপর কোন বিষয় না রাখিয়া, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ই গুরু এরূপ অবস্থায়ই বলিব—তাহা ভিন্ন হইবে না। দেহের ক্রিয়ানুরূপ বস্তু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকটে রাখিয়া গুরু জ্ঞান অসম্ভব। কারণ কোন অবস্থায়ই কোন বস্তু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈধর্ম্ম্য অবলম্বন করিতে চায় না। বলাবলিতেও ক্রিয়া বর্ত্তমান; বলাবলি রহিত হইয়া গুরু কেমন করিয়া জীব বুঝে, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব, ইহাই আমার শেষ কথা।

[(১০৮)—ন, সু]

উপদেশ দিয়া ফল কি? প্রথমতঃ ক্রিয়ানুরূপ জ্ঞান, এই হেতু ক্রিয়ার বিপরীত ধারণা হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদিও সাময়িক ক্রিয়ায়

বিপরীত পদার্থের সম্মিলনে তৎকালীন সাময়িক স্বকীয় ক্রিয়ার অভাব থাকায়, ক্রিয়ার বিপরীত জ্ঞান উপদেশাদি দ্বারা অনুভব হয়, তথাপি আবার যখনই ক্রিয়ার অনুরূপ পদার্থের সহিত সংযোগ হয়, তখনই সংস্কারানুরূপ পদাথের জ্ঞান প্রবল হইয়া গুরূপদেশ ভুল হইয়া যায়। হয়, সংস্কারানুরূপ পদার্থের সঙ্গে সর্ব্বদা বিয়োগ থাকিয়া গুরুর সঙ্গে সংযোগ অবস্থায় যে উপদেশ পাওয়া যায় তাহার অনুধ্যান সর্ব্বদা করা, না হয়, গুরুর সঙ্গে সর্ব্বদা সংযোগ থাকিয়া গুরুর উপদেশ অনুধ্যান করা—ইহা ভিন্ন সদুপদেশ কোন কার্য্যকরী হয় না।

আমাদের বহু জন্মার্জ্জিত বা বহু কালের অর্জ্জিত সংস্কার ভুল হইলেও ঠিক বলিয়া দৃঢ় ধারণা হইয়াছে এবং সেই ঠিক ধারণারই (প্রকৃত) ঠিকটা এরূপ দৃঢ় ভাবে বেঠিক বলিয়া ধারণা হইয়াছে যে, ভ্রমেও ঠিককে ঠিক বলিয়া বুঝি না। যেমন, দেহ নশ্বর পদার্থ, প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তথাপি নশ্বর বলিয়া মুহূর্ত্ত কালের জন্যও চিন্তা আসে না; সততই নিত্য পদার্থের ন্যায় জ্ঞান করিয়া কত কি করিব, কত কাল যে এ সংসারে থাকিয়া কত কার্য্য করিব তাহার ইয়ত্তা বা শেষ নাই। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, ইহার মূলে সর্ব্বদাই আমাদের বর্ত্তমান নিয়া জ্ঞান, কোন ব্যাপারেই আমরা অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিনটা নিয়া চিন্তা করি না। প্রতিনিয়ত যদি মনে প্রত্যেক ব্যাপারে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নিয়া চিন্তা করিয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে এ সংসারকে ঠিক বিপরীত দেখিব; ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ঘর বাড়ী কোন সময়ে

আমাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহার নির্দ্দিষ্ট কাল নাই—ইহা যদি বুঝি, তাহা হইলে ইহার প্রতি বিন্দুমাত্রও মমতা থাকে না। এই ভ্রম জ্ঞানেই যেসব বস্তুর সঙ্গে ক্ষণকাল সম্বন্ধ, তাহাতে আমার কতটুকু আসক্তি তাহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই বুঝিবে। কোন বাড়ীতে অতিথি রূপে গেলে, সেই বাড়ীর প্রতি আমার সাময়িক সম্বন্ধ থাকে, নিজ বাড়ী অনুরূপ ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার আসিয়া আসক্তির তারতম্য জন্মায় না।

আবার শারীরিক সুখ-দুঃখের জন্ম আসক্তির তারতম্য হয়। শরীরটা নশ্বর পদার্থ, ক্ষণধ্বংসী—একথা বিস্মৃত হইয়া শারীরিক সুখের বিষয়গুলিও নিত্য পদার্থের ন্যায় অনুভব হইতে থাকে। যতই আমি বুঝাইতে চেষ্টা করি না কেন, পূর্ব্বের ভুল সংস্কার সেগুলিকে ভুল বুঝাইয়া দেয় এবং দৈহিক ক্রিয়ার ইতর বিশেষে দেহ-আমি এই জ্ঞান দৃঢ় থাকায়, সর্ব্বদা দেহের ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়ায়ই মন প্রতিনিয়ত ধাবিত হয়। ইহার ঔষধ দুইটি—একটা নিজের দেহ ভুলিয়া গুরুর দেহ অনুধ্যান, অন্যটি দৈহিক ক্রিয়ার খর্ব্বতা। ইহার সহিত দেহের নশ্বরতা প্রতিনিয়ত চিন্তা; দেহের বিচার করিতে গেলেই অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়া দেহের বিচার করিলে সোণায় সোহাগা হয়।

ঋষিদের এই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ না করিয়া উপদেশ শুনিলে উপদেশ নিজ প্রকৃতি অনুসারে নানা অর্থ ও নানা ভাব প্রকাশ করিবে।

শ্রীযুত বাবু তারাকিশোর চৌধুরীর এক চিঠি পাইয়াছি। তিনি আশ্রমে আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ সময়াভাবে ঘটিয়া

উঠিতেছে না। তাঁহার সঙ্গে তোমরা অবশ্যই আর একদিন গিয়া দেখা করিয়া বলিবা, যে কোন বন্ধ উপলক্ষে এখানে আসিলে, আমি অতিশয় তৃপ্তি বোধ করিব এবং তিনিও তাঁহার গুরুর অপরিসীম শক্তির পরিচয় আমার নিকট জানিতে পারিবেন। আমি তাঁহার গুরুকে বিশেষ ভাবে জানি। সংসারে আসক্তি পরিশূন্য না হইলে ঐ সব মহাপুরুষদিগকে কেহ বুঝিতে পারে না।

[(১০৯)—ন, সু]

জগতের যত ইতি কর্ম্ম, দেহ-আমি এই জ্ঞানেই হইতেছে, হইবে। দেহ আমি এই জ্ঞান না থাকিলে আগ্রহাতিশয়ে আমরা টাকাকড়ি ঘর-বাড়ী, জমিদারী, বাগান-বাড়ী ইত্যাদি কোন বস্তুর জন্যই ব্যস্ত হইতাম না আত্মার অনাত্ম পদার্থে কোনই প্রয়োজন নাই। দেহ আমি নয়—মানবের এই জ্ঞান যখন জাগিয়া উঠে, তখন সে আকার বিশিষ্ট কোন বস্তুই প্রয়োজন মনে করে না। সংসারে আমরা যাহা করি, যাহা চাই, সেই সমস্ত বস্তুরই আকার আছে। আকারের দ্বারাই আকারের অনুমান জ্ঞান এবং আকারের জন্যই আকারের বস্তুর প্রয়োজন। সুতরাং আকার রহিত 'আমি'র আকার বিশিষ্ট পদার্থের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

এস্থলে এইজন্যই আকার-বিশিষ্ট গুরুরও আবশ্যক হইয়াছে। সেই আকারে আবার আকৃষ্ট হইবার দুইটা কারণ বর্ত্তমান। একটা, আমার আকারের বা দেহের সুখের জন্য দেহ-বিশিষ্ট গুরুর সঙ্গে সংযোগ হই; অপরটা, আকার জ্ঞান শূন্য হইবার জন্য সেই নিরয়ব

পদার্থের অবয়ব নিয়া চিন্তা করি। সুতরাং সাময়িক কোন আকৃষ্টতার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। তবে যে কোন প্রকারেই অবয়ব জ্ঞান-শূন্য দেহের অনুধ্যান, অন্য অনুধ্যান পরিত্যাগ করিয়া, করা যায় তাহাতেই অবয়ব-জ্ঞান পরিশূন্য জ্ঞান উদ্রেক হইবে। একটু বিশেষ বিবেচনা বা বিচার করিলে দেখা যায়, যখনই আমরা অপর জ্ঞান শূন্য হইয়া এক বস্তুতে তন্ময় হই, তখনই এক জ্ঞান-বিশিষ্ট হই। এক জ্ঞান-বিশিষ্ট হইলে আর ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ থাকে না, আর অবয়বও থাকে না। অন্য অবয়ব বা আমার অবয়ব আছে বলিয়া আপেক্ষিক জ্ঞানে, আমার অবয়বকে অপেক্ষা করিয়া অন্য অবয়ব বলি। যখন আমার অবয়ব বা অন্য অবয়ব অপেক্ষা না করিয়া মাত্র এক অবয়বই বুঝি তখন অবয়ব জ্ঞান হয় না। সেইরূপ অবয়ব জ্ঞান রহিত, অবয়ব দ্বারা হইতে হইলে, নিজের অবয়বের সুখ-দুঃখ বোধ রহিত না হইলে হইবে না। যেহেতু নিজের অবয়বের সুখ-দুঃখ বোধ থাকিলেই নিজের অবয়বের অনুভূতি বা জ্ঞান থাকে, সুতরাং নিজের আকার বা দেহকে অপেক্ষা করিয়া গুরুর দেহ বোধ থাকে, সুতরাং তদবস্থায় নির্দ্দ্বন্দ্ব অবস্থা অসম্ভব।

তবে বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তিকে অপেক্ষা করে না, এজন্য দীর্ঘকালে নিজ অবয়ব জ্ঞানটা বস্তু শক্তিতে ধ্বংস করিয়া দেয়। সেস্থলেও আমার দেহ ও গুরুর দেহ ভিন্ন অন্য দেহের চিন্তা বা অনুধ্যান রহিত হওয়া আবশ্যক। কারণ, অন্য দেহ অনুধ্যান করিলেই সেই দেহানুরূপ ক্রিয়া দেহে জন্মিয়া দ্বন্দ্ব ভাবের আধিক্য করে। যেহেতু অন্য দেহানুরূপ সংস্কার আমার বহুকাল যাবৎ, আমিও অন্য দেহানুরূপ সংস্কার বিশিষ্ট। সেস্থলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেহী বৈধর্ম্ম্য অবলম্বন করিতে

অক্ষম। তবে যদি সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া অন্য দেহ অনুধ্যানের সময় ও সুযোগ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উপরের লিখিত স্থলেও প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। আর যদি অন্য দেহও অনুধ্যান করে এবং সেই দেহীও গুরু অনুধ্যান করে, তবে তদ্দেহী অনুধ্যান দ্বারা তত অপকার ঘটে না। গুরুর প্রিয় বস্তু প্রিয় মনে করিলেও গুরুর স্মৃতি জাগে। গুরু চিন্তায় গুরু হইয়া গেলে, জগৎ-পূজ্য ও জগতের শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ হয়,—ইহাতে সন্দেহ কি ?

[(১১০)—ন, সু]

আহা, কাল কি দুর্নিবার ভীষণ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছে! যত বলি, যত বুঝাই, কিছুতেই প্রাণ বুঝিতে চায় না ; চতুষ্পার্শ্বে কেবল বিষয়ালাপ, বিষয়ের বিপণি, বিষয়ানুরূপ হাব-ভাব বর্ত্তমান। কোন বস্তুতে ও প্রাণীতে লক্ষ্য করিলে, কোথাও গুরু বা ব্রহ্মের চিহ্ন-মাত্র লক্ষিত হয় না। এমন দিনে, এ অবস্থায়, বিষয় ভাব হইতে উদ্ভূত প্রাণীর উপায় কি ? রাতদিনই কেবল এই চিন্তায় দিনাতিবাহিত হইতেছে। সর্ব্বদাই মনে আসে, অর্জ্জুনের ন্যায় সেই লক্ষ্য ভেদের পক্ষীর চক্ষু মাত্র, জগৎ নেত্রে গুরুর চক্ষু-মাত্র দেখিয়া শিষ্যেরা অন্য লক্ষ্য ভুলিয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন দ্বিদল ভেদ হইবার অন্য উপায় নাই। অন্য লক্ষ্যে লক্ষ্য গেলেই ভুলকে ঠিক ধারণা হইবে। 'হংস-শর' মন-ধনুকে সন্ধান করিয়া দ্বিদলে স্থির লক্ষ্য না থাকিলে আর উপায় নাই। দেহের ক্রিয়া খর্ব্ব না হইয়া দেহ জ্ঞান ক্ষীণ হইবে না ; অথবা আত্ম দেহ বিস্মৃত হইয়া গুরুর

দেহ চিন্তা না করিলে, দেহ-জ্ঞান ক্ষীণ হইবে না। দেহ-জ্ঞান ক্ষীণ বা অভাব না হইলে, গুরু 'হৃদয়ে' প্রকাশ হইবেন না। গুরু প্রকাশ না হইলে সংসার ভুল হইবে না, এবং দেহানুরূপ ক্রিয়াও খর্ব্ব হইবে না, সুতরাং দেহজ দস্যু লোভ আর কামের হাতে পরাজয় হইতেই হইবে।

যাহাদের জগদ্‌ভ্রান্তি এই সিদ্ধান্ত হইয়া প্রকৃত বিবেক-বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের ভয়ের বিষয় কিছুই নাই। আর যাহারা রোগ, শোক, দৈন্য দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ক্ষণিক বৈরাগ্যবশে গুরু অন্বেষণ করিয়া গুরুর নিকট যায়, অথবা যাহাদের বিষয়ের সংস্কার ধ্বংস হয় নাই, তাহারা কোন সময়ে বিষয় বাসনায় গুরুকে চাহিলে অমনি গুরুকে বিষয়ী দেখিয়া পুনরায় বিষয় বিষকে অমৃত-ভ্রমে পান করিয়া ঢলিয়া পড়িবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাদের বিষয় বাসনা থাকিতে গুরুর নিকট না থাকিয়া, আকার রহিত গুরু গুরু-ধ্বনি মাত্র অবলম্বন করিয়া, দূরে থাকা কর্ত্তব্য। আর যাহারা গোপালের মত গুরুকে ভাবে তাহাদের গোপালের উপর আকৃষ্টতা বৃদ্ধি করিয়া অন্য পদার্থের প্রতি আকৃষ্টতা হ্রাস করা, এমন কি, গোপাল ভিন্ন অন্য পদার্থের অনুধ্যান চিন্তা একেবারে না করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এস্থলে অধমাধি-কারীদের গুরু না ভাবিয়া গোপাল-ভাব প্রবল করাই উচিত। সেই গোপালেও বিষয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিলে গরল উৎপত্তি হইবে।

এই ত্রিবিধ অধিকারীর জন্য ত্রিবিধ পথ শাস্ত্রে নির্ণয় করা আছে। কিন্তু ক্রিয়ার খর্ব্বতা সাধন করা সর্ব্বপ্রকার অধিকারীরই উচিত। ক্রিয়া খর্ব্ব না হইলে কোন ব্যাপারেই স্থির ভাবে স্থির থাকা সম্ভবপর নয়।

যাহার একবার স্বরূপ জ্ঞান, যে কোন উপায়ে হৃদয়ে উদয় হয় তাহার আর পুনরায় এ ভ্রমে পতনাশঙ্কা কিছুতেই নাই। যে পর্য্যন্ত গুরুর স্বরূপ অনুভব না হইবে সেই পর্য্যন্ত প্রতি পদে পতনাশঙ্কা; সুতরাং যত অন্য বিষয়ালাপ না করা যায় ততই মঙ্গল। মানব বহু কাল যাবৎ অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারি যুগ ব্যাপিয়া উপর্য্যুপরি দেহের সংস্কার নিয়া দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করিতে করিতে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত; সুতরাং দেহ-সংস্কার বিস্মৃত হওয়া মানবের জ্ঞানে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কারণ, দেহাতিরিক্ত একটা পদার্থ ধারণার বিষয় হয় না এবং শব্দটা শোনা মাত্রই এ শব্দটি ভ্রান্তি বলিয়া অনুভব হয়। সংস্কারের বিপরীত জ্ঞানই ভুল জ্ঞান। এই ভুল জ্ঞান দূর হওয়ার এক মহৌষধ অভ্রান্ত পুরুষের সংসর্গ। ভ্রান্ত বস্তুর সংসর্গে ভ্রান্তিই উৎপত্তি করে; এই জন্যই এই দৃশ্যমান জগৎ-জ্ঞান আমাদের ভ্রান্তির কারণ। অতএব দৃশ্যমান জগতের জ্ঞান রহিত হইয়া অভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংসর্গ না করিলে, ভ্রান্তি দূর হওয়ার আশাও নিষ্ফল।

তোমরা যে মনে করিয়াছ, গুরুও চিন্তা করিলাম, অন্য বস্তুও চিন্তা করিলাম—একটুকু চিন্তা করিলেই দেখিবা তাহাতে কিছুতেই বহু

জন্মার্জ্জিত সংস্কার অতিক্রম করিয়া সংস্কার রহিত পদার্থে আকৃষ্ট হওয়া যায় না। এজন্য বারবারই বলিতেছি ও লিখিতেছি, অভ্যাস বলে অন্য লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া, এক গুরুতে লক্ষ্য না থাকিলে কিছু হইবার নয়। তবে অনেক সময়ে অনেকের মনে হয়, বলপূর্ব্বক ক্রিয়ার খর্ব্ব করিলেই ক্রিয়ানুরূপ জ্ঞানে গুরু-জ্ঞান হইবে ; কিন্তু অন্য পদার্থ জ্ঞানে বর্ত্তমান থাকিতে ক্রিয়ারও ক্রিয়ানুরূপ ফল হওয়া অসম্ভব। কারণ, প্রত্যেক পদার্থে পদার্থানুরূপ ক্রিয়া বর্ত্তমান। জ্ঞানে পদার্থ অধিকার করিলেই পদার্থানুরূপ ক্রিয়াও অধিকার করিবে। পূর্ব্ব সংস্কার অভ্যাস বশতঃ যদি পদার্থ হইতে মনের নিবৃত্তি না জন্মায়, তাহা হইলে আর্য্য ঋষিরা কেবল পদার্থানুরূপ পদার্থের বর্ত্তমান জ্ঞান নিয়া চিন্তা না করিয়া প্রত্যেক পদার্থের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়া চিন্তা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে এ জগতের নশ্বরতা স্বতঃই প্রতিপন্ন হইয়া বৈরাগ্যের উদ্রেক করিবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার মতে মুলমন্ত্র, গুরু অনুধ্যান ও পদার্থের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ চিন্তা করা—এই ত্রিবিধ উপায় মানুষের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ; নচেৎ একালে মানুষ কিছুতেই পার হইতে পারে না।

নিজের দেহেরও অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়া চিন্তা না করিলে কিছুতেই ভব কর্ণধার গুরুর তালাস আসিবে না। তোমরা নিজ পড়াশুনার বিষয় ভিন্ন অন্য আলাপ না কর, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা। তবে দেহ রক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক, তাহা

করিয়াই তৃপ্তি বোধ করা উচিত। আমি ভাল আছি, আমার জন্য কোন চিন্তা করিবা না।

[(১১১)—ন, স্থ]

অনেক দিনই মনে করি তোমাদিগকে বুঝাইয়া বুঝাইব ; কিছুতেই এ বাসনার বিরাম নাই। তালাস করিয়া দেখিলে দেখি, আমার বলিতে আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই ভ্রম। কারণ, যে পিতা-মাতার সংযোগে আমার উৎপত্তি, সেই পিতামাতাও "স্বামী-স্ত্রী" ইত্যাকার ভ্রম নিয়া সংযোগ-হইয়া আমার উৎপত্তি। আমি ভ্রম সংস্কার বিশিষ্ট বলিয়াই ঐরূপ ভ্রম অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছি ; সুতরাং আমার যাহা কিছু সমস্তই ভ্রম। আমার ভ্রম বুদ্ধি দ্বারাও ভ্রম ইন্দ্রিয়াদিতে ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই ধারণা সম্ভব না। আমার বুদ্ধি নিয়া আমি যত বিচার ও মীমাংসা শ্রবণ করি, সকলই ভ্রমের মীমাংসা। আমার বুঝ্ ও আমার শ্রবণ, আমার দর্শন, আমার মন, আমার নয়ন—সকলই ভ্রমানুরূপ হইবে ও হইতেছে। তবে জীবের একমাত্র এই উপায় আছে যে,ভ্রান্তি বুদ্ধি ও ভ্রান্ত বস্তু অনুধ্যান চিন্তা ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিয়া কেবল অভ্রান্ত সেই গুরুর উ-কারের ঘাট সর্ব্বদা অনুধ্যান করা। তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে ভ্রান্তি অভাব হওয়া অসম্ভব। আমার সমস্ত উপাদান ও কার্য্য-কারণ সমস্ত-ভ্রান্তি, আমার সিদ্ধান্ত ও চিন্তা অভ্রান্ত ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আমার চিন্তা বাদ দিয়া কেবল গুরু-চিন্তা ভিন্ন আমার পার হওয়ার প্রত্যাশা নাই ;

কারণ এক গুরু চিন্তা ভিন্ন আমার চিন্তার বিষয়ের মধ্যে অভ্রান্ত চিন্তা আর কিছু নাই। অতএব গুরুর অনুধ্যান, গুরুতে আসক্তি, গুরু চিন্তা, গুরু রূপ দর্শন ও গুরু গুরু করা ভিন্ন আমার করিবার আর কিছু নাই।

এখন গুরু ভিন্ন আর যাহা কিছু করিতে যাই তাহাতেই ভ্রান্তিতে পতিত হইতে হয়। ইচ্ছা-বাসনা ইত্যাদিও ভ্রম মূলে; এই ভ্রমাত্মক ইচ্ছা-বাসনা বর্ত্তমানে অন্য বস্তু লক্ষ্য রহিত হওয়া অসম্ভব। এই হেতুতেই মূলমন্ত্র জপ অত্যাবশ্যক। যেহেতু এই সমস্তগুলিই ক্রিয়ার ফল; ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ভিন্ন এক গুরু লক্ষ্যে স্থির থাকা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। অতএব গুরু এবং ক্রিয়া এই উভয় নিয়া থাকার সময় না আসা পর্য্যন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ বা সত্য অনুভব অসম্ভব।

তারকের হোম নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হোম প্রাণে এই ভাব জালাইয়া দিয়াছে পুনরায় গুরুতে আত্মাহুতি না দিলে আর আমার শান্তি নাই। সে আহুতি দেওয়ারও প্রতিবন্ধক বর্ত্তমানে তোমরা দুই জন। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় না, চক্ষু বুজিলেও স্বপ্ন দেখি। এ পর্য্যন্ত কত জায়গায় কত লোককে বিশ্বাস নির্ভর করিয়া প্রতারিত হইয়াছি, পরিণামে তোমরাও প্রতারণা করিয়া দিন কুড়াইয়া আমাকে বিদায় দিলে আমার কি হইবে? সংসারে সকলেই আপ্‌না নিয়া ব্যস্ত, পরের জন্য ব্যস্ত কেহই নয়। এ অবস্থায় আমার জন্য তোমরা ব্যস্ত, আমার এ ধারণা কি ভুল নয়? আপনাকে অতিক্রম

করিয়া আমাকে এক মা-ই চাহিয়াছিল, অন্য কেহ যে চাহিবে তাহা আর বিশ্বাস করিতে পারি না। অথচ আশা আমাকে দিনরাতই প্রতারণা করিতেছে। তাই তোমাদের আশায় আমি এখনও আত্ম চিন্তা হইতে বিরত আছি।

পড়াশুনা মনোযোগ পূর্ব্বক করিবে। তোমরা আমাকে প্রতারণা কর কোন দুঃখ নাই ; কিন্তু তোমরা আমা দ্বারা কোন রূপ প্রতারিত না হও—ইহা আমার সতত চিন্তা। কারণ, যদি বিষয় বাসনা আসে, আর বিষয়ানুরূপ ব্যাপারের বাধা-বিঘ্ন হয়—তবে সর্ব্বদাই মনে করিবে যে, আমার মূলেই তোমরা এরূপ ভাবে ঠকিয়াছ বা প্রতারিত হইয়াছ। মানব এত নীচ উপাদানে, বর্ত্তমানে গঠিত যে, পরার্থ একটা শব্দ মাত্র আছে ; কার্য্যক্ষেত্রে স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না।

[(১১২)—জ]

মানুষ স্ব স্ব ক্রিয়ানুরূপ জ্ঞানে সর্ব্বদা চালিত হওয়ায়, ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে যে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও জ্ঞানে ধারণা করিতে পারে না। কিছুতেই স্বকীয় ভুল জ্ঞানে ধারণা না হওয়ায়, যখন যেরূপ ক্রিয়া হয়, তাহাই করিতেছে। এমন কি, নিজেই নিজের ক্রিয়ানুরূপ কর্ম্ম ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তনানুরূপ জ্ঞান দিয়া ধারণা করিয়া দেখিলে, দেখে যে, পূর্ব্বের বা পরেরটা ভুল করিয়াছি। মানুষের করণীয় কি তাহা মানুষের ক্রিয়া বর্ত্তমানে বুঝা অসম্ভব ; কারণ, মানুষের জ্ঞান ক্রিয়ানুরূপ, সুতরাং কর্ত্তব্য জ্ঞানও ক্রিয়ানুরূপ ভিন্ন হইতে পারে না। নিজেরই বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কর্ম্মকে

বিভিন্ন ক্রিয়ার জ্ঞানে বিভিন্ন ও ভাল-মন্দ বুঝি। এই বুঝাবুঝি নিয়া বুঝিতে গেলে সর্ব্বদাই ভুল বুঝিব। ঠিক বুঝের বুঝ্ ও অভাব হইবে। সুতরাং ভ্রম জ্ঞান নিয়া বুঝিতে গেলে হুঁ-র উ-র ঘাটের দূরে না নিকটে আছি অর্থাৎ স্থূল ভাবে দেখিতে গেলে ভগবদ্-ভক্তের নিকটে না দূরে, ইহা চিন্তা করিয়া না দেখিলে আর দেখিবার উপায় নাই।

এইজন্যই বর্ত্তমান যুগে গুরু শব্দে নানা দোষারোপ হইতেছে ; কেন না, গুরু এই শব্দ উচ্চারণেই ভ্রূ-মধ্যে ক্রিয়া হইয়া, জাগতিক জ্ঞান অভাব করে। জাগতিক জ্ঞানের কারণ 'হুঁ' ; শুধু 'উঁ' থাকিলে হ-কারের অভাব হয় বলিয়াই জগৎ-জ্ঞান থাকে না। এইজন্যই ঋষিগণ অ-হ এর অন্তর্ব্বর্ত্তী "জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে পৃথিব্যাঃ কিং প্রয়োজনং" বলিয়া গিয়াছেন।

মাকে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সন্ধ্যাদি একটু মনোযোগের সহিত করিতে বলিয়া, ঐ সময়টা আমাকে জানাইয়া দিলে, ভাল হয় ; অথবা আমি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, সেই সময় মা একটু অবহিত চিত্তে কিছু কিছু সময় গুরুবীজ ও মূলমন্ত্র করিলে, কতকটা শক্তি দিয়া দেওয়া যায়।

[(১১৩)—জ]

এ জগৎটা যদি বেদান্ত মতে ভ্রমেই ব্রহ্মেতে অনন্ত অবস্থার জ্ঞান জন্মিতেছে স্বীকার কর, তাহা হইলে তুমি যে কোন মীমাংসা

কর তাহাই ঠিক। কারণ, যে জায়গায়ই আমরা স্বরূপ অবস্থা নিরূপণ করিতে পারি না, সেই জায়গায় মন ও বুদ্ধির সাহায্যে যখন যা কল্পনা করি, তাই ঠিক বোধ হয়। এই হেতুতেই মানুষের কল্পনা ক্রিয়ার পার্থক্যে অনন্ত সময়ে অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে। প্রশ্নাদির মীমাংসা ও পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দের নির্ণয় করিতে হইলেই, ক্রিয়া বিশেষে বা ধারণার পার্থক্যে উ-কারের ঘাটের দূরে না নিকটে যাই, এ চিন্তা স্থির রাখিয়া মীমাংসা করিলেই ঠিক হইবে। তুমি সেই উ-কারের ঘাট হইতে কোন্ কার্য্যে দূরে সরিয়া পড় বা নিকটে থাক, এই মনে করিয়া যে মীমাংসা কর, তাহাই ঠিক হইবে। কোন একটা অসীম সমুদ্রের মধ্যে যখন জাহাজ যায়, তখন কেবল ধ্রুব নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়াই সমস্ত দিক দেশ নির্ণয় করে বলিয়া যেমন নাবিকের ভ্রান্তি হয় না, তেমন এই দেহের মধ্যেও ধ্রুব নক্ষত্র স্বরূপ উ-কারের ঘাট লক্ষ্য করিয়া চলিলে ভ্রান্তি হয় না। আবশ্যক হইলে, কিছুক্ষণ গুরু-বীজ করিয়া নিজে একটু স্থির হইয়া মীমাংসা করিলেই, মীমাংসায় আর ভুল হইবে না।

বাবা, আমি প্রাণ খুলিয়া বাবা, বাবা করি, তোমাদের কাণে প্রবেশ করে না। প্রবেশ করিলে একবার আশ্রমে আসিয়া আমার দুরবস্থা জানিয়া যাইবা।

[(১১৪)—ন, স্থ]

আমি গুরুর নিকট ক্রমান্বয়ে ৫ বৎসর যোগোপনিষদের বহু উপদেশ শুনিয়াছি ; সর্ব্বোপনিষদের সার আমি এই বুঝিয়াছি

যে, জীবের গুরু-চিন্তাই একমাত্র শেষ কথা। কারণ, 'ওম্'এর বিশ্লেষ অবস্থায় অ-উ-ম্ পর্য্যায় ক্রমে বিশ্লেষ হইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি ; অথবা ব্রহ্মে এই বিশ্ব ভ্রান্তি। উ-কারের ঘাট অতিক্রম না হইলে ওঁ-কারে পৌঁছা যায় না এবং সেই বিশ্লেষ অবস্থায় গুরু এই শব্দ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে উ-কারের ঘাট অতিক্রম করা যায় না। এজন্য গুরুবীজে শক্তিগুলি এক হইয়া ঈ-কারের ঘাট দিয়া ঐ উ-কারে যায় বটে ; কিন্তু উ-কারের ঘাট অতিক্রম না করিয়া ওঁ হয় না। আবার মূলমন্ত্রের আদি বর্ণ উচ্চারণে যে প্রণব হয়, সে প্রণবও উ-কারের ঘাট অতিক্রম করিয়াই হইয়া থাকে। সর্ব্বাবস্থায়ই উ-কারের ঘাট অতিক্রম করা আবশ্যক।

জীব মায়া বা ভ্রান্তি দ্বারা ভ্রম-বিশিষ্ট হইলে, অথবা শক্তি বা ক্রিয়ামূলে ব্রহ্মে আনন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সর্ব্বাবস্থায়ই ম্-কার হইতে 'উ' বিশ্লেষ হইয়া এবং উ-কার হইতে 'অ' বিশ্লেষ হইয়া, ঐ অকারের জ্ঞানে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হয়। এ অবস্থায় জীব যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত বিশ্ব জ্ঞান নিয়া জন্মে, তখন ঐ ভ্রমাবস্থার অবস্থায় আমার আমিত্ব ; সেই আমি দ্বারা ভ্রম বুঝা বুঝের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কেবল দৃঢ় বিশ্বাসে অভ্রান্ত পুরুষের পথানুসরণ করাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। জন্মান্ধের স্বীয় বুদ্ধিবলে গমনাগমন যেমন স্বতঃসিদ্ধ অসম্ভব, সেইরূপ মায়ামোহ মূলে যে বুঝ্, সেই বুঝ্ নিয়া ব্রহ্ম

বুঝাও অসম্ভব। অতএব গুরুদের পথ অনুসরণ ভিন্ন জীবের আর অন্য উপায় নাই ; অথবা গুরুদের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবল গুরুকে অনুসরণ করিলেও সেই ব্রহ্ম-অবস্থায় জীব যাইতে পারে। অর্থাৎ গুরুর রূপ চিন্তা করা, গুরুর কার্য্যাবলী চিন্তা, গুরুর কৃপা-লাভ বাসনা, গুরুসঙ্গ —ইহা দ্বারাও জীব ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিতে পারে। গুরুর সকলই গুরু, তাঁর রূপও গুরু, তাঁর কার্য্যাবলীও গুরু এবং তাঁর নামও গুরু, সুতরাং গুরু চিন্তায় জীবের কোন অভাব থাকিতে পারে না।

আমি তোমাকে অনেক দিনই বলিয়াছি ভাল-মন্দ বিচার রহিত হইয়া কেবল গুরু অনুধ্যান কর, নিশ্চয়ই ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিবে। জীব স্বীয় ভাবে রাতদিন জগৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, স্বীয় কর্ম্মে কোন সময়েই আর কোন ব্যাপারে ভুল অনুভব করে না ; কেবল যখন গুরুতে লক্ষ্য আসে তখনই নিজ ভ্রম অনুভব করিতে পারে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই ভ্রম-মূলে উৎপন্ন অর্থাৎ আমার আমিত্ব ইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব হইতেছে ; আমি অনুরূপ ব্যাপারগুলিও ইন্দ্রিয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে। সুতরাং আমার কার্য্য কোন সময়েই ভ্রান্তি নয় ; ভ্রান্তি বুঝি কেবল গুরু চিন্তায়। কেননা, হুঁ-র উ-র ঘাটে গেলে দৃশ্যমান জগৎ ভুল প্রমাণ হয়।

কিন্তু, অনেক সময় মনে হয় আমাকে যেন তুমি ইহ জগৎ হইতে

সকালেই বিদায় দিবার জন্য ব্যস্ত; কারণ তাহা না হইলে, এই পরীক্ষার কয় মাসে কি আমার যোগোপনিষদের উপদেশ শেষ হইয়া যাইবে? বাবা, আমার ত প্রবল বাসনা বিশুদ্ধ জগদতীত ব্রহ্ম-জ্ঞান অনুভব, অনুভব করিয়া ইহলোক ত্যাগ করি। যদি সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে তাহা হইলে লিখিবা; প্রত্যেক দিনের যোগোপনিষদের সার মর্ম্ম তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব।

[সমাপ্ত]

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ পূর্ণানন্দ স্বামী রচিত সঙ্গীত।

(১)

অসার সংসার মাঝে গুরু—সার,
ও তুই সার পদার্থ রইলি ভুলে, একবার নাম, নিলি না তাঁর
গুরু সত্য, গুরু নিত্য, গুরু পদে হও রে মত্ত, ভ্রান্ত মন আমার ;
গুরু দীন-বন্ধু, কৃপা-সিন্ধু, ভব-সিন্ধু করেন পার।
গুরু তোরে দয়া ক'রে, যে ধন দিলেন কর্ণ-মূলে,
জপ্‌লি না একবার।
রইলি নাম পাসরি, মায়ায় ভুলি, মন রে ক'রে অহঙ্কার ॥
কিসের ঘর আর কিসের বাড়ী, বসত করা দিন দুই চারি,
কিসের পরিবার।
ও তোর সাক্ষী আছে, মন তোর নিজের কাছে,
চক্ষু মুদ্‌লে অন্ধকার ॥

(২)

সংসারে পরমারাধ্য সেই সে এক জনা,
সে যে সচ্চিদানন্দ, পরম ব্রহ্ম, তারে কেউ চেনে, কেউ চেনে না।
তারে বৈষ্ণবে কয় বিষ্ণু হরি, শৈবে কয় শিব জটাধারী,
শাক্তে শঙ্করী ;
সে যে পুরুষ কি নারী, চিনতে নারি, যুক্তি-শাস্ত্রে মেলে না।

তার চরণ নাই চলিতে দক্ষ, নয়ন নাই সে করে লক্ষ্য

স্থূলাদি সূক্ষ্ম,

তার বদন নাই সে বলে বাক্য, অলক্ষ্য তার নিশানা।

সে নিরাকার বহু-রূপী, দৃশ্য নয় সে সর্ব্ব-ব্যাপী,

কারু বা আলাপি,

ভেবে পাই না যে কূল, সূক্ষ্ম কি স্থূল, আদি মূল তার মেলে না।

তার ধাম জানি না, নামটি গুরু, বৃক্ষ নয় সে কল্প-তরু,

অতি সুচারু—

যে জন তারে (গুরু) ছেড়ে অন্যে চলে,

তার অকূলে কূল মেলে না।

বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা গান্ধীজী

বিশ্বেশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সকল মহান আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল আদর্শ বিষদভাবে শ্রীসচ্চিদানন্দ পরিব্রাজকাচার্য্য প্রণীত "শান্তিলাভের স্বাভাবিক পথ" নামক পুস্তকে অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বদেশীয় জনসাধারণের হিতার্থে উহা আট-দশটি ভাষায় মুদ্রিত হইবে। বাংলা ভাষায় কিছু সংখ্যক শীঘ্রই প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। উহার মূল্য ২॥০ টাকার অধিক হইবে না। সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। পত্রাদি কার্য্যাধক্ষ্য—শ্রীদাশুরথী পাল এম, এ-র নামে আনন্দ-ধাম, ৭৫এ, রামকান্ত বোস ষ্ট্রীট, পোঃ বাগ্‌বাজার, কলিকাতা—৩ ঠিকানায় লিখুন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত—পুস্তকগুলি—কার্য্যাধক্ষ্য কামাখ্যা কালীপুর আশ্রম ; পোঃ কামাখ্যা, জেলা কামরূপ, আসাম ঠিকানায় পাওয়া যায়।

অধ্যাত্ম মুক্তাবলী (ধর্মতত্ত্বের অভিধান বিশেষ)—৫৲, রামপ্রসাদের মা—১৲, কবীর পন্থা—১৲, মীরাবাঈ—২৲, পূর্ণানন্দের প্রলাপ—১৲, ভাগবত ধর্ম—২৲, ঠিক-বেঠিক—১৲ এবং বিচারতত্ত্ব—১৲।

শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পুস্তকগুলি যথা :—পূর্ণানন্দ স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী—।/০, আনন্দ-গীতা বর্দ্ধিত মূল্য—১॥০ স্থলে ২৲ এবং জাগরণী—২৲ স্থলে ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—উক্ত আনন্দ-ধাম।